একটি সংক্ষিপ্ত কুরআনের ভাষ্য: মনের শান্তির পথ – অধ্যায় ৬ আল আন'আম

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

একটি সংক্ষিপ্ত কুরআনের ভাষ্য: মনের শান্তির পথ – অধ্যায় 6
আল আন'আম

শায়খপড বই

শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটি তৈরিতে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তবুও এখানে থাকা তথ্য ব্যবহারের ফলে কোনও ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য, অথবা ক্ষতির জন্য প্রকাশক কোনও দায়ভার গ্রহণ করবেন না।

একটি সংক্ষিপ্ত কুরআনের ভাষ্য: মনের শান্তির পথ – অধ্যায় 6 আল আন'আম

প্রথম সংস্করণ। ৩১ মে, ২০২৫।

কপিরাইট © ২০২৫ শায়খপড বই।

শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

সুচিপত্র

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

কম্পাইলারের নোটস

ভূমিকা

৬ষ্ঠ অধ্যায় – আল আন'আম, আয়াত ১-৩২

৬ষ্ঠ অধ্যায় – আল আন'আম, আয়াত ৩৩-৪৫

৬ষ্ঠ অধ্যায় – আল আন'আম, আয়াত ৪৬-৭৩

৬ষ্ঠ অধ্যায় – আল আন'আম, আয়াত ৭৪-৯৪

৬ষ্ঠ অধ্যায় – আল আন'আম, আয়াত ৯৫-১৩৩

৬ষ্ঠ অধ্যায় – আল আন'আম, ১৬৫ এর ১৩৪-১৬৫ আয়াত

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

স্বীকৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমান্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী থাকবেন।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ।

ভূমিকা

পবিত্র কুরআনের ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আমের একটি সম্পূর্ণরূপে উল্লেখিত এবং সহজে বোধগম্য বিস্তারিত তাফসীর (তাফসীর) নিচে দেওয়া হল। এতে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুসলমানদের উত্তম চরিত্র অর্জনের জন্য কোন ভালো বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা উচিত এবং কোন খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি এড়িয়ে চলা উচিত।

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মানসিক শান্তি আসে।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

৬ষ্ঠ অধ্যায় – আল আন'আম, আয়াত ১-৩২

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾

وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾

فَقَدْ كَذَّبُوا۟ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنۢبَٰٓؤُا۟ مَا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾

أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَبۡلِهِم مِّن قَرۡنٖ مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَا لَمۡ نُمَكِّن لَّكُمۡ
وَأَرۡسَلۡنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡهِم مِّدۡرَارٗا وَجَعَلۡنَا ٱلۡأَنۡهَٰرَ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمۡ فَأَهۡلَكۡنَٰهُم
بِذُنُوبِهِمۡ وَأَنشَأۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِمۡ قَرۡنًا ءَاخَرِينَ ٦
وَلَوۡ نَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ كِتَٰبٗا فِي قِرۡطَاسٖ فَلَمَسُوهُ بِأَيۡدِيهِمۡ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا
سِحۡرٞ مُّبِينٞ ٧
وَقَالُواْ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ مَلَكٞۖ وَلَوۡ أَنزَلۡنَا مَلَكٗا لَّقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٨
وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ مَلَكٗا لَّجَعَلۡنَٰهُ رَجُلٗا وَلَلَبَسۡنَا عَلَيۡهِم مَّا يَلۡبِسُونَ ٩
وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٖ مِّن قَبۡلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنۡهُم مَّا
كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ ١٠
قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ١١
قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ قُل لِّلَّهِۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَۚ
لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيهِۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَهُمۡ
لَا يُؤۡمِنُونَ ١٢

۞ وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١٣

قُلۡ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّٗا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَهُوَ يُطۡعِمُ وَلَا يُطۡعَمُ قُلۡ إِنِّيٓ
أُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَسۡلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٤

قُلۡ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنۡ عَصَيۡتُ رَبِّي عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ١٥

مَّن يُصۡرَفۡ عَنۡهُ يَوۡمَئِذٖ فَقَدۡ رَحِمَهُۥۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡمُبِينُ ١٦

وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يَمۡسَسۡكَ بِخَيۡرٖ فَهُوَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٧

وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ١٨

قُلۡ أَيُّ شَيۡءٍ أَكۡبَرُ شَهَٰدَةٗۖ قُلِ ٱللَّهُۖ شَهِيدُۢ بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِأُنذِرَكُم
بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۚ أَئِنَّكُمۡ لَتَشۡهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخۡرَىٰۚ قُل لَّآ أَشۡهَدُۚ قُلۡ إِنَّمَا
هُوَ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ١٩

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمُۘ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ
فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٢٠

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢١

وَيَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَمِيعٗا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ أَيۡنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ
٢٢

ثُمَّ لَمۡ تَكُن فِتۡنَتُهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشۡرِكِينَ ٢٣

ٱنظُرۡ كَيۡفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ٢٤

وَمِنۡهُم مَّن يَسۡتَمِعُ إِلَيۡكَ وَجَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٗاۖ
وَإِن يَرَوۡاْ كُلَّ ءَايَةٖ لَّا يُؤۡمِنُواْ بِهَاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَٰدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ
هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٢٥

وَهُمۡ يَنۡهَوۡنَ عَنۡهُ وَيَنۡـَٔوۡنَ عَنۡهُۖ وَإِن يُهۡلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٢٦

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَٰلَيۡتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
٢٧

بَلۡ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخۡفُونَ مِن قَبۡلُۖ وَلَوۡ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنۡهُ وَإِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ٢٨

وَقَالُوٓاْ إِنۡ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا وَمَا نَحۡنُ بِمَبۡعُوثِينَ ٢٩

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمۡ قَالَ أَلَيۡسَ هَٰذَا بِٱلۡحَقِّۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ ٣٠

قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتۡهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغۡتَةً قَالُواْ يَٰحَسۡرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطۡنَا فِيهَا وَهُمۡ يَحۡمِلُونَ أَوۡزَارَهُمۡ عَلَىٰ ظُهُورِهِمۡۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ٣١

وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا لَعِبٞ وَلَهۡوٞۖ وَلَلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَۗ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٣٢

“[সমস্ত] প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর যারা অবিশ্বাস করে তারা তাদের পালনকর্তার সাথে অন্যদের সমতুল্য করে।

তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর একটি সময় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন যা তাঁর কাছে[জ্ঞাত], তবুও তোমরা সন্দেহের মধ্যে আছো।

আর তিনিই আল্লাহ, আসমান ও যমীনে [একমাত্র উপাস্য]। তিনি তোমাদের গোপন কথা এবং তোমাদের প্রকাশ্য কথা জানেন এবং তোমরা যা অর্জন করো তাও জানেন।

আর তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী থেকে এমন কোন নিদর্শন আসে না যার থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কারণ যখন সত্য তাদের কাছে এসেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করেছিল, কিন্তু তারা যা নিয়ে উপহাস করত, তার সংবাদ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌঁছাবে।

তারা কি দেখেনি যে, তাদের পূর্বে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমন তোমাদেরকে করিনি? আর আমরা তাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের তলদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম; তারপর তাদের পাপের কারণে আমরা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং তাদের পরে অন্যদের সৃষ্টি করেছিলাম।

আর যদি আমি তোমার উপর, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], একটি লিখিত কিতাব নাযিল করতাম, আর তারা তা তাদের হাত দিয়ে স্পর্শ করত, তবুও কাফেররা বলত, "এটা তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।"

আর তারা বলে, "তার কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হল না?" আর যদি আমি কোন ফেরেশতা নাযিল করতাম, তাহলে ব্যাপারটির মীমাংসা হয়ে যেত; তারপর তাদের অবকাশ দেওয়া হত না।

আর যদি আমরা তাকে [রাসূলকে] ফেরেশতা বানাতাম, তবে তাকে একজন মানুষের মতো করে দেখাতাম এবং তাদের উপরও সেই ধারণা চাপিয়ে দিতাম যা তারা নিজেদের [বিভ্রান্তি ও সন্দেহ] জুড়ে দেয়।

আর তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে উপহাস করা হয়েছে, অতঃপর যারা তাদেরকে উপহাস করেছিল, তাদেরকে সেই বিষয়ই ঘিরে ফেলেছে যা তারা উপহাস করত।

বলুন, "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, তারপর দেখো কেমন হয়েছিল মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম।"

বলুন, "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার?" বলুন, "আল্লাহর।" তিনি নিজের উপর রহমত নির্ধারণ করেছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা [সেদিন] নিজেদের ক্ষতি করে, তারা বিশ্বাস করে না।

আর যা কিছু রাত ও দিনে স্থায়ী হয়, তা তাঁরই, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

বলুন, "আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করব, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, অথচ তিনিই আহার দেন এবং তাঁকে খাওয়ানো হয় না?" বলুন, "নিশ্চয়ই আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে আমি তোমাদের মধ্যে প্রথম আত্মসমর্পণকারী হই এবং [আদেশ দেওয়া হয়েছিল] যে, 'তুমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

তুমি বলো, "আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি।"

যার কাছ থেকে সেদিন আযাব দূর করা হবে, তাকে তিনি রহমত দান করবেন এবং এটাই স্পষ্ট সাফল্য।

আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাকে কোন কল্যাণ দেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান, আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

বলো, "সাক্ষ্যের দিক থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস কোনটি?" বলো, "আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে এটি পৌঁছাবে তাদের সতর্ক করতে পারি। তোমরা কি [সত্যিই] সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও আছে?" বলো, "আমি [তোমাদের সাথে] সাক্ষ্য দেব না।" বলো, "নিশ্চয়ই, তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং তোমরা যাকে [তাঁর সাথে] শরীক করো, আমি অবশ্যই তা থেকে মুক্ত।"

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা একে [অথবা তাকে] চিনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনে। যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না।

আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে? নিশ্চয়ই জালেমরা সফলকাম হবে না।

আর [স্মরণ করো], যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব; তারপর যারা আল্লাহর সাথে অন্যদের অংশীদার বলে দাবী করেছিল তাদের বলব, "তোমাদের 'শরীক'রা কোথায়?"

তখন তাদের পরীক্ষার কোন অজুহাত থাকবে না, কেবল তখনই তারা বলবে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কসম, আমরা শিরককারী ছিলাম না।"

দেখো, তারা নিজেদের উপর কেমন মিথ্যা বলবে এবং তারা যা রচনা করত তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা তোমার কথা শোনে [নবী মুহাম্মদ, সা.], কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা রেখে দিয়েছি। আর যদি তারা সমস্ত নিদর্শন দেখে, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করবে না। এমনকি যখন তারা তোমার সাথে তর্ক করতে করতে তোমার কাছে আসে, তখন কাফেররা বলে, "এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

আর তারা অন্যদেরকে তার থেকে বিরত রাখে এবং নিজেরাই তার থেকে দূরে থাকে। আর তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে ধ্বংস করে না, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

যদি তুমি দেখতে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে, "হায়! যদি আমরা পৃথিবীতে ফিরে যেতাম এবং আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার না করতাম এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।"

কিন্তু তারা যা পূর্বে গোপন করেছিল, তা এখন তাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। আর যদি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবুও তারা তাই করবে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল; আর তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

আর তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই, আর আমরা পুনরুত্থিত হব না।

যদি তুমি দেখতে পারতে যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, "এটা কি সত্য নয়?" তারা বলবে, "হ্যাঁ, আমাদের রবের কসম।" তিনি বলবেন, "তাহলে তোমরা যা অস্বীকার করতে তার জন্য শাস্তি আস্বাদন করো।"

যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকি যখন তাদের কাছে হঠাৎ করেই কেয়ামত এসে যাবে, তখন তারা বলবে, "হায়! আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্য আমাদের কত বড় আফসোস!" আর তারা তাদের পাপের বোঝা তাদের পিঠে বহন করবে। নিঃসন্দেহে তারা যা বহন করে তা কতই না নিকৃষ্ট।

আর পার্থিব জীবন তো খেলাধুলা ও কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু পরকালের আবাস তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহকে ভয় করে, তোমরা কি বোঝ না?

প্রশংসা শব্দটি ক্রিয়াপদের আকারে নয়, একটি বিশেষ্যের আকারে। ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ১:

"[সকল] প্রশংসা আল্লাহর জন্য..."

এর অর্থ একটি চিরস্থায়ী অবস্থা, যার অর্থ হল সকল প্রশংসা চিরকাল মহান আল্লাহর জন্য, যার কোন শুরু বা শেষ নেই। অধিকন্তু, একটি বিশেষ্যের ব্যবহার একজন ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রয়োজনীয় ক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা দূর করে। এর অর্থ হল, সৃষ্টির কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রশংসা নাও করে, তবুও সমস্ত প্রশংসা সহজাতভাবে তাঁরই হবে। মূলত, সৃষ্টির আরাধনা এবং শ্রদ্ধা মহান আল্লাহর অসীম এবং ঐশ্বরিক প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে না। এই ধারণাটি সহীহ মুসলিম, ৬৫৭২ নম্বরে লিপিবদ্ধ একটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত। ২৯ সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৬:

"আর যে কেউ চেষ্টা করে, সে কেবল নিজের জন্যই চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের অভাবমুক্ত।"

এটি মহান আল্লাহর প্রশংসা ও ইবাদত করার সময় অহংকার থেকে বিরত থাকার তাৎপর্যকে তুলে ধরে। একজন মুসলিমের স্বীকার করা উচিত যে, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য এবং আনুগত্য তাদের নিজেদের কল্যাণে কাজ করে, কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা এই ধরনের প্রশংসার প্রয়োজন করেন না।

অধিকন্তু, মূল আয়াতটি একজন মুসলিমকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের মধ্যে অথবা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান যেকোনো প্রশংসনীয় গুণাবলী মহান আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত। ফলস্বরূপ, সমস্ত প্রশংসা কেবল তাঁরই প্রতি নিবেদিত। এই বাস্তবতা স্বীকার করলে অহংকারের মতো গুরুতর পাপ থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়, কারণ সামান্য পরিমাণও অভিশাপের কারণ হতে পারে। সহিহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই সতর্কীকরণটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পরিশেষে, যখন কেউ বুঝতে পারে যে অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা ও আনুগত্য করার সুযোগ তাঁরই দ্বারা প্রদত্ত, তখন অহংকার হ্রাস পায়।

প্রশংসার চারটি কারণই মহান আল্লাহর অন্তর্নিহিত, এবং যে কেউ এই গুণাবলী ধারণ করে তা কেবল তাঁর অনুগ্রহেই করে। অতএব, তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। চারটি কারণ হল: যার প্রশংসা করা হচ্ছে সে গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পরিপূর্ণ, কোনও ত্রুটি ছাড়াই; প্রশংসিত ব্যক্তি অন্যের উপর একটি উপকার করেছেন, প্রশংসাকে কৃতজ্ঞতার একটি রূপ করে তোলে; প্রশংসাকারী ব্যক্তি প্রশংসা করা ব্যক্তির কাছ থেকে একটি অনুগ্রহ কামনা করে; এবং পরিশেষে, প্রশংসিত ব্যক্তির এমন গুণাবলী রয়েছে যা সহজাতভাবে প্রশংসার দাবি রাখে, যেমন শক্তি এবং কর্তৃত্ব।

মানুষ প্রায়শই প্রতিদানে কিছু পাওয়ার আশায় দয়ার কাজ করে, তা সে ঐশ্বরিক পুরষ্কার হোক, জনসাধারণের প্রশংসা হোক, প্রতিদান হোক, অথবা কৃপণতা এড়াতে হোক। ফলস্বরূপ, যারা তাদের কর্মের প্রতিদান আশা করে তাদের প্রকৃত দাতা

হিসেবে বিবেচনা করা যায় না এবং তারা প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য নয়, কারণ তাদের প্রেরণা প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা কলঙ্কিত। বিপরীতে, মহান আল্লাহ, সৃষ্টির উপর অসংখ্য এবং চলমান আশীর্বাদ দান করেন, এই ধরণের কারণে নয়, বরং তাঁর অসীম করুণা এবং করুণার কারণে। অধ্যায় ১ আল ফাতিহা, আয়াত ১:

"পরম করুণাময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।"

মহান আল্লাহ, সৃষ্টির উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করে কোন সুবিধা পান না, তাঁকেই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য করে তোলেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১:

"[সকল] প্রশংসা আল্লাহর জন্য..."

অধিকন্তু, এই আয়াতে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস গ্রহণের প্রাথমিক পদক্ষেপটি তুলে ধরা হয়েছে, তিনি ব্যক্তিদের উপর যে অসংখ্য এবং অব্যাহত আশীর্বাদ দান করেন তার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৩৪:

"... আর যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ[অর্থাৎ, আশীর্বাদ] গণনা করো, তবে তা গণনা করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ [সাধারণত] অত্যন্ত অন্যায়কারী এবং অকৃতজ্ঞ।"

পবিত্র কুরআন প্রায়শই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে তুলনা করে। এর অর্থ হল, তাঁর প্রতি সক্রিয়ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব নয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৫২:

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার অস্বীকৃতি করো না।"

প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হলো সকল মৌখিক ও শারীরিক কর্মকাণ্ডে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একনিষ্ঠ অভিপ্রায়। অতএব, অন্যদের কাছ থেকে স্বীকৃতি চাওয়া বা প্রত্যাশা করা উচিত নয়। কথায় প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হলো ইতিবাচক কথা প্রকাশ করা অথবা নীরবতা বেছে নেওয়া। কর্মে কৃতজ্ঞতা অর্জনের জন্য একজনকে প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে। ইসলামের মৌলিক বাধ্যতামূলক কর্তব্যের বাইরেও আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আরও আশীর্বাদ লাভের জন্য এগুলি অপরিহার্য শর্ত। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১:

"[সকল] প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন..."

যেহেতু মহান আল্লাহ একাই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনিই জানেন কিভাবে একজন ব্যক্তি উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে এমন একক সরল পথে চলতে পারে এবং তিনিই জানেন কিভাবে একজন ব্যক্তি উভয় জগতে চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে এমন অন্ধকারের বিভিন্ন পথ এড়াতে পারে। একক সরল পথে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে ব্যক্তিরা মন এবং শরীরের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জন করবে, তাদের জীবনের সমস্ত দিক কার্যকরভাবে পরিচালনা করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতেই শান্তি বর্ধন করবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে সে অনিবার্যভাবে এই পৃথিবীতে অন্ধকারের একাধিক পথে যাত্রা করবে, কারণ প্রতিটি অন্ধকার পথই স্বতন্ত্র যেভাবে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত সম্পদের অপব্যবহার করে সে অন্ধকারের পথে যাত্রা করবে যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে তার চেয়ে ভিন্ন পথে যাত্রা করবে। ফলস্বরূপ, তারা

নিজেদেরকে একটি বিশৃঙ্খল মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার মধ্যে দেখতে পাবে, যার ফলে তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তারা দুর্বল হয়ে পড়বে । এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং সংগ্রামের সৃষ্টি হবে, তাদের যে কোনও বস্তুগত আরাম-আয়েশ থাকুক না কেন। এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং যারা করে না। তবুও, অনেকেই এই সত্যটি উপলব্ধি করতে এবং বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ, আল্লাহ ছাড়া অন্যদের, যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং সমাজের আনুগত্য করে, যা তাদের প্রদত্ত অনুগ্রহগুলির অপব্যবহারের উৎস। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 1:

"... অতঃপর যারা অবিশ্বাস করে তারা তাদের পালনকর্তার সাথে [অন্যদের] সমতুল্য করে।"

যদিও এই আয়াতটি কাফেরদের কথা বলে, তবুও, একজন মুসলিম যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে চায়, তাহলে তারা এই পৃথিবীতে তাদের দুর্দশার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবে। এছাড়াও, এই আয়াতটি তাদের কথাও বলতে পারে যারা মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ। অকৃতজ্ঞতা মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের, যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির আনুগত্য করতে উৎসাহিত করে, যার ফলে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য হয়।

মহান আল্লাহ্, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করেছেন, এই সত্যটিই তাঁকেই একমাত্র অধিকার দেয় যে তারা কীভাবে জীবনযাপন করবে এবং তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি কীভাবে ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করবে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 2:

"তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন, যা তাঁর কাছে [জ্ঞাত]..."

এই আয়াতটি মানুষকে একটি সূক্ষ্ম সতর্কীকরণ প্রদান করে যে, যেহেতু সমস্ত সৃষ্টি মৃত্যুর সম্মুখীন হবে, তাই এই পৃথিবীতে তাদের প্রদত্ত অবকাশ তাদের কাছে সীমিত এবং অজানা। অতএব, এমন আচরণ করা উচিত নয় যেন তারা মারা যাবে না এবং বিচারের দিনে তাদের চূড়ান্ত জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। পরিবর্তে, তাদের এই পৃথিবীতে প্রদত্ত অবকাশকে এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কাজে লাগাতে হবে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

"যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

অতএব, এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের মিথ্যা আশা বিভ্রান্তির একটি প্রধান উৎস কারণ এটি একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করে এবং

নিজেকে নিশ্চিত করে যে তাদের সংশোধনের জন্য সময় আছে, যতক্ষণ না মৃত্যু হঠাৎ তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় নিয়ে যায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ২:

"তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন, যা তাঁর কাছে [জ্ঞাত]..."

অধিকন্তু, মহান আল্লাহ্, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের অস্তিত্বের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন, এই বিষয়টি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে তিনি তাদের মৃত্যুর পরে পুনরুত্থিত করতে পারেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি যদি চান তবে পুনরুদ্ধার করতে পারেন। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে মানুষ প্রথম সৃষ্টিকে মেনে নিলেও দ্বিতীয় সৃষ্টিকে সন্দেহ করে। অধ্যায় ৬ আল মায়িদা, আয়াত ২:

"... তাহলে [এখনও] তুমি সন্দেহের মধ্যে আছো।"

বিচারের দিনে মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা অস্বীকার করা একটি অদ্ভুত দাবি, বিশেষ করে যখন সময়কালে ঘটে যাওয়া পুনরুত্থানের অনেক উদাহরণ বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বৃষ্টির মাধ্যমে অনুর্বর ভূমিকে জীবিত করেন

এবং একটি প্রাণহীন বীজকে অঙ্কুরিত করতে সক্ষম করেন, যার ফলে সৃষ্টি লালন-পালন করেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ মানুষকে পুনরুত্থিত করার ক্ষমতা রাখেন, ঠিক যেমন একটি মৃত বীজ মাটিতে পুঁতে ফেলার পরে জীবিত হয়ে ওঠে। ঋতুর চক্রাকার প্রকৃতি পুনরুত্থানের স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে; শীতকালে, গাছগুলি তাদের পাতা হারায় এবং প্রাণহীন বলে মনে হয়, তবুও অন্যান্য ঋতুতে, তারা তাদের পাতা এবং প্রাণশক্তি ফিরে পায়। অধিকন্তু, সমস্ত জীবের ঘুম-জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ হিসেবে কাজ করে, কারণ ঘুম অস্থায়ীভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুর অনুকরণ করে। মহান আল্লাহ, যাদের জাগ্রত করার জন্য তৈরি তাদের কাছে আত্মা ফিরিয়ে দেন, যার ফলে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। অধ্যায় 39 আয-যুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

অধিকন্তু, বিচার দিবস একটি অনিবার্য ঘটনা। মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করলে ভারসাম্যের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে একটি আদর্শ দূরত্ব বজায় রাখে; যেকোনো বিচ্যুতি এটিকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে। একইভাবে, জলচক্র, যার মধ্যে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবন এবং পরবর্তীকালে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত হয়, পৃথিবীতে জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ। মাটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সূক্ষ্ম চারাগাছের অঙ্কুরগুলি প্রবেশ করতে পারে এবং ভারী কাঠামোকে সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এই উদাহরণগুলি কেবল একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয় না বরং ভারসাম্যের নীতিকেও তুলে ধরে। যাইহোক, মানবজাতির কর্মকাণ্ডে

একটি উল্লেখযোগ্য ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান। নিপীড়ক ব্যক্তিদের পরিণতি এড়াতে দেখা সাধারণ, আবার অনেকে তাদের ধৈর্যের জন্য পর্যাপ্ত প্রতিদান না পেয়ে নিপীড়ন সহ্য করে। অসংখ্য মুসলিম যারা বিশ্বস্তভাবে আল্লাহকে মেনে চলেন, তারা প্রায়শই এই জীবনে কষ্টের সম্মুখীন হন, খুব কম পুরষ্কার পান, অন্যদিকে যারা মহান আল্লাহকে অমান্য করেন তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করেন। ঠিক যেমন মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনি কর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থাও এই ভারসাম্য প্রতিফলিত করা উচিত। যেহেতু বর্তমান পৃথিবীতে এটি স্পষ্টতই প্রযোজ্য নয়, তাই এটি পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে বিচারের দিনে বাস্তবায়িত হতে হবে।

আল্লাহ এই পৃথিবীতে ব্যক্তিদের পূর্ণ পুরষ্কার এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। তবে, এখানে সম্পূর্ণ শাস্তি না দেওয়ার একটি কারণ হল ব্যক্তিদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের কর্ম সংশোধন করার অসংখ্য সুযোগ প্রদান করা। মহান আল্লাহ, মুসলিমদের এই জীবনে তাদের পূর্ণ পুরষ্কার দেন না, কারণ এই পৃথিবী জান্নাতের প্রতিনিধিত্ব করে না। অধিকন্তু, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস, বিশেষ করে পরকালে মুসলমানদের জন্য অপেক্ষা করা সম্পূর্ণ পুরষ্কার, ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রকৃতপক্ষে, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসই ঈমানের পার্থক্য করে; যদি কেউ কেবল পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দৃশ্যমান বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করতে পারে, যেমন এই জীবনে পূর্ণ পুরষ্কার পাওয়া, তবে এর একই তাৎপর্য থাকবে না। পরকালে পূর্ণ পুরষ্কার পাওয়ার আশার সাথে মিলিত সম্পূর্ণ শাস্তির ভয় ব্যক্তিদের পাপপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত থাকতে এবং পুণ্যময় কর্মে নিযুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করে।

প্রতিফল দিবস শুরু হওয়ার জন্য, বস্তুজগতের সমাপ্তি অবশ্যই ঘটতে হবে। এর কারণ হল, সমস্ত কর্ম বন্ধ হয়ে গেলেই শাস্তি এবং পুরষ্কার প্রদান করা সম্ভব।

ফলস্বরূপ, প্রতিফল দিবস মানুষের কর্ম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ঘটতে পারে না, যার অর্থ হল বস্তুজগতের পরিণামে সমাপ্তি ঘটবে।

এই আলোচনাটি চিন্তা করলে বিচার দিবসের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হবে, ফলে ব্যক্তিরা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে অনুপ্রাণিত হবে। এটি তাদেরকে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম করবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২২:

"কারণ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রতিটি প্রাণী তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই একমাত্র প্রভু এবং ঈশ্বর, তিনিই একমাত্র বিশ্বজগত নিয়ন্ত্রণ করেন এবং বিচারের দিনে তিনিই তাঁর সৃষ্টির বিচার করবেন। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৩:

"আর তিনিই আল্লাহ, আসমান ও যমীনে [একমাত্র উপাস্য]..."

ইসলাম মানবজাতিকে নির্দেশ দেয় যে, সকল পরিস্থিতিতে আনুগত্যের যোগ্য একমাত্র সত্তা হলেন তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক, মহান আল্লাহ। প্রকৃতপক্ষে, আনুগত্যের লক্ষ্য এবং যে কাঠামোর উপর ভিত্তি করে মানুষ তার জীবন গড়ে তোলে, তা তাদের উপাসনার ধরণ, তা কোনও দেবতার প্রতি অবিশ্বাসের প্রকাশ না করেই। মানুষ সহজাতভাবে কিছু না কিছু মেনে চলা এবং আনুগত্য করার জন্য তৈরি, তা সে অন্য ব্যক্তি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, প্রবণতা, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, এমনকি তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতাই হোক না কেন। ২৫তম অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

একজন ব্যক্তির ইবাদত নির্ধারিত হয় তারা কাকে বা কী আনুগত্য করবে এবং অনুসরণ করবে তার উপর। অতএব, মুসলমানদের তাদের ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিকে এমন কর্মের সাথে পরিপূরক করতে হবে যা সকল পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য প্রদর্শন করে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। যারা এইভাবে আচরণ করে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

যারা মহান আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে এবং অন্য সত্তার উপাসনা করতে পছন্দ করে, তারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই শান্তি ও সাফল্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। এটি সত্য, এমনকি যদি তারা সমস্ত পার্থিব সম্পদের অধিকারী হয় এবং ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করে, কারণ শেষ পর্যন্ত, কেউই মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌমত্বকে এড়াতে পারে না। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় কেন উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, আয়াত ২:

" *আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ..."*

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর গঠন, এবং অসংখ্য সুনির্দিষ্টভাবে ক্যালিব্রেটেড সিস্টেম পরীক্ষা করলে, এটা স্পষ্ট যে একজন একক স্রষ্টা আছেন যিনি কেবল মহাবিশ্ব তৈরিই করেননি বরং রক্ষণাবেক্ষণও করেন। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম দূরত্ব একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ হিসেবে কাজ করে; এই দূরত্বের যেকোনো সামান্য বিচ্যুতি পৃথিবীকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে। অধিকন্তু, পৃথিবীকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং নির্মল বায়ুমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা জীবনকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম করবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... *এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন..."*

দিন ও রাতের সঠিক সময়সূচী এবং সারা বছর ধরে তাদের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিরা তাদের থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হয়। দীর্ঘ দিনের কারণে ক্লান্তি দেখা দিতে পারে, অন্যদিকে দীর্ঘ রাত জীবিকা নির্বাহ এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য উপলব্ধ সময়কে সীমাবদ্ধ করে দিতে পারে। বিপরীতে, ছোট রাত পর্যাপ্ত বিশ্রামে বাধা সৃষ্টি করবে, সর্বোত্তম স্বাস্থ্যের সাথে আপোস করবে। উপরন্তু, দিন ও রাতের সময়কালের পরিবর্তন কৃষিকাজের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে, যা মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের জীবিকা নির্বাহের উপর প্রভাব ফেলবে। মহাবিশ্বের মধ্যে দিন,

রাত এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার সুসংগত পরিচালনা মহান আল্লাহর একত্বের স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে কাজ করে, কারণ একাধিক দেবতার অস্তিত্বের ফলে পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষা তৈরি হবে, যা শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। অধ্যায় ২১ আল আম্বিয়া, আয়াত ২২:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... *এবং [বড়] জাহাজ যা সমুদ্রে চলাচল করে যা মানুষের উপকার করে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন..."*

অনবদ্য ভারসাম্যপূর্ণ জলচক্র পর্যবেক্ষণ একজন স্রষ্টার স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবে কাজ করে। সমুদ্র থেকে জল বাষ্পীভূত হয়, উপরে উঠে যায় এবং পরবর্তীতে ঘনীভূত হয়, যার ফলে পাহাড়ের উপর অ্যাসিডিক বৃষ্টিপাত হয়। এই পর্বতগুলি কার্যকরভাবে অ্যাসিডিক বৃষ্টিপাতকে নিরপেক্ষ করে, যা এটিকে মানুষ এবং প্রাণীর ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। এই নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার যেকোনো পরিবর্তনের ফলে গ্রহের মানুষ এবং বন্যপ্রাণী উভয়ের জন্যই বিপর্যয়কর পরিণতি হতে পারে। সমুদ্রের লবণাক্ততা জলকে দূষিত করে সামুদ্রিক জীবের পচনকে বাধা দেয়। যদি সমুদ্র দূষিত হয়ে যায়, তাহলে সামুদ্রিক জীবন বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এর ফলে সৃষ্ট

দূষণ স্থলজ জীবনের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলবে। সমুদ্রের জলের গঠন এমন যে এটি সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রকে সমর্থন করে এবং একই সাথে বৃহৎ জাহাজগুলিকে তার পৃষ্ঠে চলাচল করতে দেয়। জলের গঠনে সামান্য তারতম্য এই ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে, যার ফলে হয় সামুদ্রিক প্রাণীর বিকাশ ঘটতে পারে অথবা জাহাজগুলি জলে চলাচল করতে পারে, তবে উভয়ই একই সাথে নয়। আজও, বিশ্বব্যাপী পণ্য পরিবহনের জন্য সামুদ্রিক পরিবহন প্রধান পদ্ধতি হিসাবে রয়ে গেছে। সুতরাং, পৃথিবীতে জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য এই নিখুঁত ভারসাম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিবর্তন এক ধরণের মিউটেশনের প্রতিনিধিত্ব করে, যা প্রকৃতিতে সহজাতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। যাইহোক, অসংখ্য প্রজাতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তাদের একটি সুরেলা ভারসাম্য অর্জনের জন্য জটিলভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা তাদের নিজ নিজ পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়। এর একটি প্রধান উদাহরণ হল উট, যা চরম তাপ সহ্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং জল ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকতে পারে, যা এটিকে মরুভূমিতে জীবনের জন্য আদর্শ করে তোলে। অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 17:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ছাগলটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে তার শরীরের ভেতরের যেকোনো দূষিত পদার্থ তার উৎপাদিত দুধ থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে যায়, কারণ যেকোনো দূষণ দুধকে খাওয়ার অনুপযুক্ত করে তুলবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৬৬:

"আর অবশ্যই, তোমাদের জন্য পশুপালনের ক্ষেত্রে একটি শিক্ষা রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে - মলমূত্র ও রক্তের মধ্যে - বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

প্রতিটি প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল নির্ধারিত হয় যা নিশ্চিত করে যে কোনও একক প্রজাতি অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, মাছিদের আয়ুষ্কাল 3-4 সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত এবং তারা 500টি পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। যদি তাদের আয়ুষ্কাল বাড়ানো হয়, তাহলে মাছির সংখ্যা অত্যধিক হয়ে যেতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য সমস্ত প্রজাতিকে পরাজিত করতে পারে। বিপরীতে, উল্লেখযোগ্যভাবে দীর্ঘ আয়ুষ্কালযুক্ত অন্যান্য জীব কেবল সীমিত সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করে, যা তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এই ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত বলে মনে হয় এবং শুধুমাত্র বিবর্তন তত্ত্ব এর জন্য দায়ী হতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"... *এবং [তাঁর] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস এবং মেঘের পরিচালনা..."*

বায়ু পরাগায়নে বায়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা ফসল, গাছপালা এবং গাছের প্রজননকে সহজতর করে। ঐতিহাসিকভাবে, সামুদ্রিক নৌ চলাচলের জন্য বায়ু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা বিশ্বব্যাপী পণ্য পরিবহনের জন্য একটি প্রাথমিক পদ্ধতি হিসাবে রয়ে গেছে। উপরন্তু, বৃষ্টির মেঘগুলিকে নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থানান্তরিত করার জন্য বায়ু প্রয়োজনীয়, যা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে।

পৃথিবীর বায়ু ব্যবস্থা একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য দ্বারা চিহ্নিত; বাতাসের অনুপস্থিতি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে, অন্যদিকে অতিরিক্ত বাতাসও এই ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে। একইভাবে, বৃষ্টিপাতের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, কারণ অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত খরা এবং দুর্ভিক্ষের কারণ হতে পারে, অন্যদিকে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত মারাত্মক বন্যার কারণ হতে পারে। অধ্যায় ২৩ আল মু'মিনুন, আয়াত ১৮:

"আর আমরা আকাশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। এবং অবশ্যই, আমরা তা প্রত্যাহার করতে সক্ষম।"

এই অনবদ্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে দৈবক্রমে দায়ী করা যায় না এবং এটি স্পষ্টতই একজন স্রষ্টার প্রভাব প্রকাশ করে। যে কেউ এই অনবদ্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাগুলি বিবেচনা করে, সে যুক্তিসঙ্গতভাবে একজন একক স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না যিনি সমস্ত বিষয়ে কর্তৃত্ব রাখেন।

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, আয়াত ২:

" *আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ..."*

প্রকৃতপক্ষে, যে সত্তা মৃত্যুবরণ করতে পারে এবং জীবিকার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে, তাকে ঐশ্বরিক বলে বিবেচনা করা যায় না। এই সত্যটি স্বর্গ ও পৃথিবীর সকল প্রাণীকে ঐশ্বরিকতা থেকে বাদ দেয়, কেবল আল্লাহ ছাড়া। অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র স্রষ্টা এবং সকল সৃষ্টির পালনকর্তা, তাই তিনিই আনুগত্যের যোগ্য। যে ব্যক্তি অন্যের কিছু চাহিদা, যেমন বাসস্থান, পূরণ করে, তার কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য, তবে কেবল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই যথেষ্ট, যিনি এই মহাবিশ্বে তাদের উপর সমস্ত আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, আন্তরিক নিয়ত থেকে উদ্ভূত প্রকৃত কৃতজ্ঞতার মধ্যে কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা জড়িত; যারা অন্য উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করে তারা তাঁর কাছ থেকে পুরষ্কার পাবে না, যেমন জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বর হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে। বিশুদ্ধ নিয়তের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত হল অন্যদের কাছ থেকে স্বীকৃতি বা পুরষ্কারের প্রত্যাশা না করা। মৌখিক কৃতজ্ঞতা বলতে হয় ইতিবাচক কথা বলা অথবা নীরবতা বেছে নেওয়া বোঝায়, অন্যদিকে কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা বলতে বোঝায় যে, আল্লাহ তাআলা যে আশীর্বাদ পেয়েছেন তা এমনভাবে ব্যবহার করা যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এই অভ্যাস আশীর্বাদ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে এবং পরিণামে ইহকাল ও পরকালে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"... যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের [অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

অধিকন্তু, যখন কোন ব্যক্তির কোন জিনিস থাকে, তখন তার ইচ্ছামত তা ব্যবহার করা উপযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ, মানবজাতি সহ, মহাবিশ্বে বিদ্যমান সবকিছুর স্রষ্টা, মালিক এবং প্রতিপালক, তাই তিনিই একমাত্র নির্ধারণ করেন যে মহাবিশ্বের মধ্যে কী ঘটবে এবং কী ঘটবে না। অতএব, ব্যক্তিদের জন্য কেবল মহান আল্লাহ, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের, এমনকি নিজেদেরও, একমাত্র মালিক, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত।

একইভাবে, যখন একজন ব্যক্তি অন্য কাউকে তার সম্পত্তি ধার দেয়, তখন ঋণগ্রহীতা কেবল মালিকের ইচ্ছানুযায়ী জিনিসটি ব্যবহার করে। মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির প্রতিটি আশীর্বাদ উপহার হিসেবে নয় বরং সাময়িক ঋণ হিসেবে দান করেছেন। পার্থিব ঋণের মতো, এই ঐশ্বরিক ঋণেরও পরিশোধ প্রয়োজন। এই ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায় হল এই আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। বিপরীতে, জান্নাতের আশীর্বাদ উপহার হিসেবে দেওয়া হয়, যা ব্যক্তিদের তাদের ইচ্ছামত তা উপভোগ করার স্বাধীনতা দেয়। অধ্যায় ৭ আল আ'রাফ, আয়াত ৪৩:

"...এবং তাদেরকে বলা হবে, "এটি সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ তোমাদের কর্মের জন্য।"

অতএব, জান্নাতের চিরস্থায়ী উপহারের জন্য কেবল ঋণ হিসেবে বিবেচিত পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে ভুল করা উচিত নয়।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ২-৩ আয়াত:

"তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর একটি নির্দিষ্ট সময় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন যা তিনি জানেন; তবুও তোমরা সন্দেহে আছো। আর তিনিই আল্লাহ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে [একমাত্র উপাস্য]..."

যেহেতু বিচার দিবসে মানুষকে তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তাই মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন যে, যেহেতু তিনি সমস্ত গোপন এবং প্রকাশ্য বিষয় জানেন, তাই মানুষের জবাবদিহি করা তাঁর জন্য সহজ। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৩:

"...তিনি তোমাদের গোপন কথা এবং তোমরা যা প্রকাশ করো তা জানেন, এবং তোমরা যা অর্জন করো তাও তিনি জানেন।"

ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণাবলী যা আল্লাহর একত্ববাদ এবং বিচার দিবসের বাস্তবতা নির্দেশ করে, যার কিছু আগে আলোচনা করা হয়েছে, তবুও অনেক মানুষ এখনও এই প্রমাণগুলিকে উপেক্ষা করে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে চলেছে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৪:

"আর তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী থেকে এমন কোন নিদর্শন আসে না যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।"

মানুষ কেন এইভাবে আচরণ করে তার একটি প্রধান কারণ হল ইসলামের শিক্ষা তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তারা যখন তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ব্যবহার করতে চায়, তখন তারা ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণগুলিকে উপেক্ষা করে। যে ব্যক্তি এই মনোভাব ধরে রাখে সে কেবল একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এটি তাদের উভয় জগতেই অসুবিধা, চাপ এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি যদি তারা কিছু পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য ইসলামী নীতিগুলি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে, এমনকি যখন এই নীতিগুলি তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ অনুসরণ করেন, বুঝতে পারেন যে এটি তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে, নির্ধারিত চিকিৎসা এবং খাদ্যতালিকাগত বিধিনিষেধের অপ্রীতিকর প্রকৃতি সত্ত্বেও। ঠিক যেমন এই জ্ঞানী রোগী উন্নত মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করেন, তেমনি ইসলামী শিক্ষা মেনে চলা ব্যক্তিও উন্নত মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন। এর কারণ হলো, একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই একজন ব্যক্তিকে একটি সুসংগত মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে

যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। সমাজের মধ্যে মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার সম্মিলিত বোধগম্যতা, ব্যাপক গবেষণা সত্ত্বেও, সর্বদা এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে, কারণ এটি একজন ব্যক্তির সম্মুখীন হওয়া প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে না, না এটি সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ প্রতিরোধ করতে পারে, না জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতার কারণে জীবনের সকল দিকের যথাযথ স্থান নিশ্চিত করতে পারে। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে, যা তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতিকে দান করেছেন, তাঁর উপর শান্তি ও শান্তি বর্ষিত হোক। যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রাপ্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না তাদের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করলে এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও রোগীদের প্রায়শই তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি সম্পর্কে ধারণা থাকে না এবং এইভাবে তাদের ডাক্তারদের উপর অন্ধ বিশ্বাস রাখে, তবুও, আল্লাহ তাআলা ব্যক্তিদের ইসলামের শিক্ষাগুলি চিন্তা করতে উৎসাহিত করেন যাতে তারা তাদের জীবনে এর উপকারী প্রভাব বুঝতে পারে। তিনি ইসলামী শিক্ষার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের দাবি করেন না; বরং তিনি চান যে ব্যক্তিরা স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে তাদের সত্যতা স্বীকার করুক। তবে, এর জন্য প্রয়োজন একজনকে খোলামেলা এবং নিরপেক্ষ মানসিকতার সাথে ইসলামের শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাওয়া। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের উপর একমাত্র কর্তৃত্বকারী, মনের শান্তির আবাসস্থল, তাই তিনিই একমাত্র নির্ধারণ করেন

যে কাকে এটি দেওয়া হবে এবং কাকে দেওয়া হবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরই প্রশান্তি দান করবেন যারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৪র্থ আয়াত:

"আর তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী থেকে এমন কোন নিদর্শন আসে না যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।"

ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণ থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে চলে, যদিও এটি তাদের উভয় জগতেই কেবল দুর্দশার দিকে পরিচালিত করে, তার আরেকটি প্রধান কারণ হল অন্যদের অন্ধ অনুকরণ। যখন কেউ সমাজের অধিকাংশ লোককে ইসলামী শিক্ষা উপেক্ষা করতে দেখে, তখন তারা বিশ্বাস করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের আচরণ অবশ্যই সঠিক এবং ফলস্বরূপ, তারা চিন্তাভাবনা বা প্রতিফলন ছাড়াই সেগুলি অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে,

সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামত সর্বদা সঠিক হয় না। ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে কীভাবে কোনও কিছু সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামত বা বিশ্বাস নতুন প্রমাণ এবং জ্ঞানের মাধ্যমে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল, যেমন পৃথিবী সমতল ছিল এই মিথ্যা বিশ্বাস। সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের সাথে অবিবেচনা করে গবাদি পশুর মতো আচরণ করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য, কারণ এর ফলে প্রায়শই ধর্মনিরপেক্ষ এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিবর্তে, ব্যক্তিদের জ্ঞান এবং প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য তাদের প্রদত্ত যুক্তি এবং বুদ্ধি ব্যবহার করা উচিত, যাতে তারা জ্ঞানী সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এমনকি যদি এই সিদ্ধান্তগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রচলিত মতামত থেকে ভিন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই কারণে ইসলাম অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করার তীব্র সমালোচনা করে এবং তাই মুসলমানদের বোঝার সাথে ইসলামী শিক্ষা শিখতে এবং কাজ করতে উৎসাহিত করে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮ :

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এরপর মহান আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে বলেন যে, তারা যেন সত্য, এই পৃথিবীতে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা উপেক্ষা না করে, কারণ তিনি তাদেরকে যে অবকাশ দেন তা ক্ষণস্থায়ী এবং অবশেষে তারা উভয় জগতেই তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করবে। ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ৫:

"কারণ তারা সত্যকে অস্বীকার করেছিল যখন তা তাদের কাছে এসেছিল, কিন্তু তারা যা উপহাস করত তার সংবাদ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌঁছাবে।"

যে ব্যক্তি তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তাকে এই ভেবে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাৎক্ষণিক শাস্তির অভাব বা শাস্তি স্বীকার করতে ব্যর্থতার অর্থ হল তারা সম্পূর্ণরূপে পরিণতি থেকে বেঁচে যাবে। তাদের মানসিকতা তাদের একটি সুসংগত মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করবে এবং এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে। ফলস্বরূপ, পরিবার, বন্ধুত্ব, ক্যারিয়ার এবং সম্পদের মতো দিকগুলি চাপের উৎসে রূপান্তরিত হবে। যদি তারা আল্লাহকে অমান্য করতে থাকে, তাহলে তারা অন্যায়ভাবে তাদের চারপাশের লোকদের, যেমন তাদের স্ত্রীকে, তাদের জন্য তাদের কষ্টের কারণ হিসেবে দায়ী করবে। এই ইতিবাচক প্রভাবগুলির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তারা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলিকে আরও খারাপ করার ঝুঁকি নেয়, সম্ভাব্যভাবে হতাশা, মাদকাসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাভাবনায় পরিণত হয়। এই ধরণটি এমন ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয় যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে চলেছে, যার মধ্যে ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত, বস্তুগত আরাম-আয়েশের আপাতদৃষ্টিতে উপভোগ করা সত্ত্বেও। কিন্তু পরকালে এই ব্যক্তির জন্য যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা অনেক খারাপ এবং দীর্ঘস্থায়ী।

এরপর মহান আল্লাহ মানুষকে ইতিহাসের মানুষের জীবনযাত্রার পছন্দ এবং সম্প্রসারণ, তাদের চারপাশের মানুষদের জীবনযাত্রা এবং এই মানুষদের যে পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করেন, যাতে তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৬:

" তারা কি দেখেনি যে, তাদের পূর্বে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমন তোমাদেরকে করিনি? আর আমরা তাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের তলদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম; তারপর তাদের পাপের কারণে আমরা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং তাদের পরে অন্য প্রজন্মের উদ্ভব করেছিলাম।"

সাধারণভাবে, এই আয়াতটি ব্যক্তিদেরকে আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এড়াতে উৎসাহিত করে, যেখানে তারা কেবল তাদের নিজস্ব জীবন এবং চ্যালেঞ্জের উপর মনোনিবেশ করে। যারা এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তারা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, সেইসাথে তাদের চারপাশের পরিস্থিতি থেকে শেখার সুযোগ হারায়। এই উপাদানগুলি থেকে জ্ঞান অর্জন করা হল নিজের আচরণ উন্নত করার এবং পূর্ববর্তী ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি, যা শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ শান্তি বৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ, ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি নষ্ট করতে দেখা, কেবল চাপ, মানসিক স্বাস্থ্য সংগ্রাম, আসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার ধারণায় জর্জরিত হওয়া - সুখ এবং ঐশ্বর্যের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত সত্ত্বেও - একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে কাজ করে। এটি দর্শকদের তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয় , এই ধারণাটিকে আরও দৃঢ় করে যে প্রকৃত মানসিক শান্তি বস্তুগত সম্পদ বা প্রতিটি পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা থেকে আসে না। একইভাবে, দুর্বল স্বাস্থ্যে থাকা কাউকে দেখলে নিজের মঙ্গলের প্রতি উপলব্ধি গড়ে তোলা উচিত এবং তা কেড়ে নেওয়ার আগে এর যথাযথ ব্যবহারকে উৎসাহিত করা উচিত। অতএব, ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এতটাই মগ্ন না হয়ে সচেতন এবং পর্যবেক্ষণশীল থাকতে উৎসাহিত করে যে তারা তাদের চারপাশের বিস্তৃত জগৎকে অবহেলা করে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 6:

" তারা কি দেখেনি যে, তাদের পূর্বে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমন তোমাদেরকে করিনি? আর আমরা তাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের তলদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম; তারপর তাদের পাপের কারণে আমরা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং তাদের পরে অন্য প্রজন্মের উদ্ভব করেছিলাম।"

কিন্তু ইসলামী শিক্ষার মধ্যে, মহাবিশ্বে এবং ইতিহাসের মধ্যে প্রচুর প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, যারা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট প্রমাণ উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কারণ তাদের লক্ষ্য কেবল তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা, তারা সত্য গ্রহণ করবে না বা তার উপর কাজ করবে না। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 7:

"আর যদি আমি তোমার উপর কোন লিখিত কিতাব নাযিল করতাম, আর তারা তা তাদের হাত দিয়ে স্পর্শ করত, তবুও কাফেররা বলত, "এটা তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।"

এর থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি জ্ঞান ও প্রমাণের কাছে, তা সে পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, উন্মুক্ত ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে যায় না, সে এর দ্বারা উপকৃত হবে না এবং বরং ভুল পথেই লেগে থাকে। এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ যে ব্যক্তি প্রমাণ ও জ্ঞান থেকে তাদের মনকে বন্ধ করে রাখে এবং পরিবর্তে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে, সে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক নির্দেশনা অর্জন করতে পারে না। মক্কার অমুসলিম নেতাদের এই মনোভাব ছিল, যাদের নেতৃত্ব এবং সামাজিক প্রভাব হারানোর ভয় তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে উৎসাহিত করেছিল। ফলস্বরূপ, তারা ভিত্তিহীন এবং বোকামিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করে। অধ্যায় ষষ্ঠ আল আন'আম, আয়াত ৮:

"এবং তারা বলে, "তার কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হয়নি?"...

ঈমান মূলত অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল; এই বিশ্বাস ছাড়া এর তাৎপর্য হ্রাস পায়। যদি ফেরেশতাদের মতো সত্ত্বাকে এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান করা হয়, তাহলে তা ঈমানের সারমর্মকে দুর্বল করে দেবে। তবুও, এই অদৃশ্য দিকগুলির অস্তিত্ব আকাশ ও পৃথিবী উভয় স্থানে পাওয়া অসংখ্য নিদর্শন এবং প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি চিত্রকলার অস্তিত্ব একজন চিত্রকরের উপস্থিতি নির্দেশ করে, ঠিক যেমন সৃষ্টির জটিলতা একজন স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে, বিশেষ করে যখন সৃষ্টি নিখুঁতভাবে প্রদর্শিত হয়। তদুপরি, এমন অনেক বাস্তব বাস্তবতা রয়েছে যা ব্যক্তিরা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে না পারলেও দ্বিধা ছাড়াই ব্যবহার করতে পারে। এর একটি প্রধান উদাহরণ হল ঔষধের ব্যাপক ব্যবহার, যেখানে অনেক ব্যক্তি মানবদেহের মধ্যে এর প্রক্রিয়াগুলি উপলব্ধি না করেই এটি গ্রহণ করে। যদিও ইসলামের মাধ্যমে মানবতাকে প্রদত্ত নৈতিক কাঠামো প্রমাণ এবং যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনার উপর দৃঢ়ভাবে প্রোথিত, ইসলামের কিছু উপাদান সহজাতভাবে অদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা ঈমানের মূল্য বৃদ্ধি করে। ফলস্বরূপ, যে ব্যক্তি এই অদৃশ্য সত্ত্বা, যেমন ফেরেশতাদের প্রত্যক্ষ করে, তার ঈমান আল্লাহ, মহিমান্বিত দ্বারা স্বীকৃত হবে না, কারণ অদৃশ্যে বিশ্বাস করা একবার পর্যবেক্ষণ করা হলে তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 8:

"আর তারা বলে, "তার কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হল না?" আর যদি আমি কোন ফেরেশতা নাযিল করতাম, তাহলে ব্যাপারটির মীমাংসা হয়ে যেত; তারপর তাদের অবকাশ দেওয়া হত না।"

মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা হলো বাস্তবতাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা, এমনকি যখন তা তাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সরাসরি উপলব্ধি করা যায় না, এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা, যদিও তার অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতা তাদের আছে। নবীগণকে প্রেরণ করে এবং ঐশী কিতাব নাজিল করে, আল্লাহ, মহান, নিশ্চিত করেছেন যে মানুষের বিচারবুদ্ধি এবং আনুগত্য পরীক্ষা করার সুযোগ রয়েছে। তিনি কখনও বাস্তবতাকে এতটা প্রকাশ করেননি যে ব্যক্তিরা প্রশ্ন ছাড়াই তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। যদি তাই হয়, তাহলে সাফল্য এবং ব্যর্থতার ধারণাগুলি তাদের তাৎপর্য হারাবে। অতএব, ব্যক্তিদের আশা করা উচিত নয় যে আল্লাহ, মহান এবং তাঁর ফেরেশতারা তাদের সামনে প্রকাশ পাবে, কারণ এই ধরনের ঘটনা সমস্ত কিছুর সমাপ্তি নির্দেশ করবে, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনও সুযোগ রাখবে না। বিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মূল্য কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবতাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যা তাকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ দেয়। যদি সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হত এবং ব্যক্তিরা মহাবিশ্ব এবং পরকালের অদৃশ্য দিকগুলি প্রত্যক্ষ করতে পারত, তাহলে তাদের বিশ্বাস এবং আনুগত্যের কোনও গুরুত্ব থাকত না। যদি এই উপাদানগুলি শারীরিকভাবে দৃশ্যমান হত, তাহলে সবচেয়ে একগুঁয়ে কাফের এবং সবচেয়ে বড় পাপীও প্রত্যাখ্যান বা অবাধ্যতা করত না। বিশ্বাস এবং আনুগত্যের গ্রহণযোগ্যতা কেবল তখনই তার মূল্য বজায় রাখে যখন একটি পর্দা বাস্তবতাকে আড়াল করে দেয়। বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হওয়ার মুহূর্তটি ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের সমাপ্তি এবং তাদের পরীক্ষার সময়, অর্থাৎ বিচারের দিন, সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়।

অধিকন্তু, একজন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভূমিকা বিশেষভাবে মানবজাতির জন্য তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে ফেরেশতাদের মতো সত্তাকে এই ক্ষমতায় প্রেরণ করা অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। একজন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে কীভাবে আচরণ করতে

হবে তার একটি বাস্তব উদাহরণ প্রদান করা। মানুষের বিপরীতে, ফেরেশতারা ক্লান্তির মতো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন না, যা মানুষের ফেরেশতা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করবে, যার ফলে তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারবে। অতএব, যদি আল্লাহ্‌, একজন ফেরেশতাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মতো নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, তবুও তাকে মানুষের রূপ দিতে হবে যাতে মানুষ কার্যত তাকে অনুসরণ করতে পারে। সূরা ৬ আল-আন'আম, আয়াত ৯:

"আর যদি আমরা তাকে ফেরেশতা বানাতাম, তাহলে তাকে মানুষ হিসেবেই দেখাতাম, আর আমরা তাদেরকেও সেই বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন করে ফেলতাম যা তারা নিজেদেরকে আচ্ছন্ন করে।"

তাহলে, কেন অমুসলিমরা অবাক হয়েছিল যে একজন মানুষকে অন্যদের সতর্ক করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল? একইভাবে, মানবজাতির নেতৃত্বের জন্য একজন পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিযুক্ত করা কি অস্বাভাবিক? যদি ব্যক্তিরা বিভ্রান্তিতে ডুবে থাকে এবং সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তাহলে যা সত্যিই অসাধারণ: তাদের স্রষ্টা এবং প্রভু তাদের পথ দেখানোর জন্য পদক্ষেপ নেবেন, অথবা তাদেরকে ভুল পথেই থাকতে দেওয়া হবে? অধিকন্তু, যদি মানবজাতিকে ঐশ্বরিক নির্দেশনা দেওয়া হয়, তাহলে কি এটা যুক্তিসঙ্গত নয় যে যারা এটিকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের চেয়ে বরং যারা এটিকে গ্রহণ করে এবং মেনে চলে, তারাই আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত হওয়া উচিত? যারা এতে অবিশ্বাস প্রকাশ করে তাদের প্রতিক্রিয়া আসলে বেশ অসাধারণ।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সতর্ক করেন যারা সত্যের প্রতি তাদের মনকে আবদ্ধ করে রাখে এবং কেবল তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণের লক্ষ্য রাখে। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০:

"আর তোমার পূর্বেও রসূলগণকে উপহাস করা হয়েছে, অতঃপর যারা তাদেরকে উপহাস করেছিল, তাদেরকে সেই উপহাসই ঘিরে ফেলেছে যা তারা উপহাস করত।"

যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তারা উভয় জগতেই তাদের কর্মের পরিণতি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকবে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাতের সম্মুখীন হবে এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে হারিয়ে ফেলবে, যা শেষ পর্যন্ত বিচারের দিনে জবাবদিহিতার জন্য তাদের প্রস্তুতিকে বাধাগ্রস্ত করবে। এই ব্যাঘাত উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করবে, তারা যে কোনও বস্তুগত সম্পদ উপভোগ করুক না কেন। মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের মতো মনোভাব পোষণকারী এবং তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে এই পরিণতি এড়াতে উৎসাহিত করেন। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১১:

"বলুন, "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো; তারপর দেখো কেমন হয়েছিল মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটি মুসলমানদেরকে এমন আত্মমগ্ন মনোভাব গ্রহণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে যেখানে তারা ইতিহাসের বা তাদের সময়ে বসবাসকারী অন্যান্য মানুষের কর্মের পরিণতি থেকে শিক্ষা নেয় না। একজনকে কেবল ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কীভাবে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং ফলস্বরূপ তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করার পরেও কীভাবে দুঃখজনক জীবনযাপন করে। অতএব, একজনকে অবশ্যই এমন পর্যবেক্ষণশীল মনোভাব গ্রহণের থেকে সঠিক নির্দেশনা পেতে হবে যেখানে তারা অন্যদের ভুল এবং তাদের নিজস্ব ভুল থেকে শিক্ষা নেয় যাতে তারা জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

কিন্তু কেউ ইতিহাসের ঘটনাবলী এবং তার চারপাশের মানুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক, যাতে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে, কারণ মহান আল্লাহ একাই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং এর মালিক, তিনি উভয় জগতেই প্রত্যেককে তাদের পছন্দের জন্য জবাবদিহি করবেন। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 12:

"বলুন, "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার?" বলুন, "আল্লাহর।"..."

পরিশেষে, যেহেতু সমস্ত সৃষ্টি একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার মালিকানাধীন এবং পরিচালিত, তাই ব্যক্তিদের অবশ্যই তাঁর আদেশ পালন করতে হবে। যেমন একজন ব্যক্তি একটি জাতির আইন মেনে না চলার জন্য পরিণতি ভোগ করতে পারে, তেমনি মহাবিশ্বের সার্বভৌম কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মকানুন উপেক্ষা করলে তারা এই পৃথিবী এবং পরকালে উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যার সম্মুখীন হবে। যদিও একজন ব্যক্তি তার আইনের প্রতি অসন্তুষ্টির কারণে একটি দেশ ছেড়ে চলে যেতে বেছে নিতে পারেন, তারা এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবেন না যেখানে মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব

বিদ্যমান নেই। যদিও ব্যক্তিরা সামাজিক রীতিনীতিগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে, তারা মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক আইন পরিবর্তন করতে পারে না। অধিকন্তু, একজন গৃহকর্তার মতো যিনি বাইরের মতামত নির্বিশেষে তাদের সম্পত্তির জন্য নিয়ম নির্ধারণ করেন, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, যিনি মানুষের সম্মতি ছাড়াই একা তার আইন প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব, এই ঐশ্বরিক নিয়মগুলি অনুসরণ করা নিজের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা এই বাস্তবতা বোঝে তারা মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুসারে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো এমনভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে যা তাঁকে খুশি করে। ব্যক্তিরা হয় আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে চেষ্টা করতে পারে, নিজেদের এবং সমাজের জন্য এর উপকারিতা স্বীকার করে, যা উভয় জগতে শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা তারা তাদের আকাঙ্ক্ষার কাছে নতি স্বীকার করতে পারে এবং ইসলামের নীতিমালা উপেক্ষা করতে পারে। তবে, যারা ইসলামী নির্দেশিকা উপেক্ষা করে তাদের উভয় জগতেই তাদের পছন্দের পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, কারণ কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগই তাদের পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল-কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমি জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা ত্রাণ প্রার্থনা করে, তবে তাদের ত্রাণ ঘোলা তেলের মতো জল দিয়ে ত্রাণ করা হবে, যা [তাদের] মুখ পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট, আর বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

যেহেতু মহান আল্লাহ একাই বিশ্বজগতকে শাসন করেন, তাই তিনি করুণা ও উদারতার উপর ভিত্তি করে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে বেছে নিয়েছেন। ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ১২:

"...তিনি নিজের উপর রহমত ফরজ করেছেন..."

সৃষ্টির উপর, বিশেষ করে মানুষের উপর, তাঁর অবিরাম অবাধ্যতা সত্ত্বেও, তিনি যে অগণিত এবং অবিরাম আশীর্বাদ বর্ষণ করেন তা দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি কেবল তাদের তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করবে। ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা হল আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখা, এবং এই জীবনে এবং পরকালে তাঁর রহমত ও ক্ষমার আশা করা। ইসলামে এই মনোভাবের কোনও মূল্য নেই। অন্যদিকে, প্রকৃত আশার অর্থ হল আল্লাহকে আনুগত্য করার প্রচেষ্টা করা, যার অর্থ ইসলামী শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তিনি যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা ব্যবহার করা এবং উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আন্তরিক প্রত্যাশা করা। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতএব, এই পার্থক্যটি বোঝা এবং আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রতি প্রকৃত আশা জাগানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা এই জীবনে বা পরকালে কোনও উপকারে আসবে না। ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১২:

"...তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই.."

আল্লাহ তাআলার রহমতের উপর প্রকৃত আশা গ্রহণ করা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে প্রস্তুত হতে পারে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। কিন্তু যারা তা করতে ব্যর্থ হয় তারা বিচারের দিনে সমস্যা, অসুবিধা এবং চাপের সম্মুখীন হবে। প্রকৃতপক্ষে, যে মুসলিম বিচারের দিনে তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়, তারা হয়তো তাদের ঈমান ছাড়াই বিচারের দিনে পৌঁছাতে পারে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১২:

"... যারা [সেদিন] নিজেদের ক্ষতি করবে তারা বিশ্বাস করবে না।"

এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্বাস হল এমন একটি উদ্ভিদের মতো যার বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকার জন্য বাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ড থেকে পুষ্টি প্রয়োজন। একটি উদ্ভিদ যেমন পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় না এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাস বিনষ্ট হতে পারে যদি এটি বাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ড দ্বারা সমর্থিত না হয়। এটি সবচেয়ে বড় ক্ষতির ইঙ্গিত দেয়।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১২:

"...তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যারা [সেদিন] নিজেদের ক্ষতি করবে তারা বিশ্বাস করবে না।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, বিচারের দিনে মানুষের পুনরুত্থান অবাস্তব বলে দাবি করা একটি অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে যখন কেউ ইতিহাস জুড়ে পুনরুত্থানের অসংখ্য ঘটনা বিবেচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বৃষ্টির মাধ্যমে অনুর্বর ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং একটি প্রাণহীন বীজকে অঙ্কুরিত হতে দেন, যার ফলে সৃষ্টির লালন-পালন হয়। একইভাবে, মহান আল্লাহ মানুষকে পুনরুত্থিত করার ক্ষমতা রাখেন, ঠিক যেমন একটি মৃত বীজ মাটিতে পুনরুত্থিত হওয়ার পরে জীবিত হয়। ঋতুগুলির চক্রাকার প্রকৃতি পুনরুত্থানের একটি প্রাণবন্ত প্রতিনিধিত্ব হিসাবে কাজ করে; শীতকালে, গাছগুলি তাদের পাতা ঝরে পড়ে এবং প্রাণহীন দেখায়, তবুও অন্যান্য ঋতুতে, তারা তাদের পাতা এবং প্রাণশক্তি ফিরে পায়। অতিরিক্তভাবে, সমস্ত জীবের ঘুম-জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের উদাহরণ দেয়, কারণ ঘুম সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মহান আল্লাহ, যাদের জাগ্রত করার জন্য নির্ধারিত তাদের আত্মা পুনরুদ্ধার করেন, এইভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। অধ্যায় 39 আয-যুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

তাছাড়া, বিচার দিবস একটি অনিবার্য ঘটনা। মহাবিশ্বের যত্ন সহকারে পরীক্ষা করলে ভারসাম্যের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে

সর্বোত্তম দূরত্বে অবস্থিত; যেকোনো পরিবর্তন এটিকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে। একইভাবে, জলচক্র, যার মধ্যে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবন এবং পরবর্তীকালে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত হয়, পৃথিবীতে জীবনকে সমর্থন করার জন্য সঠিকভাবে ক্রমাঙ্কিত করা হয়েছে। মাটি ভঙ্গুর চারা অঙ্কুরগুলিকে উত্থিত হতে দেওয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে এবং ভারী কাঠামো সহ্য করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এই ঘটনাগুলি কেবল একজন স্রষ্টার উপস্থিতি নির্দেশ করে না বরং ভারসাম্যের ধারণাকেও জোর দেয়। যাইহোক, মানুষের কর্মকাণ্ডে একটি গভীর ভারসাম্যহীনতা স্পষ্ট। প্রায়শই দেখা যায় যে নিপীড়ক ব্যক্তিরা প্রতিশোধ থেকে রক্ষা পায়, আবার অনেকে তাদের ধৈর্যের জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পেয়ে নিপীড়নের শিকার হয়। অসংখ্য মুসলিম যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলেন, তারা প্রায়শই এই জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হন, কেবল আংশিক পুরষ্কার পান, অন্যদিকে যারা মহান আল্লাহকে অমান্য করেন তারা পার্থিব আনন্দ উপভোগ করেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত যে, একমাত্র স্রষ্টা, মহান আল্লাহ, যিনি এই মহাবিশ্বের অন্যান্য সকল ব্যবস্থায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনিই মানবজাতির কর্মকাণ্ডকেও সংশোধন করবেন, যা এই বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্যহীনতার প্রতিনিধিত্ব করে। কর্মের এই সংশোধন ঘটানোর জন্য, প্রথমে মানুষের কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। এটি ঘটবে কিয়ামতের দিন যখন ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করা হবে এবং অনন্তকালের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ করা হবে।

এই আলোচনার উপর চিন্তা করলে একজন ব্যক্তির কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হবে, যার ফলে তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের যথাযথ ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবে। এটি ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। সূরা ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ২২:

"কারণ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রতিটি প্রাণী তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

যেহেতু মহান আল্লাহ, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, মালিক এবং নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই উভয় জগতেই জবাবদিহিতার মুখোমুখি হওয়া অনিবার্য। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৩:

"আর যা রাতে ও দিনে স্থায়ী হয়, তা তাঁরই.."

অতএব, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এর জন্য বাস্তবিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, উপেক্ষা করার পরিবর্তে, কারণ এটি এটিকে ঘটতে বাধা দেবে না। এবং যেহেতু মহান আল্লাহ সকল মানুষের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে জানেন, তাই কোনও ভুল করা হবে না এবং সঠিক আচরণ না করার জন্য তাদের কাছ থেকে কোনও অজুহাত গ্রহণ করা হবে না। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৩:

"...এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

এবং ৩০ নম্বর অধ্যায় আর রুম, ৫৭ নম্বর আয়াত:

"অতএব, সেদিন তাদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না যারা অন্যায় করেছে এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ, মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সবকিছু জানেন, তাই একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করা উচিত এবং কখনও অবাধ্য হওয়া উচিত নয়, কারণ তিনিই উভয় জগতের ক্ষতিকারক জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারেন এবং উভয় জগতের কল্যাণ অর্জনের জন্য তাদের পথ দেখাতে পারেন। ষষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৪:

"বলুন, "আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করব, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, অথচ তিনিই আহার দেন এবং তাঁকে আহার দেওয়া হয় না?"..."

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, মহান আল্লাহ মানুষের আনুগত্য থেকে কোন লাভবান হন না এবং তাই উভয় জগতেই তাদের সাহায্য করার পেছনে তাঁর কোন গোপন উদ্দেশ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে, তিনি যা কিছু উপদেশ দেন এবং সতর্ক করেন তার লক্ষ্য কেবল মানুষের কল্যাণ। অতএব, তাদের আকাঙ্ক্ষা ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হলেও, তাদের নিজেদের স্বার্থেই তাঁর আনুগত্য করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, নিজের আকাঙ্ক্ষা পরিচালনা করা মন এবং শরীরের প্রশান্তি অর্জনের জন্য একটি

ক্ষুদ্র ত্যাগ, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সর্বোত্তম শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য তাদের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে। বিপরীতে, যারা তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে না তাদের জন্য জীবন একটি অন্ধকার কারাগারে রূপান্তরিত হয়। ধনী এবং বিখ্যাতদের জীবন পর্যবেক্ষণ করলে এটি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকাকালীন সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনের মধ্যে স্থান দেবে। অতএব, একজনকে অবশ্যই মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, কার্যত নিজের জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪:

"... বলুন, "নিশ্চয়ই, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী হই এবং [আদেশ দেওয়া হয়েছিল], 'কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাঁর অবাধ্য হয়, সে একটি ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে ফেলে দেয় এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, এমনকি যদি তারা কিছু পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ১৫:

"বলুন, "আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এই ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর অবাধ্য হলে শাস্তি পাওয়ার আশঙ্কা করছেন, যা এই মিথ্যা বিশ্বাসকে দূর করে যে, কিছু লোক আল্লাহর প্রিয়জন হওয়ায় তাদের মুক্তি নিশ্চিত। প্রত্যেক ব্যক্তির বিচার তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মের ভিত্তিতে করা হবে এবং কিয়ামতের দিন কাউকে বিশেষ অনুগ্রহ দেওয়া হবে না কারণ এটি সরাসরি আল্লাহর ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচারকে চ্যালেঞ্জ করবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

যেহেতু একমাত্র আল্লাহই বিচারের দিনে মানুষকে শাস্তি দেবেন অথবা তাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন, তাই এই পৃথিবীতে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে তাঁর রহমত অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। যেমন কেউ প্রকৃত সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা ছাড়া ডাক্তার হওয়ার মতো পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে না, তেমনি সংগ্রাম ছাড়া উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমত অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব,

যদি কেউ কার্যত তাঁর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের এই পৃথিবীতে বা পরকালে তাঁর রহমত পাওয়ার আশা করা উচিত নয়। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৬:

"যার কাছ থেকে সেদিন শাস্তি দূর করা হবে, তাকে তিনি রহমত দান করেছেন। আর এটাই স্পষ্ট সাফল্য।"

ঠিক যেমন মহান আল্লাহ বিচারের দিনে মানুষকে শাস্তি দেবেন এবং রহমত দান করবেন, তেমনি তিনিই এই পৃথিবীর মানুষের বিষয়গুলিও নিয়ন্ত্রণ করেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৭:

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাকে কোন কল্যাণ দেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

যে ব্যক্তি এই বাস্তবতা বোঝে সে কখনোই আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কারো আনুগত্য করবে না, এবং তারা সৃষ্টিকে, যেমন অতিপ্রাকৃত প্রাণীদের, ভয় করবে না, কারণ তারা জানে যে, যদি আল্লাহ তাদেরকে কিছু দান করতে চান, কেউ তা তাদের কাছ থেকে আটকে রাখতে পারবে না এবং যদি তিনি তাদের কাছ থেকে তা আটকে রাখতে চান, তাহলে কেউ তা তাদের দিতে পারবে না। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৮:

"আর তিনি তাঁর বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"

অধিকন্তু, যেহেতু স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধা উভয় সময়ই সরাসরি আল্লাহ তাআলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই কেবলমাত্র আনুগত্যের মাধ্যমেই উভয় অবস্থা সফলভাবে অতিক্রম করা সম্ভব। এর মধ্যে রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরা। নিয়তের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। কথাবার্তায় কৃতজ্ঞতা বলতে হয় ইতিবাচক কথা বলা অথবা নীরবতা বেছে নেওয়া। অধিকন্তু, কর্মে কৃতজ্ঞতার অর্থ হল একজন ব্যক্তিকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করে, যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এই ধরনের কৃতজ্ঞতা ইহকাল এবং পরকালে অতিরিক্ত আশীর্বাদ, রহমত এবং শান্তি লাভের নিশ্চয়তা দেয়। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"... যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের [অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

অধিকন্তু, ধৈর্যের অর্থ হলো কথা বা কাজের মাধ্যমে অসন্তোষ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি অবিচল থাকা, এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে যে তিনি তাদের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর জিনিসটিই বেছে নেন, এমনকি যখন তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নাও হতে পারে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৮:

"... আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"

ফলস্বরূপ, যে ব্যক্তি সকল পরিস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে যথাযথ আচরণ করে, সে মহান আল্লাহর অটল সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যার ফলে ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই প্রশান্তি লাভ করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই নির্দেশনার উল্লেখ রয়েছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৭:

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাকে কোন কল্যাণ দেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

এই বাস্তবতা বোঝা একজন মুসলিমকে মানুষের উপর নির্ভর করা থেকেও রক্ষা করবে কারণ মানুষের বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র আল্লাহ, মহান। যদিও অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও তাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে প্রতিটি পরিস্থিতির চূড়ান্ত ফলাফল এবং সিদ্ধান্ত একমাত্র মহান আল্লাহর হাতে।

অধিকন্তু, এই সত্যটি বোঝা মুসলমানদেরকে এমন বিপথগামীদের হাত থেকেও রক্ষা করবে যারা পবিত্র মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষের ইচ্ছা পূরণ করতে এবং অতিপ্রাকৃত ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইচ্ছা পূরণ করার বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই। অতএব, এই ধরনের বিভ্রান্ত লোকদের সাথে মেলামেশা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তারা কেবল মানুষকে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে উৎসাহিত করে এবং কিছু ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ, মহিমান্বিত, এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন কর্মকাণ্ড এবং বিশ্বাস গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা যেতে পারে যা তাদের ঈমান হারাতে পারে, যেমন কালো জাদুতে অংশগ্রহণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা

শিক্ষা দিত । কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৮:

"... আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"

যেহেতু মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সবকিছু সম্পর্কে অবগত, তাই তিনি মানবজাতিকে নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করেছেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক ও শারীরিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনের মধ্যে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৯:

" বলুন, "সাক্ষ্যের দিক থেকে কোন জিনিসটি সবচেয়ে বড়?" বলুন, "আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে এটি পৌঁছাবে তাদের সতর্ক করতে পারি..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে সতর্কীকরণ এবং সুসংবাদ কেবল তাদেরই উপকারে আসে যারা এগুলোর উপর আমল করে। অতএব, পবিত্র কুরআনের সতর্কীকরণ এবং সুসংবাদ কেবল তখনই লাভবান হবে যখন তা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন দিক পূরণ করবে। পবিত্র কুরআন সঠিকভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে পাঠ করতে হবে। তাদের এর অর্থ বুঝতে হবে এবং এর শিক্ষাগুলিকে তাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। কেবল অপরিচিত ভাষায় এটি পাঠ করা যথেষ্ট নয়, কারণ পবিত্র কুরআন কেবল আবৃত্তির জন্য একটি পাঠ্য হিসেবে কাজ করে না বরং নির্দেশনার উৎস হিসেবেও কাজ করে। প্রকৃত নির্দেশনা তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন কেউ এর নীতিগুলি সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করে, যেমন একটি মানচিত্র কেবল একজনকে ব্যবহার করলেই গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে পারে। অধিকন্তু, এটিকে বস্তুবাদী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়, যেখানে ব্যক্তিরা পার্থিব সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট আয়াত বারবার পাঠ করে, যেমন একটি সন্তান বা স্ত্রী, কারণ পবিত্র কুরআন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা অর্জনের হাতিয়ার নয়। যারা সঠিকভাবে এর শিক্ষা মেনে চলবেন তারা নিশ্চিত করবেন যে তারা তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন, একটি সুসংগত মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে প্রশান্তির অবস্থার দিকে পরিচালিত করবেন, একই সাথে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তাদের জীবনের সমস্ত দিক কার্যকরভাবে সংগঠিত করবেন।

কিন্তু ইসলামের শিক্ষা প্রায়শই মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, তাই তারা প্রায়শই সেগুলিকে উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির আনুগত্য করে, যদিও মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে এই মনোভাবের মধ্যেই মনের শান্তি নিহিত রয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ১৯:

"... আর এই কুরআন আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে এটি পৌঁছাবে তাদের সতর্ক করতে পারি। তুমি কি [সত্যিই] সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও আছে?"..."

যখন কেউ সমাজের অধিকাংশ লোককে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আনুগত্যের মাধ্যমে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে দেখে, তখন তাদের উচিত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা এবং পরিবর্তে আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, কারণ তারা জানে যে উভয় জগতের মানসিক শান্তি কেবল এতেই নিহিত। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৯:

"... তোমরা কি [সত্যিই] সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও আছে?" বলো, "আমি [তোমাদের সাথে] সাক্ষ্য দেব না।" বলো, "নিশ্চয়ই, তিনি একমাত্র উপাস্য, এবং তোমরা যাকে [তাঁর সাথে] শরীক করো, আমি তা থেকে মুক্ত।"

এই দৃঢ় মনোভাব অর্জনের জন্য, তাদের অবশ্যই ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। সমৃদ্ধি বা প্রতিকূলতার সময়ে, সকল পরিস্থিতিতে, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার জন্য একটি দৃঢ় ঈমান অপরিহার্য। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণের বোধগম্যতা এবং প্রয়োগের মাধ্যমে এই গভীর ঈমান গড়ে তোলা হয়। এই শিক্ষাগুলি দেখায় যে, মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রশান্তি বর্ধন করে। বিপরীতে, যারা ইসলামী নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ঈমান ভঙ্গুর হয়ে যায়, যা তাদেরকে আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলে, বিশেষ করে যখন তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা ঐশ্বরিক আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এই ধরনের অজ্ঞতা এই বোধকে অস্পষ্ট

করে দিতে পারে যে, মহান আল্লাহর আদেশ মেনে চলার জন্য ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা উভয় জগতে প্রকৃত শান্তি অর্জনের জন্য মৌলিক। ফলস্বরূপ, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তিদের তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করা অপরিহার্য, সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের অটল আনুগত্য নিশ্চিত করা। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদের যথাযথ ব্যবহার, যার ফলে পরিণামে একটি সুসংগত মানসিক ও শারীরিক অবস্থা তৈরি হয় এবং তাদের জীবনের সকল দিকের যথাযথ অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৯:

"... তোমরা কি [সত্যিই] সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও আছে?" বলো, "আমি [তোমাদের সাথে] সাক্ষ্য দেব না।" বলো, "নিশ্চয়ই, তিনি একমাত্র উপাস্য, এবং তোমরা যাকে [তাঁর সাথে] শরীক করো, আমি তা থেকে মুক্ত।"

এই আয়াতের শেষ অংশটি ইঙ্গিত করে যে, যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো জিনিসগুলিকে মেনে চলে, তাদের অনুকরণ করা এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যারা আল্লাহকে অমান্য করে তাদের থেকে তাদের কর্মকাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং পরিবর্তে সর্বদা ইসলামের শিক্ষার উপর দৃঢ় থাকতে হবে। তাদের ইচ্ছা অনুসারে কখন ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে এবং কখন তা উপেক্ষা করতে হবে তা বেছে নেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল তাদের ইচ্ছার উপাসনা করছে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

অতএব, ইসলামকে এমন একটি পোশাক হিসেবে দেখা এড়িয়ে চলা উচিত যা তার ইচ্ছানুযায়ী খুলে ফেলা যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের আনুগত্যকারীদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে সর্বদা এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতে হবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৯:

"... তোমরা কি [সত্যিই] সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও আছে?" বলো, "আমি [তোমাদের সাথে] সাক্ষ্য দেব না।" বলো, "নিশ্চয়ই, তিনি একমাত্র উপাস্য, এবং তোমরা যাকে [তাঁর সাথে] শরীক করো, আমি তা থেকে মুক্ত।"

যেমনটি আগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর গঠন পর্যবেক্ষণ করার পর, এবং অসংখ্য সুষম ব্যবস্থার সাথে, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে একজন একক স্রষ্টা আছেন যিনি মহাবিশ্ব গঠন করেছেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে আদর্শ দূরত্ব একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবে কাজ করে, কারণ সূর্য যদি আরও সামান্য কাছাকাছি বা দূরে থাকে তবে জীবন টেকসই হবে না। একইভাবে, পৃথিবীকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং নির্মল

পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তৈরি করা হয়েছে যা জীবনকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... *এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন..."*

দিন ও রাতের সঠিক সময় নির্ধারণ, এবং সারা বছর ধরে তাদের দৈর্ঘ্যের তারতম্যের কারণে, মানুষ তাদের সুবিধাগুলি সর্বাধিক করতে সক্ষম হয়। দীর্ঘ দিনের কারণে দীর্ঘ সময় ক্লান্তি দেখা দিতে পারে, অন্যদিকে দীর্ঘ রাত কাজ এবং শেখার জন্য উপলব্ধ সময় সীমিত করতে পারে। অন্যদিকে, ছোট রাত সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত বিশ্রামের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। অধিকন্তু, দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কৃষিকাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, যা মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের জন্য খাদ্য সরবরাহকে প্রভাবিত করবে। মহাবিশ্বের অন্যান্য সুষম ব্যবস্থার সাথে দিন ও রাতের সমন্বিত কার্যকারিতা স্পষ্টভাবে মহান আল্লাহর একত্বকে প্রদর্শন করে, কারণ একাধিক দেবতার উপস্থিতি পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করবে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। অধ্যায় ২১ আল আম্বিয়া, আয়াত ২২:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... *এবং [বড়] জাহাজ যা সমুদ্রে চলাচল করে যা মানুষের উপকার করে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন..."*

নিখুঁতভাবে সুষম জলচক্র পর্যবেক্ষণ একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের একটি শক্তিশালী প্রমাণ। সমুদ্র থেকে জল বাষ্পীভূত হয়, বায়ুমণ্ডলে উঠে আসে এবং তারপর ঘনীভূত হয়, যার ফলে পাহাড়ের উপর অ্যাসিডিক বৃষ্টিপাত হয়। এই পর্বতগুলি অ্যাসিডিক বৃষ্টিপাতকে নিরপেক্ষ করতে সাহায্য করে, যা মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের জন্যই পানীয়ের জন্য নিরাপদ করে তোলে। এই অনবদ্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থায় যেকোনো ব্যাঘাত মানুষ এবং বন্যপ্রাণী উভয়ের উপরই বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলতে পারে। সমুদ্রের লবণাক্ততা সামুদ্রিক জীবের ক্ষয়কে জল দূষিত হতে বাধা দেয়। যদি সমুদ্র দূষিত হয়ে পড়ে, তাহলে সামুদ্রিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এই দূষণ ভূমিভিত্তিক জীবনকেও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। সমুদ্রের জলের রাসায়নিক গঠনটি প্রাণবন্ত সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখার জন্য সাবধানতার সাথে তৈরি করা হয়েছে এবং বৃহৎ জাহাজগুলিকে তার পৃষ্ঠে চলাচল করতে দেয়। জলের গঠনে সামান্য পরিবর্তন এই ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করতে পারে, যার ফলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যেখানে হয় সামুদ্রিক প্রাণীর উন্নতি হয় অথবা জাহাজগুলি চলতে পারে, কিন্তু একই সাথে উভয়ই নয়। এখনও, সামুদ্রিক পরিবহন বিশ্বব্যাপী পণ্য পরিবহনের প্রাথমিক মাধ্যম। অতএব, পৃথিবীতে জীবন বজায় রাখার জন্য এই নিখুঁত ভারসাম্য অপরিহার্য।

বিবর্তন হলো এক ধরণের মিউটেশন, যার নিজস্ব অপূর্ণতা রয়েছে। তবুও, যখন আমরা প্রজাতির বিশাল পরিসরের দিকে তাকাই, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাদের একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তৈরি করা হয়েছে,

যা তাদের অনন্য আবাসস্থলে উন্নতি করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, উটকে ধরুন; এটি তীব্র তাপ সহ্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে জল ছাড়াই চলতে পারে, যা এটিকে মরুভূমির জীবনের জন্য পুরোপুরি সজ্জিত করে তুলেছে। অধ্যায় ৪৪ আল গাশিয়াহ, আয়াত 17:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৬৪:

"... *এবং [তাঁর] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস এবং মেঘের পরিচালনা..."*

বায়ু পরাগায়নের জন্য বাতাস অপরিহার্য, যা ফসল, গাছপালা এবং গাছের প্রজননে সহায়তা করে। অতীতে, সমুদ্রে নৌযানের জন্য বাতাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং বিশ্বব্যাপী পণ্য পরিবহনের জন্য এগুলিই প্রধান পদ্ধতি। অধিকন্তু, বৃষ্টির মেঘ নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থানান্তরের জন্য বাতাস গুরুত্বপূর্ণ, যা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের জন্য অত্যাবশ্যক। পৃথিবীর বায়ু ব্যবস্থা সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্যপূর্ণ; বাতাসের অভাব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে অত্যধিক বাতাস প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকেও ব্যাহত করবে। একইভাবে, বৃষ্টিপাত সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা হয়; পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হলে খরা এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে, অন্যদিকে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে ভয়াবহ বন্যা হতে পারে। অধ্যায় ২৩ আল মু'মিনুন, আয়াত ১৮:

"আর আমরা আকাশ থেকে পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। এবং অবশ্যই, আমরা তা প্রত্যাহার করতে সক্ষম।"

এই নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাগুলি নিয়ে যারা চিন্তা করেন তারা যুক্তিসঙ্গতভাবে একজন একক স্রষ্টার উপস্থিতি অস্বীকার করতে পারেন না যিনি সমস্ত প্রাণীকে পরিচালনা করেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৯:

"বলুন, "সাক্ষ্যের দিক থেকে কোন জিনিসটি সবচেয়ে বড়?" বলুন, "আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে এটি পৌঁছাবে তাদের সতর্ক করতে পারি..."

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ঐশ্বরিক উৎপত্তির একটি স্পষ্ট প্রমাণ উল্লেখ করেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা একে চিনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনে..."

আহলে কিতাবদের মধ্যেকার পণ্ডিতরা যেহেতু ঐশী গ্রন্থের সাথে পরিচিত ছিলেন, তাই তারা পবিত্র কুরআনের লেখক, মহান আল্লাহ তায়ালার সাথেও পরিচিত ছিলেন এবং তাই এর ঐশী উৎসকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এছাড়াও, পবিত্র কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়ই তাদের ঐশী গ্রন্থের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে, তাই তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিলেন। অধ্যায় ২ আল বাকারা, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

অধিকন্তু, আহলে কিতাব এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ই জানত যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থ থেকে শিক্ষা নেননি, যার ফলে তাঁর পক্ষে পবিত্র কুরআন আবিষ্কার করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৪৮:

"আর তুমি এর আগে কোন কিতাব পাঠ করোনি এবং তোমার ডান হাতে কোন কিতাব লিখে রাখোনি। তাহলে [অর্থাৎ, অন্যথায়] মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কারণ হত।"

আহলে কিতাবদের পবিত্র জ্ঞানের রক্ষক হিসেবে গণ্য করা হত, যা তাদেরকে সমাজের মধ্যে, এমনকি মূর্তিপূজকদের উপস্থিতিতেও, একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান

করেছিল। তবুও, ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে এই সম্মানিত মর্যাদা যথেষ্ট প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল।

আহলে কিতাবগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতেন, কারণ তিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন, তাঁর ভাই হযরত ইসহাকের বংশধর ছিলেন না। তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ব্যবস্থা বংশের গুরুত্বের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল, যা তারা অন্যদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি প্রদান করে বলে মনে করত। ফলস্বরূপ, তারা ভিন্ন বংশ থেকে একজন পবিত্র নবী (সাঃ)-কে গ্রহণ করতে সংগ্রাম করত, কারণ এটি তাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতাকে চ্যালেঞ্জ করবে।

অধিকন্তু, আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ঐশ্বরিক নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। তারা আরও আশঙ্কা করেছিলেন যে ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের সমাজে যে কর্তৃত্ব, সম্মান এবং সামাজিক অবস্থান গড়ে উঠেছিল তা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে, যা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতেই উৎসাহিত করবে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতায় ব্যাঘাত ঘটাবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তারা তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হবে না। অতএব, তাদের মনোভাব তাদের উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা এবং কষ্টের দিকে পরিচালিত করবে, তারা যে কোনও পার্থিব আরাম উপভোগ করুক না কেন। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 20-21:

"... যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনে না। আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে? নিশ্চয়ই জালেমরা সফল হবে না।"

উপরন্তু, এই আয়াতটি আরও সতর্ক করে যে, যদি কোন মুসলিম আহলে কিতাবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যারা আল্লাহর প্রতি তাদের মৌখিক ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারাও তাদের ঈমান হারাতে পারে, ঠিক যেমন আহলে কিতাবরা করেছিল। বিশ্বাস যে একটি গাছের মতো তা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এর বৃদ্ধি এবং টিকে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ থেকে পুষ্টি প্রয়োজন। ঠিক যেমন পর্যাপ্ত সূর্যালোকের অভাবে একটি উদ্ভিদ অবশেষে শুকিয়ে যায়, তেমনি আনুগত্যমূলক কর্মের সমর্থন ছাড়াই একজন ব্যক্তির ঈমান হ্রাস পেতে পারে এবং মারা যেতে পারে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ২০-২১:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা একে এমনভাবে চিনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনে। যারা পরকালে নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনে না। আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে? নিশ্চয়ই জালেমরা সফল হবে না।"

আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশী কিতাবগুলির ভুল ব্যাখ্যা এবং সম্পাদনা করেছিলেন যাতে ইসলামকে অস্বীকার করা যায়। ফলস্বরূপ, তারা তাদের অনেক অজ্ঞ অনুসারীকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করতেও বিভ্রান্ত করেছিল। এটি ছিল তাদের জন্য মহান আল্লাহর ক্রোধ অর্জনের একটি প্রধান কারণ, কারণ তারা কেবল নিজেদের জন্যই বিভ্রান্তি বেছে নেয়নি বরং অন্যদেরও বিভ্রান্ত করেছিল কারণ তারা তাদের অনুসারীদের ইসলামে হারানোর ভয়ে ছিল। দুঃখের বিষয় হল, কিছু মুসলিম পণ্ডিত ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য ইসলামী শিক্ষাকে বিকৃত করেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের মতামতের বিপরীত ইসলামী জ্ঞানের আলোচনাকে উপেক্ষা করেছেন। এই আচরণ তাদের অনুসারীদের বিচ্ছিন্ন করার ভয় থেকে উদ্ভূত, যারা তাদের প্রতি উপহার এবং অতিরিক্ত শ্রদ্ধা দান করে। সুনান ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে লিপিবদ্ধ একটি হাদিসে এই ধরনের পণ্ডিতদের তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। অধিকন্তু, ইসলাম মুসলমানদেরকে অন্যদের সমালোচনামূলক অনুকরণ দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার এবং পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষাগুলি বোঝার এবং বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করার জন্য অনুরোধ করেছে। এই পদ্ধতি তাদেরকে পবিত্র কুরআনের খাঁটি শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য মেনে চলতে সাহায্য করবে, পশুর মতো অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করার পরিবর্তে। ইসলাম এই কারণে অন্ধ অনুকরণের অনুশীলনকে তীব্রভাবে নিন্দা করে এবং এইভাবে ইসলামী নীতি প্রয়োগে জ্ঞান ও বোধগম্যতার সাধনাকে উৎসাহিত করে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের সতর্ক করে দেন যারা ইসলামের সত্যকে উপেক্ষা করে কারণ এটি তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে এবং পরিবর্তে সামাজিক

যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো জিনিসগুলিকে মেনে চলা বেছে নেয়। ষষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ২২:

" আর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব; তারপর যারা আল্লাহর সাথে অন্যদের অংশীদার বলে দাবী করেছিল তাদের বলব, "তোমাদের 'শরীক'রা কোথায়? "

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনের অর্থ হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো যেকোনো কিছু মেনে চলা, যা আল্লাহর অবাধ্যতা। যদিও এটি একটি ছোটখাটো শিরক, যা ঈমানের ক্ষতি করে না, তবুও এটি আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাকে অবাধ্য হতে উৎসাহিত করে এবং উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে, যারা ছোটখাটো শিরক করে, তারা বিচারের দিনে যখন তাদের সমালোচনা করা হবে তখন হতবাক হয়ে যাবে এবং নিজেদের পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করবে এই দাবি করে যে তারা কখনও মহান আল্লাহর সাথে বড় শিরক করেনি। সূরা আল আন'আম, আয়াত ২৩:

" অতঃপর পরীক্ষার কোন অজুহাত থাকবে না, কেবল তখনই তারা বলবে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কসম, আমরা শিরককারী ছিলাম না।"

কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের ভিত্তিহীন অজুহাতের সমালোচনা করবেন, কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিল যে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে কোন কিছুর আনুগত্য

করা ছোট শিরক, যদিও তারা অন্যথায় ভান করত। সূরা আল আন'আম, আয়াত ২৪:

" দেখো, তারা নিজেদের উপর কেমন মিথ্যা বলবে। আর তারা যা মিথ্যা রচনা করত তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।"

মহান আল্লাহ কর্তৃক মানবজাতিকে প্রদত্ত নিখুঁত ঐশ্বরিক আচরণবিধি অনুসরণ করার পরিবর্তে মানুষ যে সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি অনুসরণ করেছিল, তা হারিয়ে যাবে এবং কোনও উপকারে আসবে না। বাস্তবে, এই মানবসৃষ্ট আচরণবিধিগুলি এই পৃথিবীতেও প্রকৃত কোনও উপকারে আসবে না কারণ এগুলি কেবল তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতায় ব্যাঘাত অনুভব করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত থাকবে না। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং কষ্টের সৃষ্টি হবে, তাদের পার্থিব আনন্দ থাকুক না কেন। তাদের অজ্ঞতা এবং অন্যদের অন্ধ অনুকরণের কারণে, অনেক মানুষ এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা বিচারের দিনে পৌঁছায় এবং সরাসরি প্রত্যক্ষ করে যে কীভাবে তাদের মানবসৃষ্ট আচরণবিধি তাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে না, ঠিক যেমন তারা তাদের এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করেনি।

অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত তাদের নিজস্ব স্বার্থে ইসলামী নীতিমালা গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়ন করা, এমনকি যখন এই নীতিগুলি তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের উচিত একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা যিনি তাদের চিকিৎসকের সুপারিশ অনুসরণ করেন, বুঝতে পারেন যে এই নির্দেশনা

তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে, নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের অপ্রীতিকরতা এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস সত্ত্বেও। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী উন্নত মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মেনে চলেন তিনিও উন্নত হবেন। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন ব্যক্তিকে একটি সুসংগত মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনের জন্য এবং তার জীবনের সমস্ত দিক এবং ব্যক্তিদের যথাযথভাবে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র সত্তা হলেন মহান আল্লাহ।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ২৪:

"...এবং তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে যা তারা তৈরি করত।"

এই আয়াতটি ধর্মীয় উদ্ভাবনের তীব্র সমালোচনা করে কারণ এটি পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে। অতএব, পথনির্দেশনার দুটি উৎসের শিক্ষা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহ্য, এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য সকল উৎস এড়িয়ে চলতে হবে। ধর্মীয় জ্ঞানের বিকল্প উৎসের সাথে জড়িত হওয়া, এমনকি যদি সেগুলি ইতিবাচক কর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবে পথনির্দেশের দুটি প্রধান উৎসের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে, যা শেষ পর্যন্ত পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন যে, এই দুটি উৎসের উপর ভিত্তি করে না থাকা যেকোনো অনুশীলন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। অধিকন্তু, যত বেশি কেউ অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করবে, তত বেশি তারা এমন বিশ্বাস গ্রহণ করতে পারে যা ইসলামী নীতির বিরোধিতা করে। এই ধীরে ধীরে বিচ্যুতিই শয়তান ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করে। উদাহরণস্বরূপ,

চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তিকে ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতাকারী কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলনে জড়িত হতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। যদি এই ব্যক্তি অজ্ঞ থাকে এবং বিকল্প ধর্মীয় উৎস অনুসরণ করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তারা সহজেই এই প্রতারণার শিকার হতে পারে এবং ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক আচার-অনুষ্ঠান পালন শুরু করতে পারে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন বিশ্বাস পোষণ করতে পারে যা ইসলামী মতবাদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, যেমন এই ধারণা যে ব্যক্তি বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে, কারণ তাদের ধারণা দুটি প্রধান নির্দেশিকার বাইরের উৎস থেকে উদ্ভূত। এই ভুল অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের সমান, যেমন কালো জাদুর অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

একজন মুসলিম ধর্মীয় জ্ঞানের বিকল্প উৎসের উপর নির্ভর করে অসাবধানতাবশত তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে। ফলস্বরূপ, নির্দেশনার প্রাথমিক উৎসের ভিত্তিহীন ধর্মীয় উদ্ভাবনে লিপ্ত হওয়া শয়তানের পথ অনুসরণ করার সমতুল্য। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

এরপর আল্লাহ তাআলা বিচারের দিনে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন, যাতে কেউ তাদের গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে পারে এবং উভয় জগতে তাদের ভাগ্য এড়াতে পারে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২৫:

"আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা তোমার কথা শোনে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা রেখে দিয়েছি..."

মহান আল্লাহ তাআলা এই আবরণগুলোকে নিজের জন্য দায়ী করেছেন, কারণ তাঁর অনুমতি ও ইচ্ছা ছাড়া মহাবিশ্বে কিছুই ঘটে না। কিন্তু আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, এই ফলাফল তাদের নিজস্ব মনোভাবের সরাসরি ফলাফল যে তারা ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণ উপেক্ষা করে চলেছে এবং অন্যদের তা গ্রহণ করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২৫-২৬:

"আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা তোমার কথা শোনে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা রেখে দিয়েছি। আর যদি তারা সমস্ত নিদর্শন দেখে, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করবে না। এমনকি যখন তারা তোমার সাথে বিতর্ক করতে করতে তোমার কাছে আসে, তখন যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে, "এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।" তারা [অন্যদের] এটি থেকে বিরত রাখে এবং

[নিজেরা] তার থেকে দূরে থাকে। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধ্বংস করে না, কিন্তু তারা [এটি] উপলব্ধি করে না।"

যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর সঠিক পথনির্দেশনা জোর করে চাপিয়ে দেন না, যখন তারা সত্যের প্রতি তাদের মনকে আবদ্ধ করে রাখে, কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, তাই তিনি তাদের মন এবং আধ্যাত্মিক হৃদয়কে সত্য বোঝা এবং গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন।

তারা এইভাবে আচরণ করতো কারণ ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী, যেমন মানুষের অধিকার পূরণ করা। উপরন্তু, তাদের সম্প্রদায়ের নেতারা ভয় পেতেন যে তাদের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের সামাজিক প্রভাবের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ এবং নেতৃত্ব হারাতে হবে, ফলস্বরূপ তারা অন্যদেরও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাতেন। ২৬ নং আয়াতে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, তাই সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি সর্বদা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে উৎসাহিত করবে। ৬ নং অধ্যায় আল আন'আম, ২৬ নং আয়াত:

"...এবং তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে ধ্বংস করে না, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।"

প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সম্পদ ও মর্যাদার পিছনে ছুটলে ঈমানের ক্ষতি হতে পারে, দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালের উপর যে ধ্বংস ডেকে আনে তার চেয়েও বেশি। এর কারণ হল, যারা বস্তুগত সম্পদ ও কর্তৃত্বের পিছনে ছুটতে থাকে তারা প্রায়শই এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করে। সম্পদ ও ক্ষমতার জন্য তাদের অদম্য লোভে, তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করবে, এবং এই সম্পদ অর্জন ও ধরে রাখবে, বিশেষ করে আধুনিক সমাজে। এই ধরনের আকাঙ্ক্ষার প্রতি আকাঙ্ক্ষা যত তীব্র হবে, মহান আল্লাহকে অমান্য করার এবং অন্যদের ক্ষতি করার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে ব্যক্তিরা ক্ষমতা ও সম্পদ অর্জনের জন্য কত চরম পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নিরপরাধদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা। পরিবর্তে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের চাহিদা এবং বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য বৈধ আয় অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করা। যদি তারা নেতৃত্বের পদ লাভ করে, তাহলে তাদের অবশ্যই তাদের দায়িত্ব এমনভাবে পালন করতে হবে যা মহান আল্লাহকে খুশি করে, যাতে তারা তাদের এবং অন্যদের জন্য এই জীবন ও পরকালে শান্তি বর্ধন করে। বিপরীতে, ঐতিহাসিক প্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে সম্পদ ও ক্ষমতার অনুপযুক্ত ব্যবহার অনিবার্যভাবে ব্যক্তির জন্য চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং বাধার সৃষ্টি করে, এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি তাদের বা তাদের চারপাশের লোকদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান না হয়। এই জীবনে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার তাদের মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতাকে ব্যাহত করবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে, যা শেষ পর্যন্ত বিচারের দিনে জবাবদিহিতার জন্য তাদের প্রস্তুতিকে ব্যাহত করবে। ফলস্বরূপ, এই ধরনের আচরণ ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই চাপ, অসুবিধা এবং কষ্টের দিকে পরিচালিত করবে, তারা যে কোনও বস্তুগত সুবিধাই লাভ করুক না কেন। বিচারের দিনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। অত্যাচারীকে তাদের সৎকর্মগুলি তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে স্থানান্তর করতে হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের অপরাধের বোঝা বহন করবে। এর ফলে অত্যাচারীকে বিচারের দিন জাহান্নামে শাস্তির সম্মুখীন হতে হতে পারে, তা সে আল্লাহর অধিকারের প্রতি আনুগত্য করুক না কেন। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ২৬:

"এবং তারা [অন্যদের] তার থেকে বিরত রাখে এবং [নিজেরা] তার থেকে দূরে থাকে। এবং তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে ধ্বংস করে না, কিন্তু তারা [তা উপলব্ধি করে না।"

এছাড়াও, সর্বদা অন্যদের বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত থাকা উচিত কারণ তাদের পাপ কেবল বৃদ্ধি পাবে, এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও, যতক্ষণ কেউ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেন যারা সত্যকে তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী বলে মনে করে এবং পরিবর্তে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২৭-২৮:

"যদি তুমি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, "আহা, যদি আমরা পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম এবং আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার না করতাম এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত না হতাম।" কিন্তু তারা যা আগে গোপন করেছিল তা [এখন] তাদের কাছে প্রকাশিত

হয়েছে। এবং যদি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবুও তারা সেই কাজই করবে যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল; এবং প্রকৃতপক্ষে তারা মিথ্যাবাদী।"

পবিত্র কুরআনের অন্যান্য অনেক আয়াতের মতো এটিও এই মিথ্যা বিশ্বাসকে দূর করে যে, কেয়ামতের দিন কেউ মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হবে, অথবা তাদের অজুহাত তাদেরকে কেয়ামতের দিন রক্ষা করবে, অথবা তাদেরকে আল্লাহকে মান্য করার দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হবে, অথবা পরিশেষে, অন্য কেউ তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। ৩০ সূরা আর রুম, আয়াত ৫৭:

"অতএব, সেদিন তাদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না যারা অন্যায় করেছে এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

যেহেতু কারও কর্মের পরিণতি ভোগ করা থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই, তাই ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে এই পরিণতি এড়াতে তাদের কার্যত প্রস্তুতি নেওয়া অপরিহার্য।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ২৭-২৮:

"যখন তাদেরকে জাহান্নামের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন যদি তুমি দেখতে পেতে, তখন তারা বলবে, "আহা, যদি আমরা পৃথিবীতে ফিরে যেতাম এবং আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার না করতাম এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত না হতাম।" কিন্তু তারা যা আগে গোপন করেছিল তা এখন তাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে..."

এই আয়াতের শেষ অংশটি এমন একটি বাস্তবতা নির্দেশ করে যা অনস্বীকার্য, এমনকি যদি মানুষ এই পৃথিবীতে প্রকাশ্যে তা অস্বীকার করে। বাস্তবে, সকলেই জানে যে এই পৃথিবীতে তাদের একটি উচ্চতর উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এই পৃথিবীতে তাদের জীবন কোনও দুর্ঘটনা ছিল না এবং এটি লক্ষ্যহীনও নয়। সকলেই জানে যে একটি পশুর মতো জীবনযাপন করা যেখানে কেবল তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা তাদের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে তবুও অনেকে এখনও এই আচরণে অটল থাকে। সমস্ত মানুষ যখনই ভুল কাজ করে তখনই নিজেকে দোষী মনে করে, এমনকি যখন তারা বিশ্বাস করে যে তাদের পার্থিব কর্তৃপক্ষের দ্বারা জবাবদিহি করা হবে না, কারণ তারা গভীরভাবে জানে যে এই পৃথিবীতে তাদের কর্মকাণ্ড উপেক্ষা করা হবে না। এই বাস্তবতাই বিচারের দিনে তাদের কাছে শারীরিকভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যদিও তারা দ্বিতীয় সুযোগের জন্য আবেদন করবে, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে পৃথিবীতে তাদের দ্বিতীয় জীবন থাকলেও, তারা প্রথমবারের মতো একই আচরণ করবে, কারণ তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার দৃঢ় সংকল্প তাদের নেই। তারা ঠিক একজন বন্দীর মতো যে কারাগার থেকে মুক্তির জন্য আবেদন করে তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপে ফিরে না যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু তা করার জন্য তাদের কোনও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বা সংকল্প নেই। ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ২৮ নং আয়াত:

"...আর যদি তাদেরকে ফিরিয়েও দেওয়া হয়, তবুও তারা তাই করবে যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল; এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।"

অধিকন্তু, তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল যে, তারা বিচার দিবসের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে, যদিও এর অপ্রতিরোধ্য এবং যৌক্তিক প্রমাণ রয়েছে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ২৯:

"আর তারা বলে, "আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই, এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না।"

পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হওয়া এবং পুনরুত্থান এবং আখেরাতে জবাবদিহিতা অস্বীকার করা সর্বদা এইভাবে যুক্ত হয়েছে যে, যারা পুনরুত্থান এবং জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে তাদের অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এই প্রস্তুতি তাদেরকে তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য করবে যাতে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। অন্যদিকে, যারা কেবল তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করতে চায় তারা প্রায়শই পুনরুত্থান এবং জবাবদিহিতা অস্বীকার করবে যাতে তারা তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণে অটল থাকতে পারে।

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিচারের দিনে মানুষের পুনরুত্থান অসম্ভব এই বিশ্বাসটি একটি অদ্ভুত বিশ্বাস, বিশেষ করে পুনরুত্থানের অনেক প্রমাণ বিবেচনা করলে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জনশূন্য ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং একটি সুপ্ত বীজকে অঙ্কুরিত করতে সক্ষম করেন, যার ফলে জীবন বৃদ্ধি পায়। একইভাবে, মহান আল্লাহ মানুষকে পুনরুত্থিত করার ক্ষমতা

রাখেন, ঠিক যেমন একটি মৃত বীজ মাটিতে পুঁতে ফেলার পর জীবিত হয়ে ওঠে। ঋতুর চক্রাকার ধরণ পুনরুত্থানের একটি স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে কাজ করে; শীতকালে, গাছগুলি তাদের পাতা হারায় এবং প্রাণহীন বলে মনে হয়, তবুও অন্যান্য ঋতুতে, তারা তাদের পাতা এবং প্রাণশক্তি ফিরে পায়। অধিকন্তু, সমস্ত জীবের ঘুম-জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের রূপক হিসেবে কাজ করে, কারণ ঘুম সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মহান আল্লাহ, যাদের জাগ্রত করার জন্য তৈরি তাদের আত্মা পুনরুদ্ধার করেন, যার ফলে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। অধ্যায় 39 আয-যুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

অধিকন্তু, বিচার দিবস একটি অনিবার্য ঘটনা। মহাবিশ্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে ভারসাম্যের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে একটি আদর্শ দূরত্বে অবস্থিত; যেকোনো বিচ্যুতি এটিকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে। একইভাবে, জলচক্র, যার মধ্যে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবন এবং এর ফলে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত হয়, পৃথিবীতে জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ক্রমাঙ্কিত করা হয়েছে। মাটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সূক্ষ্ম চারা অঙ্কুর বের হতে পারে এবং ভারী কাঠামোকে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। এই উদাহরণগুলি কেবল একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয় না বরং ভারসাম্যের নীতিকেও তুলে ধরে। যাইহোক, মানুষের আচরণে একটি উল্লেখযোগ্য ভারসাম্যহীনতা স্পষ্ট। প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে নিপীড়ক ব্যক্তিরা পরিণতি এড়াতে পারে, আবার অনেকে তাদের কষ্টের ন্যায্য প্রতিদান না পেয়ে নিপীড়ন সহ্য করে। অসংখ্য মুসলিম যারা বিশ্বস্তভাবে আল্লাহকে মেনে চলে, তারা

প্রায়শই এই জীবনে কষ্টের সম্মুখীন হয়, কেবলমাত্র ন্যূনতম পুরস্কার পায়, অন্যদিকে যারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তারা খুব কম বাধা ছাড়াই পার্থিব আনন্দ উপভোগ করে। এটা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত যে, একমাত্র স্রষ্টা, মহান আল্লাহ, যিনি এই মহাবিশ্বের অন্যান্য সকল ব্যবস্থায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত মানুষের কর্মকাণ্ড সংশোধন করবেন, যা এই বিশ্বের সবচেয়ে গভীর ভারসাম্যহীনতার প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংশোধন ঘটানোর জন্য, মানুষের কর্মকাণ্ড প্রথমে বন্ধ করতে হবে। এটি বিচারের দিনে ঘটবে যখন ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন এবং অনন্তকালের জন্য ভারসাম্য বজায় রাখা হবে।

এই আলোচনাটি চিন্তা করলে একজন ব্যক্তির বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, ফলে তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে অনুপ্রাণিত হবে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রশান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২২:

"কারণ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রতিটি প্রাণী তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

কিন্তু যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করা, তারা তাদের জবাবদিহিতা অস্বীকার করতেই থাকবে অথবা তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হবে, এমনকি যদি তারা মৌখিকভাবে এর প্রতি ঈমানের দাবি করে। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৩০:

"যদি তুমি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, "এটা কি সত্য নয়?" তারা বলবে, "হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম।" তিনি বলবেন, "তাহলে তোমরা কুফরি করার কারণে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি মৌখিকভাবে বিচার দিবসের প্রতি ঈমানের দাবি করে কিন্তু কার্যত তার জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, সে হয়তো নিজের ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে। ঈমান যে একটি গাছের মতো, তা উপলব্ধি করা অপরিহার্য; এর বৃদ্ধি এবং টিকে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ থেকে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজন হয়। যে উদ্ভিদ পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় না এবং শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে যায়, তার মতোই, একজন ব্যক্তির ঈমান বাধ্যতামূলক কাজের শক্তি বৃদ্ধি ছাড়াই দুর্বল হয়ে মারা যেতে পারে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 31:

"যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি যখন তাদের কাছে হঠাৎ করেই কেয়ামত এসে যাবে, তখন তারা বলবে, "হায়! আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্য আমাদের কত বড় আফসোস!" আর তারা তাদের বোঝা তাদের পিঠে বহন করবে। নিঃসন্দেহে তারা যা বহন করে তা কতই না মন্দ।"

ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, যারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, তাদের এই সতর্কীকরণ দেওয়ার পর, মহান আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, পার্থিব কামনা-বাসনার

বাহ্যিক সৌন্দর্য তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না করে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৩২:

"আর পার্থিব জীবন তো খেলা ও কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম, তোমরা কি বোঝ না?"

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষা বুঝতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে রয়েছে ঐশী শিক্ষা অনুসারে মানুষ প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে কিনা, সে পার্থিব আকাঙ্ক্ষার দ্বারা এই পৃথিবীর উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হবে। ঠিক যেমন একজন ছাত্র বিনোদন এবং খেলাধুলার দ্বারা পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা থেকে বিচ্যুত হয়, সে সম্ভবত তার পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে, ঠিক যেমন একজন ছাত্র বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিচ্যুত হয়, সে অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করবে, যার ফলে এই পৃথিবীতে তাদের জীবনের পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতায় ব্যাঘাত অনুভব করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে, যা শেষ পর্যন্ত বিচারের দিনে জবাবদিহিতার জন্য তাদের প্রস্তুতিকে বাধাগ্রস্ত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা এবং কষ্টের সৃষ্টি হবে, তারা যে কোনও পার্থিব আরাম উপভোগ করুক না কেন। অতএব, যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের জীবনের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় সে এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারবে না।

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে এবং ফলস্বরূপ ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত পার্থিব জিনিসপত্র সঠিকভাবে ব্যবহার করে, সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে, সে সবকিছু এবং

প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনের মধ্যে রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে। অতএব, সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৩২:

"আর পার্থিব জীবন তো খেলাধুলা ও কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম, তোমরা কি বোঝ না?"

পরিশেষে, মানুষ যতই পার্থিব জিনিস লাভ করুক এবং ভোগ করুক না কেন, সেগুলো সর্বদা অসম্পূর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী হবে, কারণ কেউ মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে না, এমনকি যদি তারা পৃথিবীতে তাদের পার্থিব আশীর্বাদ ধরে রাখতে সক্ষম হয়। অতএব, যে ব্যক্তি তার সমস্ত প্রচেষ্টা পার্থিব আকাঙ্ক্ষার উপর কেন্দ্রীভূত করে, সে সর্বদা খালি হাতে এবং অসন্তুষ্ট থাকবে, সে যতই পার্থিব জিনিস লাভ করুক এবং ভোগ করুক না কেন। ধনী এবং বিখ্যাতদের দেখলে এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এবং যেহেতু এই ব্যক্তি পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তাদের চাপ এবং ঝামেলা কেবল তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন তারা পরবর্তী পৃথিবীতে পৌঁছাবে।

অন্যদিকে, পরকালের আশীর্বাদগুলি নিখুঁত এবং স্থায়ী। যে ব্যক্তি এই বাস্তবতাটি বোঝে সে ধৈর্যের সাথে তার পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে যাতে সে এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি এবং পরকালের নিখুঁত এবং স্থায়ী আশীর্বাদ অর্জন করতে পারে। যেহেতু এই পৃথিবীর জীবন কেবল একটি মুহূর্ত, যা কেউ অস্বীকার করে না, তাই ধৈর্যের সাথে নিজের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যদি উভয় জগতেই

মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে তবে তা একটি ছোট মূল্য। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 32:

"আর পার্থিব জীবন তো খেলাধুলা ও কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম, তোমরা কি বোঝ না?"

অধ্যায় – আল আন'আম, আয়াত ৩৩-৪৫

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ
ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا
مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا
فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٣٥﴾

۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى
ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ
يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن
كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿٤٠﴾

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾

فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ
مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا
فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٤٥﴾

“আমরা জানি যে, আপনি [নবী মুহাম্মদ, সা.] তাদের কথায় দুঃখিত। আর নিঃসন্দেহে তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং জালেমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করে।

আর অবশ্যই তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা মিথ্যাবাদী বলায় ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল যতক্ষণ না আমার বিজয় তাদের কাছে এসেছিল। আর আল্লাহর বাণী [অর্থাৎ, আদেশ] কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আর অবশ্যই তোমার কাছে [পূর্ববর্তী] রসূলদের কিছু তথ্য এসেছে।

আর যদি তাদের এড়িয়ে চলা তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তাহলে যদি তুমি পৃথিবীতে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি খুঁজে বের করতে পারো এবং তাদের জন্য কোন নিদর্শন নিয়ে আসতে পারো, [তাহলে তাই করো]। কিন্তু আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে তিনি তাদেরকে হেদায়েতের উপর একত্রিত করতেন। অতএব তুমি কখনো অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

যারা শোনে তারাই সাড়া দেবে। কিন্তু মৃতদের - আল্লাহ পুনরুজ্জীবিত করবেন; তারপর তাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

আর তারা বলে, "তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার উপর কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয় না?" বলো, "নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।"

আর পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যা তার ডানায় উড়ে, অথবা এমন কোন পাখি নেই যা তার ডানায় উড়ে, তারা তোমাদের মতই একটি সম্প্রদায় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা কিতাবে কোন বিষয়ই ভুলে যাইনি। তারপর তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের একত্রিত করা হবে।

কিন্তু যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, তারা অন্ধকারে বধির ও বোবা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

বল, “তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ে অথবা তোমাদের উপর কিয়ামত এসে যায়, তাহলে কি তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে?

না, তোমরা কেবল তাঁকেই ডাকবে, আর তিনি ইচ্ছা করলে তোমরা যে উদ্দেশ্যে তাঁকে ডাকবে তা দূর করে দেবেন, আর তোমরা যাদেরকে [তাঁর সাথে] শরীক করো, সেগুলো ভুলে যাবে।”

আর আমি তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলোর কাছে [রাসূল] প্রেরণ করেছি, তারপর তাদেরকে দারিদ্র্য ও কষ্ট দ্বারা পাকড়াও করেছি, যাতে তারা [আমাদের কাছে] বিনয়ী হয়।

কিন্তু যখন তাদের উপর আমার আযাব আসল, তখন কেন তারা বিনয়ী হল না? বরং তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে তাদের কর্মকাণ্ড সুশোভিত করে দেখাল।

অতঃপর যখন তারা সেই উপদেশ ভুলে গেল যা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম। এমনকি যখন তারা যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তাতে আনন্দিত হল, তখন আমি তাদেরকে হঠাৎ করে পাকড়াও করলাম, ফলে তারা হতাশ হয়ে পড়ল।

"অতঃপর যারা অন্যায় করেছিল তাদের ধ্বংস করা হল। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"

মক্কার অমুসলিম নেতা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা আবু জাহলকে একবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তার স্পষ্ট মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং ইসলামের সত্যবাদিতা স্বীকার করেছেন কিন্তু উল্লেখ করেছেন যে তাঁর গোত্র এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর গোত্র দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক মর্যাদার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তারা দরিদ্রদের খাওয়ানো এবং অন্যদের সাহায্য করার মতো দাতব্য কাজে প্রতিযোগিতা করেছিল। যাইহোক, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবুওয়াত ঘোষণা করেন, তখন তাঁর গোত্রের পক্ষে এটির সাথে তুলনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে, তিনি সত্যবাদী জেনেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়াত প্রত্যাখ্যান করার শপথ নেন। এটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৭-এ লিপিবদ্ধ আছে। ফলস্বরূপ, আল্লাহ, মহিমান্বিত, অধ্যায় ৬ আল আন'আম, আয়াত ৩৩ নাযিল করেন:

"আমরা জানি যে তারা যা বলে তাতে তুমি দুঃখিত। আর অবশ্যই, তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং জালেমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।"

ইমাম ওয়াহিদীর " আসবাব আল নুযুল" , ৬:৩৩, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন জুড়ে, মহান আল্লাহ, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কারণ তাঁর সম্প্রদায়, মক্কার অমুসলিমদের পথ দেখানোর জন্য তাঁর প্রচেষ্টা তীব্র এবং তীব্রভাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে যখনই তারা সত্যের উপর আঁকড়ে থাকে, বিশেষ করে

ইসলামের ক্ষেত্রে, তখন তাদের চারপাশের লোকেরা, যাদের কাছ থেকে একজন সমর্থন আশা করবে, তারাই তাদের বিরোধিতা এবং সমালোচনা করবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৩৩:

"আমরা জানি যে তারা যা বলে তাতে তুমি দুঃখিত। আর অবশ্যই, তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং জালেমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।"

যখন একজন ব্যক্তি তার সমবয়সীদের থেকে ভিন্ন পথ বেছে নেয়, তখন এটি অন্যদের মধ্যে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অযোগ্যতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে, বিশেষ করে যদি সেই সিদ্ধান্তগুলি মহান আল্লাহর শিক্ষা মেনে চলার চেয়ে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলস্বরূপ, এটি তাদের ঈমানে অবিচল থাকা ব্যক্তিদের সমালোচনার দিকে পরিচালিত করতে পারে, প্রায়শই পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে।

অধিকন্তু, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন ট্রেন্ড এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মতো সামাজিক কারণগুলি প্রায়শই ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইসলামের পক্ষে প্রচারণা প্রায়শই তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলাম দ্বারা সমালোচিত শিল্প, বিশেষ করে মদ এবং বিনোদনের সাথে সম্পর্কিত শিল্পগুলি, সক্রিয়ভাবে ইসলামী নীতির গ্রহণযোগ্যতাকে দুর্বল করে এবং মুসলমানদের তাদের ধর্ম পালন থেকে নিরুৎসাহিত করে। এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ইসলামবিরোধী মনোভাবের ব্যাপক প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

অধিকন্তু, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করতে আগ্রহী, যা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষায় সংযম এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের সঠিক ব্যবহারের পক্ষে, তারা প্রায়শই তাদের কাছ থেকে নেতিবাচক ধারণার সম্মুখীন হয় যারা অতিরিক্ত কাজ করে - তাদের ইচ্ছার উপর কোনও বাধা ছাড়াই কাজ করে। এই ব্যক্তিরা অন্যদের ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার এবং মুসলমানদের তাদের বিশ্বাস পালন থেকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে, তাদেরকে অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষার জীবনযাত্রায় প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। তারা প্রায়শই ইসলামের নির্দিষ্ট উপাদানগুলির উপর মনোযোগ দেয়, যেমন মহিলাদের পোশাক কোড, এর আকর্ষণ হ্রাস করার জন্য। যাইহোক, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সহজেই এই সমালোচনাগুলির উপর ঊর্ধ্বমুখীতা দেখতে পারেন, যা ইসলামের আত্ম-শৃঙ্খলার উপর জোর দেওয়ার প্রতি অবজ্ঞা থেকে উদ্ভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা মহিলাদের জন্য ইসলামী পোশাক কোডের সমালোচনা করতে পারে, তবে তারা আইন প্রয়োগকারী, সামরিক, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং ব্যবসার মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পেশায় পোশাক কোডের উপর একই নজরদারি প্রসারিত করে না। অন্যান্য পোশাক কোডের উপর তাদের নীরবতার বিপরীতে, ইসলামী পোশাক কোডের এই নির্বাচনী সমালোচনা তাদের যুক্তির ভঙ্গুরতা এবং ভিত্তিহীনতা তুলে ধরে। পরিশেষে, ইসলামের নীতিমালা এবং এর অনুসারীদের সুশৃঙ্খল আচরণই ইসলামের উপর এই বিভিন্ন আক্রমণের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ফলস্বরূপ তারা যেভাবেই পারে ইসলামকে আক্রমণ করে। ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ৩৩:

"আমরা জানি যে তারা যা বলে তাতে তুমি দুঃখিত। আর অবশ্যই, তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং জালেমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।"

সকল ক্ষেত্রেই, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই সর্বদা মহান আল্লাহর প্রকৃত আনুগত্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে, এই স্বীকৃতি দিয়ে যে এটি তাকে শান্তি প্রদান করবে

এবং অন্যদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৩৪:

"আর অবশ্যই তোমার পূর্বেও রসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা মিথ্যারোপের উপর ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল যতক্ষণ না তাদের কাছে আমার বিজয় এসে পৌঁছেছিল..."

বিপরীতে, মানুষকে খুশি করার জন্য মহান আল্লাহকে অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি নষ্ট হবে, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এই ধরনের মানসিকতা তাদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য অর্জনের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করবে, যার ফলে তাদের সম্পর্ক এবং জীবনের অগ্রাধিকারগুলিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

বাহ্যিক সমালোচনার মুখেও মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার জন্য, একজনকে দৃঢ় ঈমান গ্রহণ করতে হবে। সমৃদ্ধি বা প্রতিকূলতার সময়ে, সকল পরিস্থিতিতে, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার জন্য একটি দৃঢ় ঈমান অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত স্পষ্ট নিদর্শন ও শিক্ষার বোধগম্যতা এবং প্রয়োগের মাধ্যমে এই গভীর ঈমান গড়ে তোলা হয়। এই শিক্ষাগুলি দেখায় যে, মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই প্রশান্তি বর্ধন করে। বিপরীতে, যাদের ইসলামী নীতি সম্পর্কে জ্ঞান নেই তাদের ঈমান ভঙ্গুর থাকে, যা তাদের আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে, বিশেষ করে যখন তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ঐশ্বরিক নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এই অজ্ঞতা এই ধারণাকে অস্পষ্ট করে দিতে পারে যে, মহান আল্লাহর আদেশ মেনে চলার জন্য

ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা উভয় জগতে প্রকৃত শান্তি অর্জনের জন্য মৌলিক। ফলস্বরূপ, ইসলামী জ্ঞানের সাধনা এবং প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তিদের জন্য তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের অটল আনুগত্য নিশ্চিত করা। এর অর্থ হলো ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা, যার ফলে পরিণামে একটি সুসংগত মানসিক ও শারীরিক অবস্থা তৈরি হয় এবং তাদের জীবনের সকল দিকের যথাযথ অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৩৪ নং আয়াত:

"আর অবশ্যই তোমার পূর্বেও রসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা মিথ্যারোপের উপর ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল যতক্ষণ না তাদের কাছে আমার বিজয় এসে পৌঁছেছিল..."

অধিকন্তু, এটা বুঝতে হবে যে, যারা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে, তাদের জন্য ঐশ্বরিক সাহায্য নিশ্চিত করা হয়েছে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তবুও, ঐশ্বরিক সাহায্যের সঠিক সময় এবং পদ্ধতি মানুষের ইচ্ছা অনুসারে নয়। বরং, এটি সর্বোত্তম সময়ে এবং সর্বোত্তম উপায়ে আসে, মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান অনুসারে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৩৪:

"... আর আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না..."

অতএব, আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা উচিত, যদিও তারা তাঁর সাহায্য উপলব্ধি করতে না পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এই সত্যকে উপলব্ধি করতে এবং নিজের সংকল্পকে শক্তিশালী করতে, তাদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ইতিহাসের সেই মুহূর্তগুলি পর্যালোচনা করতে হবে যখন মহান আল্লাহ, যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করেছিলেন, এমনকি অসম্ভব পরিস্থিতিতেও তাদের সাহায্য করেছিলেন। ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ৩৪:

"... আর অবশ্যই তোমার কাছে[পূর্ববর্তী] রসূলদের সম্পর্কে কিছু তথ্য এসেছে।"

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা যখন মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে চাইতেন, তখন তারা পবিত্র কুরআনের চিরন্তন অলৌকিক ঘটনা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্রের উপস্থিতি সত্ত্বেও ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছ থেকে অলৌকিক ঘটনা দাবি করতেন।

ফলস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইচ্ছা ছিল আল্লাহ্‌র কাছে তিনি যেন তাদেরকে একটি অলৌকিক ঘটনা দেখান এবং আশা করা যে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহর রীতি মানুষের জন্য কখনও পরিবর্তিত হয়নি, তাই যদি তিনি তাদের অনুরোধকৃত অলৌকিক ঘটনা দেখান এবং তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তিনি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবেন। যেহেতু মহান আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করতে চাননি, তাই তিনি তাদের বোকামিপূর্ণ অনুরোধ পূরণ করা থেকে বিরত ছিলেন। অধ্যায় ১৭ আল-ইসরা, আয়াত ৫৯:

"আর আমাদেরকে নিদর্শন প্রেরণ থেকে আর কোন কিছুই বিরত রাখেনি, কেবল এই কারণে যে পূর্ববর্তীরা সেগুলোকে অস্বীকার করেছিল। আর আমরা সামূদকে উটনী দিয়েছিলাম একটি স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে, কিন্তু তারা তার উপর জুলুম করেছিল। আর আমরা নিদর্শন প্রেরণ করি না কেবল সতর্কীকরণের জন্য।"

এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৩৫ নং আয়াত:

"আর যদি তাদের এড়িয়ে চলা তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তাহলে যদি তুমি পৃথিবীতে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি খুঁজে বের করতে পারো এবং তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসো..."

এরপর আল্লাহ তাআলা এমন এক সরল মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন যেখানে কেউ বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবী জান্নাতের মতো

হয়ে উঠতে পারে যেখানে সকলেই আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ। যেহেতু আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর নির্দেশনা জোর করেন না, কারণ এটি এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষাকে বাতিল করে দেবে, তাই এমন মানুষ সর্বদা থাকবে যারা ইসলামকে অস্বীকার করবে এবং সমালোচনা করবে। এটি একটি অনিবার্য বাস্তবতা যা সকল মুসলমানকে মেনে নিতে হবে। ষষ্ঠ অধ্যায় আল মায়িদাহ, আয়াত ৩৫:

"...কিন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি তাদেরকে হেদায়েতের উপর একত্রিত করতেন। অতএব, কখনও অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি এও ইঙ্গিত দেয় যে কেউ তার চারপাশের লোকেদের উপর সঠিক নির্দেশনা জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। একজন ব্যক্তির কর্তব্য হল তার চারপাশের লোকেদেরকে সঠিক নির্দেশনা এবং ভুল পথ বেছে নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য বাস্তবে শেখানো এবং তারপর তাদের জীবনে সঠিক পথ বেছে নিতে উৎসাহিত করা। কিন্তু তারা শারীরিকভাবে তাদের সঠিক পথ বেছে নিতে বাধ্য করতে পারে না। যে ব্যক্তি এই বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হয় সে সর্বদা যারা ভুল পথ বেছে নেয় তাদের উপর বিরক্ত এবং দুঃখিত থাকবে, এবং এই দুঃখ এমনকি হতাশায় পরিণত হতে পারে যদি তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে তাদের কর্তব্য মানুষকে জীবনে সঠিক পথ বেছে নিতে বাধ্য করা নয়। অধ্যায় ৪৪ আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দাও যে তুমি কেবল একটি স্মরণ করিয়ে দাও। তুমি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নও।"

যারা সঠিক নির্দেশনা চান তারাই ইতিবাচকভাবে সাড়া দেবেন। যারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পেতে চান, এমনকি যদি এর অর্থ তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতাও হয়, কারণ তারা বোঝেন যে এই পৃথিবীতে নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য একটি ছোট মূল্য। এবং যারা উপলব্ধি করেন যে সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলে মনের শান্তি পাওয়া যায় না। ধনী এবং বিখ্যাতদের দেখলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 36:

"শুধুমাত্র যারা শোনে তারাই সাড়া দেবে..."

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণে অটল থাকবে, সে অবশ্যই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাতের সম্মুখীন হবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করবে। এই ব্যাঘাত তাদের পার্থিব এবং পরকালীন জীবনে চাপ, অসুবিধা এবং সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করবে, তারা যে কোনও বৈষয়িক বিলাসিতা উপভোগ করুক না কেন। যে ব্যক্তি এই মনোভাব ধরে রাখবে সে মৃত ব্যক্তির মতো হয়ে যাবে যে পরামর্শ এবং সতর্কবার্তায় সাড়া দেয় না এবং ফলস্বরূপ, তারা বিচারের দিনে তাদের মৃত্যু এবং তাদের কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত তাদের মনোভাব বজায় রাখবে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 36:

"...কিন্তু মৃতদের - আল্লাহ তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন; তারপর তাঁর কাছেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।"

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৩৬ নং আয়াত:

"শুধুমাত্র যারা শোনে তারাই সাড়া দেবে..."

এছাড়াও, মুসলিমদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সঠিকভাবে ইসলামী জ্ঞান শোনে যাতে তারা তাদের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে উৎসাহিত হয়। এর জন্য ইসলামী শিক্ষা মনোযোগ সহকারে শোনা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত করা, ভবিষ্যতে এই শিক্ষাগুলি কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তা মূল্যায়ন করা এবং সেই প্রয়োগের জন্য সত্যিকার অর্থে কাজ করা প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকার ফলে ব্যক্তিরা যে ইসলামী জ্ঞান শোনে তা থেকে সত্যিকার অর্থে উপকৃত হতে পারবে। এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ না করে কেবল ইসলামী শিক্ষাগুলি শুনলে আচরণগত ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে না। এটি একটি মূল কারণ যে অনেক মুসলমান আগের চেয়ে বেশি ইসলামী জ্ঞান লাভের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অর্থপূর্ণ রূপান্তর অনুভব করে না। যে সঠিকভাবে শুনতে ব্যর্থ হয় সে মৃত ব্যক্তির সমতুল্য হবে, যার সাথে কথা বলা থেকে কোনও উপকার হয় না এবং ফলস্বরূপ, তারা ইসলামী জ্ঞান শুনলেও তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করতে থাকবে। এর ফলে এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তির অভাব হবে এবং বিচারের দিনে তাদের জন্য কঠিন হিসাব নেওয়া হবে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 36:

"...কিন্তু মৃতদের - আল্লাহ তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন; তারপর তাঁর কাছেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।"

যখন মহান আল্লাহ মক্কার অমুসলিম নেতাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য তাদেরকে কোন নির্দিষ্ট অলৌকিক ঘটনা প্রদান করতেন না, তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে এটিকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতেন। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৩৭:

"আর তারা বলে, "তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার উপর কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয় না?"...

কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা যে অলৌকিক ঘটনা কামনা করে তা কেবল তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে কারণ তারা অলৌকিক ঘটনা দেখার পরেও ইসলামকে অস্বীকার করতে থাকবে, ঠিক যেমনটি তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা করেছিল। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৩৭:

"... বলুন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।"

এবং ১৭তম সূরা আল-ইসরা, ৫৯তম আয়াত:

"আর আমাদেরকে নিদর্শন প্রেরণ থেকে আর কোন কিছুই বিরত রাখেনি, কেবল এই কারণে যে পূর্ববর্তীরা সেগুলোকে অস্বীকার করেছিল। আর আমরা সামূদকে উটনী দিয়েছিলাম একটি স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে, কিন্তু তারা তার উপর জুলুম করেছিল। আর আমরা নিদর্শন প্রেরণ করি না কেবল সতর্কীকরণের জন্য।"

উপরন্তু, পরবর্তী আয়াতটি মানুষকে অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ঘটনা দেখার জন্য বোকামি করার পরিবর্তে, মহাবিশ্বের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন যা মহান আল্লাহর একত্ববাদকে নির্দেশ করে তা চিনতে এবং উপলব্ধি করতে উৎসাহিত করে। সূরা আল আন'আম, আয়াত 38:

"আর পৃথিবীতে [অথবা ভেতরে] এমন কোন প্রাণী নেই যা তার ডানা দিয়ে উড়ে যায়, [তারা] তোমাদের মতোই সম্প্রদায় ছাড়া..."

উদাহরণস্বরূপ, বিবর্তন হল এক ধরণের মিউটেশন, যা স্বভাবতই অসম্পূর্ণ। অসংখ্য প্রজাতি পরীক্ষা করলে স্পষ্ট হয় যে, তাদের একটি সুরেলা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য জটিলভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা তাদের নিজ নিজ আবাসস্থলে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, উটটির কথাই ধরুন; এটিকে অনন্যভাবে চরম তাপ সহ্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং জল ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকতে পারে, যা এটিকে মরুভূমিতে জীবনের জন্য আদর্শ করে তোলে। অধ্যায় ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ১৭:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ছাগলটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে তার শরীরের ভেতরের যেকোনো দূষিত পদার্থ তার উৎপাদিত দুধ থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে যায়, কারণ যেকোনো দূষণ দুধকে খাওয়ার অযোগ্য করে তুলবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৬৬:

"আর অবশ্যই, তোমাদের জন্য পশুপালনের ক্ষেত্রে একটি শিক্ষা রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে - মলমূত্র ও রক্তের মধ্যে - বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

প্রতিটি প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল নির্ধারিত হয় যা নিশ্চিত করে যে কোনও একক প্রজাতি অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, মাছি মাত্র 3-4 সপ্তাহ বেঁচে থাকে এবং 500 টি পর্যন্ত ডিম উৎপাদন করতে পারে। যদি তাদের জীবনকাল বাড়ানো হয়, তাহলে তাদের জনসংখ্যা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়তে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে অন্যান্য সমস্ত প্রজাতিকে পরাজিত করতে পারে। বিপরীতে, অনেক বেশি আয়ুষ্কাল সম্পন্ন অন্যান্য জীবের বংশধরদের সংখ্যা কম থাকে, যা তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এই ভারসাম্যটি খুব সুনির্দিষ্ট বলে মনে হয় যা কেবল কাকতালীয় নয় এবং বিবর্তন তত্ত্ব এটির জন্য পর্যাপ্তভাবে হিসাব করে না।

প্রতিটি প্রাণী, ছোট হোক বা বড়, তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে শিকারীদের এড়িয়ে তার রিযিক গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। ১৬তম অধ্যায় আন নাহল, আয়াত ৬৮-৬৯:

"আর তোমার প্রভু মৌমাছিকে ওহী পাঠিয়ে বললেন, "পাহাড়ের মধ্যে, গাছের মধ্যে এবং তারা যা তৈরি করে তার মধ্যে ঘর তৈরি করো। তারপর সকল ফল থেকে খাও এবং তোমার প্রভুর পথ অনুসরণ করো।" তাদের পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়, যাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য একটি নিদর্শন রয়েছে।"

অতএব, পৃথিবীর অগণিত প্রাণী এবং তাদের নিখুঁত ব্যবস্থাপনার উপর চিন্তা করাই একমাত্র স্রষ্টা, মহান আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতি উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট।

ঠিক যেমন মহান আল্লাহ মহাবিশ্বের সকল প্রাণীকে তাদের রিযিক নিশ্চিত করার জন্য পরিচালনা করেন, তেমনি তিনি মানুষকেও পরিচালনা করেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৩৮:

"... আমরা রেজিস্টারে একটা জিনিসও অবহেলা করিনি..."

অতএব, প্রত্যেককে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম সংশোধন করছে কারণ উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৩৮:

"... অতঃপর তাদের পালনকর্তার কাছে সমবেত করা হবে।"

কিন্তু যারা মহাবিশ্বের মধ্যে এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে পাওয়া নিদর্শনগুলিকে উপেক্ষা করে তারা অন্ধ এবং বধির, যদিও তাদের দেখার এবং শোনার ক্ষমতা রয়েছে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 39:

"কিন্তু যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, তারা অন্ধকারে বোবা ও বধির..."

যে ব্যক্তি মহাবিশ্বের মধ্যে মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং ইসলামী শিক্ষাগুলিকে চিনতে ব্যর্থ হয়, সে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নেভিগেট করার জন্য প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না যাতে তারা কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং ক্ষতি এড়াতে পারে। ফলস্বরূপ, তারা এই পৃথিবীতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবে, ঠিক যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি অন্ধকার প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। ফলস্বরূপ, তারা ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে না এবং তারা কোনও প্রকৃত সুবিধাও পাবে না। এই ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যাবে।

ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাতের মুখোমুখি হবে, তাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য অপ্রস্তুত রাখবে। এর ফলে তাদের পার্থিব এবং পরকালীন জীবনে চাপ, অসুবিধা এবং সংগ্রামের সৃষ্টি হবে, তাদের কাছে যে কোনও বস্তুগত সম্পদ থাকুক না কেন।

যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের উপর হেদায়েত জোর করে চাপিয়ে দেন না, কারণ এটি এই পৃথিবীর জীবনের পরীক্ষাকে বাতিল করে দেয়, তাই তিনি মানুষকে সঠিক হেদায়েত পাওয়ার জন্য জ্ঞান এবং শক্তি প্রদান করেন, কিন্তু তাদের জীবনে তাদের নিজস্ব পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ দেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৩৯:

"...আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন; আর যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।"

এরপর আল্লাহ তাআলা ইসলামের সঠিক নির্দেশনার সমর্থনে আরেকটি প্রমাণ পেশ করেন। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৪০-৪১:

"বলুন, "তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ে অথবা তোমাদের উপর কিয়ামত এসে যায়, তাহলে কি তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে?" না, বরং তোমরা তাঁকেই ডাকবে, আর তিনি ইচ্ছা

করলে তোমরা যে উদ্দেশ্যে তাঁকে ডাকতে, তা দূর করে দেবেন এবং তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক করো, সেগুলো ভুলে যাবে।"

সৃষ্টির উপর তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের সাথে সাথে, মহান আল্লাহর একত্বের একটি উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত হল এমন একটি ঘটনা যা ব্যক্তিরা তাদের বিশ্বাস বা অভাব নির্বিশেষে অনুভব করে। প্রকৃত কষ্টের সময়ে, যখন ব্যক্তিরা তাদের উপলব্ধ সম্পদ ব্যবহার করে তাদের সমস্যাগুলি সমাধান করতে অক্ষম হন, তখন তারা সহজাতভাবে এক ঈশ্বর, মহান আল্লাহ, এর দিকে ফিরে যান। হতাশার মুহূর্তে, তারা একাধিক দেবতাকে ডাকা থেকে বিরত থাকেন, কারণ তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তা তাদেরকে একক ঐশ্বরিক উপস্থিতির সন্ধান করতে বাধ্য করে। এই সত্যটি প্রায়শই চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ধারাবাহিকে চিত্রিত করা হয়, যেখানে চরিত্রগুলি, এমনকি যারা কোনও দেবতায় বিশ্বাস করে না, তারাও তাদের প্রয়োজনের সময় এক ঈশ্বরকে ডাকতে দেখে। চলচ্চিত্র নির্মাতারা ধর্মীয় বিষয়গুলিকে ছোট করে দেখার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এই বাস্তবতা সিনেমার দৃশ্যপটে চিত্রিত করা হচ্ছে।

বিপদের সময় এক ঈশ্বর, মহান আল্লাহকে ডাকার এই সহজাত আকাঙ্ক্ষা মানুষের আত্মার গভীর থেকে উদ্ভূত হয়। এই আত্মা, যা একসময় মহান আল্লাহর উপস্থিতিতে বিদ্যমান ছিল, সমস্ত সৃষ্টির উপর তাঁর প্রভুত্ব, একত্ব এবং সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব স্বীকার করেছিল। সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ১৭২:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের বের করেছিলেন এবং তাদের নিজেদের উপর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে], "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" তারা বলল, "হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি।"..."

এই মুহূর্তগুলিতে মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য, কারণ এগুলি স্পষ্টভাবে মহান আল্লাহর একত্ববাদকে নির্দেশ করে। এই ধরনের সচেতনতা তাদের মধ্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস জাগাতে পারে যারা এখনও বিশ্বাস করেনি, এবং এটি তাদের তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করে সত্যিকার অর্থে তাঁর আনুগত্য করতে অনুপ্রাণিত করবে যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে, কারণ এতে প্রকৃত শান্তি এবং সাফল্য পাওয়া যায়। এই সত্যটি মানুষের আত্মার গভীরে অনুরণিত হয়, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ২২:

"তিনিই তোমাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমণের ক্ষমতা দেন। এমনকি যখন তোমরা জাহাজে থাকো এবং সেগুলোকে নিয়ে ভালো বাতাস বয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তখন ঝড়ো হাওয়া আসে এবং সর্বত্র তরঙ্গ তাদের উপর আছড়ে পড়ে এবং তারা ডুবে যাওয়ার আশা করে, তখন তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর প্রতি তাঁর দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, "যদি তুমি আমাদের এ থেকে রক্ষা করো, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

এবং ৪১ ফুসসিলাত অধ্যায়, ৫৩ নং আয়াত:

"আমরা তাদেরকে দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

যদি মানুষ নিজেদের মধ্যে এই নিদর্শনটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যা ইসলামের সত্যতা নির্দেশ করে, তাহলে মহান আল্লাহ ইতিহাস থেকে আরেকটি নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৪২-৪৩:

"আর আমি তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলোর কাছে [রাসূল] প্রেরণ করেছি, তারপর তাদেরকে দুঃখ ও যন্ত্রণা দিয়ে পাকড়াও করেছি যাতে তারা [আমাদের কাছে] বিনীত হয়। তাহলে, যখন তাদের উপর আমার আযাব এসেছিল, তখন কেন তারা বিনীত হয়নি?"...

যারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থেকেছেন, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তারা অসুবিধা ও সমস্যায় পড়েছেন কারণ তাদের মনোভাব তাদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যহীন অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করা সত্ত্বেও, তাদের চিন্তা করা এবং সিদ্ধান্তে আসা উচিত ছিল যে তাদের আচরণই তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যার সরাসরি কারণ। কিন্তু তারা তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষায় ডুবে থাকায়, তারা এই স্পষ্ট সত্যের প্রতি অন্ধ হয়ে পড়ে এবং পরিবর্তে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতেই অটল থাকে। সূরা 6 আল-আন'আম, আয়াত 43:

"...কিন্তু তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে তাদের কর্মকাণ্ড সুশোভিত করে দেখাল।"

যখন কারো কর্মকাণ্ড তার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তার আধ্যাত্মিক হৃদয় নিজের ক্ষতি সম্পর্কে অন্ধ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, তারা তাদের আচরণে অটল থাকে।

এছাড়াও, শয়তান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো জাগতিক জিনিস ব্যবহার করে মানুষকে বোঝায় যে মনের শান্তি নিহিত আছে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের মধ্যে, যার ফলে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার অব্যাহত রাখতে রাজি হয়। যদি সে সঠিক হয়, তাহলে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানসিক শান্তি পাবে ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা। এটা স্পষ্ট যে এটি এমন নয়। শয়তান মানুষকে সমাজের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত গ্রহণ করতেও রাজি করায় কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠরা সবাই ভুল হতে পারে না। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা সঠিক নয়। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে নতুন প্রমাণ আবির্ভূত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত ভুল প্রমাণিত হতে পারে, যেমনটি পৃথিবী সমতল ছিল এই ভুল ধারণায় দেখা যায়। জনতার অযৌক্তিকভাবে অনুসরণ করা এড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই খারাপ সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। পরিবর্তে, ব্যক্তিদের জ্ঞান এবং প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য তাদের যুক্তি এবং বুদ্ধি ব্যবহার করা উচিত, যাতে তারা জ্ঞানী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়, এমনকি যদি এই পছন্দগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামত থেকে ভিন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম এই কারণে অন্ধ অনুকরণকে দৃঢ়ভাবে নিরুৎসাহিত করে এবং মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং বোধগম্যতার সাথে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮ :

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অন্ধভাবে অনুসরণ করলে কেবল মানসিক শান্তি থেকে আরও দূরে সরে যেতে হয়, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে থাকবে।

শয়তানের এইসব কৌশল এবং অন্যান্য কৌশল কাটিয়ে ওঠার জন্য, দৃঢ় ঈমান গ্রহণ করতে হবে। সমৃদ্ধি বা প্রতিকূলতার সময়ে, সকল পরিস্থিতিতে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি ধারাবাহিকভাবে আনুগত্যের জন্য একটি দৃঢ় ঈমান অপরিহার্য। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট নিদর্শন ও শিক্ষাগুলি বোঝা এবং প্রয়োগ করার মাধ্যমে এই গভীর ঈমান গড়ে তোলা হয়। এই শিক্ষাগুলি দেখায় যে, মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনেই প্রশান্তি বয়ে আনে। বিপরীতে, ইসলামী নীতি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব থাকা ব্যক্তিরা প্রায়শই দুর্বল ঈমান প্রদর্শন করে, যা তাদেরকে আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলে, বিশেষ করে যখন তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ঐশ্বরিক নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এই অজ্ঞতা তাদের এই উপলব্ধিকে অস্পষ্ট করে দিতে পারে যে, উভয় জগতে প্রকৃত শান্তি অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করার ইচ্ছা পোষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিদের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার ফলে সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের অটল আনুগত্য নিশ্চিত করা যায়। এর অর্থ হলো ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা, যার ফলে পরিণামে একটি সুসংগত মানসিক ও শারীরিক অবস্থা তৈরি হয় এবং তাদের জীবনের সকল দিকের সঠিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৪২-৪৩ আয়াত:

"আর আমি তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলোর কাছে [রাসূল] প্রেরণ করেছি, তারপর তাদেরকে দুঃখ ও যন্ত্রণা দিয়ে পাকড়াও করেছি যাতে তারা [আমাদের কাছে] বিনীত হয়। তাহলে যখন তাদের উপর আমার আযাব এসেছিল, তখন কেন তারা বিনীত হয়নি? বরং তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তাদের কাছে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে তুলেছিল।"

কিন্তু যখন মানুষ পার্থিব বিলাসিতা সত্ত্বেও তাদের মানসিক ও শারীরিক সমস্যার কারণ নিয়ে চিন্তা করেনি, তখন মহান আল্লাহ তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে তাদের আচরণ সংশোধন করার আরেকটি সুযোগ দিয়েছিলেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৪৪:

"অতএব যখন তারা সেই বিষয় ভুলে গেল যা তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম..."

নিয়তের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা। কথায় কৃতজ্ঞতা বলতে ইতিবাচক কথা বলা অথবা নীরবতা বেছে নেওয়া বোঝায়। অধিকন্তু, কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষায় বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রাপ্ত আশীর্বাদগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। যারা এইভাবে কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করে তারা ইহকাল ও পরকালে অতিরিক্ত আশীর্বাদ, শান্তি এবং রহমত লাভের নিশ্চয়তা পায়। কিন্তু যেহেতু মানুষ মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণে অটল থাকে, তাই তাদের উপর এই পৃথিবীতে চূড়ান্ত শাস্তি অবতীর্ণ হয়। ষষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ৪৪-৪৫:

"... যখন তারা তাদের প্রদত্ত জিনিসের জন্য আনন্দিত হয়েছিল, তখন আমরা তাদের হঠাৎ করে পাকড়াও করেছিলাম, আর তারা হতাশ হয়ে পড়েছিল। ফলে অন্যায়কারীরা নির্মূল হয়ে গিয়েছিল..."

যদি এইসব লোকদের নির্মূল না করা হত, তাহলে তাদের পরবর্তী লোকেরা অন্ধভাবে তাদের অনুকরণ করতো মহান আল্লাহর অবাধ্যতায়। উপরন্তু, যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তারা সর্বদা আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে। ফলস্বরূপ, সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ও অবিচার ছড়িয়ে পড়বে। অতএব, সমাজ থেকে তাদের নির্মূল করা বাকি মানবজাতির জন্য একটি আশীর্বাদ ছিল। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৪৫:

"অতঃপর যারা অন্যায় করেছিল তাদের ধ্বংস করা হল। এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ মানুষকে কাফের বলেননি, বরং তাদের অবাধ্যতার কথা বলেছেন, যখন তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে থাকে। অতএব, এই পর্যায়গুলি মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে মুসলমানরাও এই পর্যায়গুলি ভোগ করেছে। অতএব, মুসলিমদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে এই পরিণতি এড়াতে হবে। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে সহায়তা করবে, যা তাদেরকে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত করার সময় তাদের সম্পর্ক এবং দায়িত্বগুলিকে কার্যকরভাবে অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম করবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতে শান্তি বৃদ্ধি করবে। উপরন্তু, এই আচরণ আল্লাহর অধিকার নিশ্চিত করবে এবং মানুষ পূর্ণ হবে। এর ফলে সমাজের মধ্যেও ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রসার ঘটবে।

ফলস্বরূপ, ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব স্বার্থে ইসলামী নীতিগুলি গ্রহণ এবং প্রয়োগ করা উচিত, এমনকি যখন এই নীতিগুলি তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাদের একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ মেনে চলেন, স্বীকার করেন যে এটি তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করে, নির্দিষ্ট চিকিৎসা এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাসের অস্বস্তি সত্ত্বেও। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী সর্বোত্তম মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করতে পারেন, তেমনি একজন ব্যক্তি যিনি ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করেন তিনিও পারেন। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দিতে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। সমাজের মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার বোধগম্যতা এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সর্বদা অপর্যাপ্ত থাকবে, যতই গবেষণা করা হোক না কেন, কারণ এটি একজন ব্যক্তির জীবনে সম্মুখীন হওয়া প্রতিটি চ্যালেঞ্জের সমাধান করতে পারে না। তাদের নির্দেশনা সকল ধরণের মানসিক এবং শারীরিক চাপ দূর করতে পারে না, এবং এটি গ্যারান্টিও দিতে পারে না যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অন্তর্নিহিত

সীমাবদ্ধতার কারণে কেউ তাদের সম্পর্ক এবং দায়িত্বগুলিকে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেবে। এই জ্ঞান কেবল মহান আল্লাহ তাআলারই আছে, যা তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতির সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। যারা ইসলামী শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রাপ্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না তাদের তুলনা করলে এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও অনেক রোগী তাদের নির্ধারিত চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পুরোপুরি বুঝতে পারেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারদের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও, মহান আল্লাহ ব্যক্তিদের ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করতে উৎসাহিত করেন যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পারে। তিনি ইসলামী শিক্ষার উপর অন্ধ বিশ্বাস দাবি করেন না; বরং, তিনি চান যে ব্যক্তিরা স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে এর বৈধতা স্বীকার করুক। তবে, এর জন্য একটি উন্মুক্ত মন এবং একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব , মনের শান্তির আবাসস্থল, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন যে কাকে তা দেওয়া হবে এবং কাকে দেওয়া হবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরই প্রশান্তি দান করেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

অধ্যায় – আল আন'আম, আয়াত ৪৬-৭৩

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ
يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾

قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٧﴾

وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى
مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

وَأَنذِرۡ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحۡشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ لَيۡسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِيّٞ
وَلَا شَفِيعٞ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ٥١

وَلَا تَطۡرُدِ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۚ مَا عَلَيۡكَ مِنۡ
حِسَابِهِم مِّن شَيۡءٖ وَمَا مِنۡ حِسَابِكَ عَلَيۡهِم مِّن شَيۡءٖ فَتَطۡرُدَهُمۡ فَتَكُونَ مِنَ
ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٢

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنۢ بَيۡنِنَآۗ
أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَعۡلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ ٥٣

وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلَىٰ
نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَ أَنَّهُۥ مَنۡ عَمِلَ مِنكُمۡ سُوٓءَۢا بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ
وَأَصۡلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥٤

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ وَلِتَسۡتَبِينَ سَبِيلُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٥٥

قُلۡ إِنِّي نُهِيتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهۡوَآءَكُمۡ
قَدۡ ضَلَلۡتُ إِذٗا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ ٥٦

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِۦ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
بِهِۦٓ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ ﴿٥٧﴾

قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ
أَعْلَمُ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٨﴾

۞ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ
فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
﴿٦٠﴾

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ
ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾

ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَٰسِبِينَ ﴿٦٢﴾

قُلۡ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ تَدۡعُونَهُۥ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةٗ لَّئِنۡ أَنجَىٰنَا مِنۡ
هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ٦٣

قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنۡهَا وَمِن كُلِّ كَرۡبٖ ثُمَّ أَنتُمۡ تُشۡرِكُونَ ٦٤

قُلۡ هُوَ ٱلۡقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبۡعَثَ عَلَيۡكُمۡ عَذَابٗا مِّن فَوۡقِكُمۡ أَوۡ مِن تَحۡتِ أَرۡجُلِكُمۡ أَوۡ
يَلۡبِسَكُمۡ شِيَعٗا وَيُذِيقَ بَعۡضَكُم بَأۡسَ بَعۡضٍۗ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّهُمۡ
يَفۡقَهُونَ ٦٥

وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوۡمُكَ وَهُوَ ٱلۡحَقُّۚ قُل لَّسۡتُ عَلَيۡكُم بِوَكِيلٖ ٦٦

لِّكُلِّ نَبَإٖ مُّسۡتَقَرّٞۚ وَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٦٧

وَإِذَا رَأَيۡتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦۚ
وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٦٨

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنۡ حِسَابِهِم مِّن شَيۡءٖ وَلَٰكِن ذِكۡرَىٰ لَعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ ٦٩

وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا
وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِىٌّ وَلَا
شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا۟ بِمَا
كَسَبُوا۟ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

قُلْ أَنَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَٰبٌ يَدْعُونَهُۥٓ
إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ
ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧١﴾

وَأَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن
فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ
وَٱلشَّهَٰدَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

"বলুন, "তুমি কি ভেবে দেখেছো: যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে যে তোমাদেরকে এগুলো ফিরিয়ে আনতে পারে?" দেখো, আমরা কিভাবে আয়াতগুলো নানাভাবে বর্ণনা করি; তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

"বলুন, "তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর অপ্রত্যাশিতভাবে অথবা প্রকাশ্যে আসে, তাহলে জালেম সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে কি?"

আর আমরা রাসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করি। অতএব, যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধন করে, তার কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

কিন্তু যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে, তাদের অবাধ্যতার কারণে শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে।

বলো, "আমি তোমাদের বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর [রিজিক সম্বলিত] ভান্ডার আছে, অথবা আমি অদৃশ্য বিষয় জানি, আর আমি তোমাদের বলি না যে আমি একজন ফেরেশতা। আমি কেবল সেই ওহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে আসে।" বলো, "অন্ধ কি চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সমান? তাহলে কি তোমরা চিন্তা করবে না?"

আর যারা আশঙ্কা করে যে তাদের প্রতিপালকের সামনে একত্রিত করা হবে - তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক এবং সুপারিশকারী থাকবে না - আপনি এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করুন [কুরআন] যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

আর যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে তাড়িয়ে দিও না। তাদের কোন হিসাব তোমার উপর নেই এবং তাদের উপর তোমার কোন হিসাব নেই। যদি তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দাও, তাহলে তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর এভাবেই আমি তাদের কাউকে কাউকে অন্য কাউকে দিয়ে পরীক্ষা করেছি যাতে তারা বলে, "আমাদের মধ্যে কি এদেরকেই আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?" আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে ভালো জানেন না?

আর যখন তারা তোমার কাছে আসে যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে, তখন বলো, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা নিজের উপর রহমত ফরজ করে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশত কোন মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বলো, "আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ডাকো, তাদের ইবাদত করতে।" বলো, "আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না, তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হব এবং আমি [সঠিক] পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।"

বলো, "আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর আছি, আর তোমরা তা অস্বীকার করেছ। তোমরা যা তাড়াতাড়ি করছো তা আমার কাছে নেই। ফয়সালা কেবল আল্লাহরই। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।"

বলুন, যদি আমার কাছে তা থাকত যার জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি করছো, তাহলে আমার ও তোমাদের মধ্যে ব্যাপারটির মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে ভালো জানেন।

আর তাঁর কাছেই অদৃশ্যের চাবিকাঠি রয়েছে; তিনি ছাড়া কেউ এগুলো জানে না। আর তিনি জানেন স্থলে ও সমুদ্রে যা আছে। এমন কোন পাতা পড়ে না যা তিনি জানেন না। আর পৃথিবীর অন্ধকারে এমন কোন শস্য নেই যা আর্দ্র বা শুষ্ক নয় যা স্পষ্ট কিতাবে লিখিত নেই।

আর তিনিই সেইজন যিনি রাতের বেলায় তোমাদের প্রাণ হরণ করেন এবং দিনের বেলায় তোমরা যা করছো তা জানেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে দিনের বেলায় পুনরুজ্জীবিত করেন যাতে একটি নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়। তারপর তাঁরই কাছে

তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তারপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

আর তিনি তাঁর বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান, আর তিনি তোমাদের উপর রক্ষক-ফেরেশতা প্রেরণ করেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে, তখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতারা তাকে নিয়ে যান এবং তারা [তাদের কর্তব্যে] কোন ত্রুটি করে না।

অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। নিঃসন্দেহে, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

বলুন, "কে তোমাদেরকে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন [যখন] তোমরা তাঁকে ডাকো [জোরে] এবং গোপনে, 'যদি তিনি আমাদের এই [সঙ্কট] থেকে উদ্ধার করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব?'"

বলুন, "আল্লাহই তোমাদেরকে তা থেকে এবং প্রতিটি বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তারপরও তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করো।"

বলো, "তিনিই তোমাদের উপর উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে বিপদ পাঠাতে সক্ষম, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একদলকে অন্য দলের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাতে সক্ষম।" দেখ, আমরা কীভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি যাতে তারা বুঝতে পারে।

কিন্তু তোমার সম্প্রদায় একে মিথ্যা বলেছে, অথচ তা সত্য। বলো, "আমি তোমাদের উপর কোন ব্যবস্থাপক নই।"

কারণ প্রতিটি সংবাদই চূড়ান্ত; এবং তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।

আর যখন তুমি তাদেরকে দেখো যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে [অপমানজনক আলোচনায় লিপ্ত], তখন তাদের কাছ থেকে সরে যাও যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরেও জালেমদের সাথে থেকো না।"

আর যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের উপর তাদের [অপরাধীদের] কোন জবাবদিহি করা হয় না, বরং [কেবলমাত্র] একটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য - যাতে তারা তাঁকে ভয় করে।

আর যারা তাদের ধর্মকে খেলা ও তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে, তাদেরকে ছেড়ে দাও। বরং এর মাধ্যমে [পবিত্র কুরআন] স্মরণ করিয়ে দাও, যাতে কোন আত্মা তার কৃতকর্মের জন্য ধ্বংসের মুখে পতিত না হয়। আল্লাহ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক এবং সুপারিশকারী থাকবে না। আর যদি সে সমস্ত প্রতিদান প্রদান করে, তবুও তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না। এরাই তারা যারা তাদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত। তাদের জন্য ফুটন্ত পানি পান করা হবে এবং তাদের কুফরির কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থাকবে।

বল, "আমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? আর আল্লাহ আমাদেরকে পথ দেখানোর পর আমাদের কি পশ্চাদপসরণ করা হবে? [তবে আমরা কি] সেই ব্যক্তির মতো যাকে শয়তানরা পৃথিবীতে বিভ্রান্ত করে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে, [যখন তার সঙ্গীরা তাকে পথ দেখানোর দিকে আহ্বান করছে এবং [আহ্বান করছে] যে 'আমাদের কাছে এসো।" বলো, "নিশ্চয়ই আল্লাহর পথই পথ দেখানো; এবং আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করি।

আর নামায কায়েম করো এবং তাঁকে ভয় করো।" আর তিনিই সেইজন যার কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।

আর তিনিই আসমান ও জমিনকে সত্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন। আর যেদিন তিনি বলবেন, "হও", আর তা হয়ে যাবে, সেদিন তাঁর কথাই সত্য। আর যেদিন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন তাঁরই রাজত্ব। [তিনি] অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত; এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"

যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং বোধশক্তি সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন, তাই কেউ যদি এগুলোর অপব্যবহার অব্যাহত রাখে তবে তিনি এগুলো দূর করতে পারেন। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৪৬:

"বলুন, "তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে যে এগুলো তোমাদের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারে?" দেখো, আমরা কিভাবে আয়াতগুলো নানাভাবে বর্ণনা করি; তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।"

কিন্তু যদি কেউ এইসব নিয়ামত এবং আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত অন্যান্য অসংখ্য নিয়ামতগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে উভয় জগতেই আল্লাহর শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৪৭:

"বলুন, "তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর অপ্রত্যাশিতভাবে অথবা প্রকাশ্যে আসে, তাহলে জালেম সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে?"

এই পৃথিবীতে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়, সে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতায় ভারসাম্যহীনতা অনুভব করবে, যার ফলে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক

জীবনে অস্থিরতা দেখা দেবে এবং তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারবে না। এর ফলে তারা পার্থিব এবং পরকালীন উভয় জীবনেই চাপ এবং অসুবিধার সম্মুখীন হবে , যদিও তারা যেকোনো বৈষয়িক আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে পারে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৪৭ নং আয়াত:

"বলুন, "তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর অপ্রত্যাশিতভাবে অথবা প্রকাশ্যে আসে, তাহলে জালেম সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে?"

এই আয়াতটি এই মিথ্যা বিশ্বাসকেও দূর করে যে, কেউ যদি আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে তার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখতে পারে, তবুও অজুহাত, সুপারিশ অথবা আল্লাহর সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। এই ধরনের মিথ্যা বিশ্বাস ধারণ করা সরাসরি আল্লাহর ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার প্রতি চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করে এবং এটি এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি কেবল আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করে। অধ্যায় ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

এই আয়াতটি মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশা এবং নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা হলো উভয় জগতে তাঁর রহমত ও ক্ষমার প্রত্যাশা করে আল্লাহর প্রতি অবিরাম অবাধ্যতা। বিপরীতে, প্রকৃত আশার মূলে রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি, ইসলামী নীতি অনুসারে তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা এবং উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে লিপিবদ্ধ একটি হাদিসে এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, এই পার্থক্যটি স্বীকৃতি দেওয়া এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা থেকে দূরে থেকে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রতি খাঁটি আশা গড়ে তোলা অপরিহার্য, কারণ ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা তাদের এই জীবনে বা পরকালে কোনও উপকারে আসবে না। অধ্যায় ৬ আল আন'আম, আয়াত ৪৮:

" আর আমরা রাসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করি। অতএব যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সুসংবাদ এবং সতর্কীকরণ কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই উপকারী যে এগুলো অনুসরণ করে। অতএব, সুসংবাদ এবং সতর্কীকরণ অনুসরণ

না করা পর্যন্ত এগুলো বিশ্বাস করা কারো জন্য কল্যাণকর এবং ক্ষতি এড়াতে সাহায্য করবে না। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৪৮:

"... *অতএব যারা ঈমান আনবে এবং সংস্কার করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।*"

মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য, একজন ব্যক্তির কাছ থেকে তাদের নিয়ত, কথা এবং কর্মের সংস্কার আশা করা হয়। তাদের অবশ্যই কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে তাদের নিয়ত সংশোধন করতে হবে। অন্য যেকোনো কারণে কাজ করলে উভয় জগতেই সওয়াব পাওয়া যাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তাদের অবশ্যই ভালো কথা বলে অথবা নীরব থেকে তাদের বক্তৃতা সংশোধন করতে হবে। পরিশেষে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের কর্মের সংস্কার করতে হবে। এই পদ্ধতি ব্যক্তিদের একটি সুসংগত মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে সহায়তা করবে, যা তাদেরকে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তাদের সম্পর্ক এবং দায়িত্বগুলিকে যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দিতে সাহায্য করবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতে প্রশান্তি বর্ধন করবে।

কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ পূর্ণতা দাবি করেন না, তাই যখনই কেউ পাপ করে ফেলে, তখন তাকে কেবল আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে এবং আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকতে হবে। প্রকৃত অনুতাপের অর্থ হল অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের কাছ থেকে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তবে শর্ত থাকে যে এটি অতিরিক্ত সমস্যার সৃষ্টি না করে। একই বা অনুরূপ পাপের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার এবং আল্লাহ এবং অন্যান্যদের উপর

লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার সংশোধন করার জন্য আন্তরিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য। অধিকন্তু, ইসলামী নীতি অনুসারে, আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে, মহান আল্লাহকে আনুগত্য করার জন্য একজনের ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা করা উচিত। সূরা 6 আল আন'আম, আয়াত 48:

"... *অতএব যারা ঈমান আনবে এবং সংস্কার করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।*"

এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তি জীবনের চ্যালেঞ্জ থেকে মুক্ত থাকবেন, কারণ এটি এই পৃথিবীর জীবনের পরীক্ষার বিরোধিতা করবে। বরং, এই আয়াতটি ইঙ্গিত দেয় যে যারা ইসলামী নীতি অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে বিজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করে সত্যিকার অর্থে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা জীবনের পরীক্ষা এবং ক্লেশ মোকাবেলা করার জন্য মানসিক দৃঢ়তা লাভ করবে এবং শেষ পর্যন্ত দুনিয়া এবং আখেরাতে উভয় ক্ষেত্রেই প্রশান্তি অর্জন করবে।

কিন্তু যারা ঐশ্বরিক ওহীর মাধ্যমে মানবজাতিকে প্রদত্ত স্পষ্ট সতর্কবাণী এবং সুসংবাদ উপেক্ষা করতে পছন্দ করে, তারা অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাতের সম্মুখীন হবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে হারিয়ে ফেলবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য অপ্রস্তুত থাকবে। এর ফলে তারা যে কোনও বস্তুগত বিলাসিতা উপভোগ করুক না কেন, এই জীবন এবং

পরকালীন জীবনে চাপ এবং অসুবিধা দেখা দেবে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 49:

"যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে, তাদের অবাধ্যতার কারণে শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে।"

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে চাননি এবং ইসলামের আগমনের সাথে সাথে তাদের সামাজিক প্রভাব ও নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে তারা ইসলামের মাধ্যমে প্রদত্ত সতর্কীকরণ ও সুসংবাদ উপেক্ষা করেছিলেন এবং অন্যদেরও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ , তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করার জন্য ভিত্তিহীন অজুহাত তৈরি করেছিলেন, যেমন পবিত্র নবী (সাঃ) এর মানবিক স্বভাবকে চ্যালেঞ্জ করা, কারণ তারা দাবি করেছিলেন যে একজন পবিত্র নবী (সাঃ) একজন ঐশ্বরিক সৃষ্টি যার অদ্ভুত এবং অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা রয়েছে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৫০:

"বলুন, "আমি তোমাদের বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর [রিজিক সম্বলিত] ভান্ডার আছে অথবা আমি অদৃশ্য বিষয় জানি, আর আমি তোমাদের বলি না যে আমি একজন ফেরেশতা..."

একজন নবী (সাঃ) এর কাজ মানবজাতির জন্য অনন্যভাবে তৈরি, তাই এই ভূমিকার জন্য ফেরেশতাদের মতো সত্তাদের নিযুক্ত করা অযৌক্তিক। একজন নবী (সাঃ) এর

মূল লক্ষ্য হলো জীবনের বিভিন্ন দিক কীভাবে পরিচালনা করতে হয় সে সম্পর্কে ব্যক্তিদের জন্য একটি বাস্তব মডেল হিসেবে কাজ করা। মানুষের বিপরীতে, ফেরেশতারা মানুষের অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞতা অর্জন করে না, যেমন ক্লান্তি, যা মানুষের ফেরেশতা নবী (সাঃ) এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করবে, যার ফলে তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সামনে তাদের অজুহাত প্রদান করবে। ফলস্বরূপ, এমনকি যদি আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতাকে নবী (সাঃ) হিসাবে মনোনীত করেন, তবুও মানুষ যাতে সত্যিকার অর্থে তাকে অনুকরণ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য তাকে মানবিক রূপ প্রদান করা প্রয়োজন। অতএব, নবী (সাঃ) কে অবশ্যই মানব হতে হবে যাতে তাদের আচরণ অন্যরা অনুকরণ করতে পারে এবং তাদের আচরণ সরাসরি ঐশ্বরিক নির্দেশনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সূরা 6 আল-আন'আম, আয়াত 50:

"... আমি কেবল সেই ওহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে আসে..."

যেহেতু পবিত্র নবীগণ, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তাদের সকল উদ্দেশ্য, কথাবার্তা এবং কর্মকাণ্ড ঐশ্বরিকভাবে পরিচালিত। অতএব, যারা তাদের অনুসরণ করবে তারা তাদের সকল কর্মকাণ্ডও প্রমাণ এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করবে। এটি পার্থিব বা ধর্মীয় যেকোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে সঠিক নির্দেশনা নিশ্চিত করবে যাতে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে, যারা পবিত্র নবীগণ, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত তাদের আকাঙ্ক্ষা বা অন্যদের আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। ফলস্বরূপ, তারা জীবনে সর্বদা ভুল সিদ্ধান্ত নেবে এবং তাই এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার সম্মুখীন হবে, যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি অন্ধকার প্রান্তরে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজেদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে অক্ষম এবং সুবিধা অর্জন করতে অক্ষম। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 50:

"... আমি কেবল সেই ওহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে আসে।" বলুন, "অন্ধ কি চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সমান? তাহলে কি তোমরা চিন্তা করবে না?"

অতএব, ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব স্বার্থে ইসলামী নীতিমালা গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়ন করা উচিত, এমনকি যখন এই নীতিগুলি তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ অনুসরণ করেন, বুঝতে পারেন যে এটি তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে, নির্দিষ্ট ওষুধের অপ্রীতিকরতা এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস সত্ত্বেও। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী সর্বোত্তম মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি একজন ব্যক্তি যিনি ইসলামী শিক্ষা মেনে চলেন তিনিও হবেন। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে একটি সুসংগত মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত জ্ঞানের অধিকারী। সমাজের মধ্যে মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার সম্মিলিত বোধগম্যতা, ব্যাপক গবেষণা সত্ত্বেও, এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, কারণ এটি জীবনে সম্মুখীন হওয়া প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে না। তাদের নির্দেশনা সকল ধরণের মানসিক এবং শারীরিক চাপ প্রতিরোধ করতে পারে না, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতার কারণে এটি ব্যক্তির জীবনের সঠিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে না। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়া এই ব্যাপক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলারই আছে। যারা তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদ ইসলামী শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না তাদের পর্যবেক্ষণ করলে এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও অনেক রোগী তাদের নির্ধারিত চিকিৎসার পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বুঝতে পারেন না এবং এভাবে তাদের ডাক্তারদের উপর অন্ধ বিশ্বাস রাখেন, তবুও আল্লাহ তাআলা ব্যক্তিদের ইসলামের শিক্ষাগুলি চিন্তা করতে উৎসাহিত করেন যাতে তারা তাদের জীবনে এর উপকারী প্রভাব বুঝতে

পারে। তিনি এই শিক্ষাগুলিতে অন্ধ বিশ্বাসের প্রয়োজন করেন না; বরং তিনি চান যে ব্যক্তিরা স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে এর বৈধতা স্বীকার করে। তবে, এর জন্য ইসলামের শিক্ষার প্রতি একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্তমনা দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের উপর একমাত্র কর্তৃত্বকারী, মনের শান্তির আবাসস্থল, তাই তিনিই একমাত্র নির্ধারণ করেন যে কাকে এই শান্তি দেওয়া হবে এবং কাকে দেওয়া হবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ৫০-৫১:

"... আমি কেবল সেই ওহীরই অনুসরণ করি যা আমার কাছে আসে।" বলুন, "অন্ধ কি চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সমান? তাহলে কি তোমরা চিন্তা করবে না?" এবং কুরআনের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করো যারা ভয় করে যে তাদের প্রতিপালকের সামনে একত্রিত করা হবে - তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক এবং সুপারিশকারী থাকবে না - যাতে তারা ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠে।"

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী একমাত্র ব্যক্তিই কাজ করবে, যে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার উপর সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে। অতএব, বিচারের দিনে তাদের বিশ্বাসের শক্তি মূল্যায়ন করার জন্য এটি একটি চমৎকার উপায়। বিচারের দিনে বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, তত বেশি তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং সম্প্রসারিতভাবে, মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য মেনে চলবে, কারণ বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য এটিই একমাত্র উপায়। অতএব, বিচারের দিনে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত হয়। মহাবিশ্বের মধ্যে বিচারের দিন নির্দেশ করে এমন লক্ষণগুলি নিয়ে চিন্তা করলে এটি অর্জন করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বৃষ্টির মাধ্যমে অনুর্বর ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটি সুপ্ত বীজকে জীবিত করেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ, মানুষের পুনরুত্থান করার ক্ষমতা রাখেন, ঠিক যেমন পৃথিবীতে পুনরুত্থিত একটি বীজ নতুন করে অঙ্কুরিত হতে পারে। ঋতুর চক্রাকার প্রকৃতি পুনরুত্থানের একটি স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে কাজ করে; শীতকালে, পাতা ঝরে পড়ার সাথে সাথে গাছগুলি প্রাণহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে তারা আবার বেড়ে ওঠে। উপরন্তু, সমস্ত জীবের ঘুম-জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের উদাহরণ দেয়, কারণ ঘুম সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে থামিয়ে মৃত্যুর মতো। মহান আল্লাহ, যদি একজন ব্যক্তির আত্মাকে বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করা হয়, তাহলে তাকে তার আত্মায় ফিরিয়ে দেন, এইভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। অধ্যায় 39 আয-যুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

অধিকন্তু, বিচার দিবস একটি অনিবার্য ঘটনা। মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করলে ভারসাম্যের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে একটি আদর্শ দূরত্ব বজায় রাখে; যেকোনো বিচ্যুতি এটিকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে। একইভাবে, জলচক্র নিখুঁত সামঞ্জস্যের সাথে কাজ করে, যা পৃথিবীতে জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার অনুমতি দেয়। মাটি সূক্ষ্ম চারাগুলিকে ধরে রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং ভারী কাঠামোকে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এই উদাহরণগুলি কেবল একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয় না বরং ভারসাম্যের নীতিকেও তুলে ধরে। যাইহোক, মানবজাতির কর্মকাণ্ডে একটি উল্লেখযোগ্য ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান। প্রায়শই দেখা যায় যে নিপীড়ক ব্যক্তিরা পরিণতি এড়ায়, যখন অনেকেই কষ্ট সহ্য করে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার পায় না। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা প্রায়শই পরীক্ষার সম্মুখীন হয় কিন্তু ন্যূনতম প্রতিদান পায়, অন্যদিকে যারা ঐশ্বরিক নির্দেশনাকে অবজ্ঞা করে তারা পার্থিব আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ঠিক যেমন মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনি পুরস্কার এবং শাস্তির ব্যবস্থাও ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। তবে, এই ভারসাম্য বর্তমান পৃথিবীতে স্পষ্ট নয়, ইঙ্গিত দেয় যে এটি পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে বিচারের দিনে প্রকাশিত হবে।

মহান আল্লাহ এই জীবনে পূর্ণ প্রতিদান ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা রাখেন। তবে, এখানে পূর্ণ শাস্তি প্রদান না করার একটি কারণ হল ব্যক্তিদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের কর্ম সংশোধন করার অসংখ্য সুযোগ প্রদান করা।

অধিকন্তু, মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে মুসলমানদের পূর্ণ প্রতিদান দেন না, কারণ এটি জান্নাতের প্রতিনিধিত্ব করে না। উপরন্তু, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস, বিশেষ করে পরকালে মুসলমানদের জন্য অপেক্ষা করা সম্পূর্ণ প্রতিদান, বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রকৃতপক্ষে, অদৃশ্যের উপর এই বিশ্বাসই ঈমানকে আলাদা করে, কারণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পুরষ্কার উপলব্ধি করা, যেমন এই জীবনে পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া, একই তাৎপর্যের অভাব বোধ করবে।

পূর্ণ পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা, পরকালে পূর্ণ পুরস্কার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার সাথে মিলিত হয়ে, ব্যক্তিদের পাপপূর্ণ কর্ম থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ আচরণে লিপ্ত হতে অনুপ্রেরণামূলক কারণ হিসেবে কাজ করে।

প্রতিশোধের দিন শুরু হওয়ার জন্য, এই ভৌত জগতের সমাপ্তি অপরিহার্য। এর কারণ হল, সমস্ত কর্ম বন্ধ হয়ে গেলেই কেবল পুরস্কার এবং শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। ফলস্বরূপ, প্রতিশোধের দিনটি ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটতে পারে না যতক্ষণ না ব্যক্তিদের কর্মগুলি তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, যা ইঙ্গিত দেয় যে বস্তুগত জগত অবশেষে শেষ হয়ে যাবে।

এই আলোচনাটি চিন্তা করলে বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পারে, ব্যক্তিদের পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি বিজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে, যা পরিণামে ইহকাল ও পরকালে শান্তি ও সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২২:

"কারণ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রতিটি প্রাণী তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

এই আচরণটি হল আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে উল্লেখিত ধার্মিকতা। ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, ৫১ আয়াত:

" আর যারা ভয় করে যে তাদের প্রতিপালকের সামনে একত্রিত করা হবে - তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক এবং সুপারিশকারী থাকবে না - তাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে সতর্ক করুন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।"

এছাড়াও, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিচার দিবস সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার ধারণাটিও বাতিল করে দিয়েছেন। এই মিথ্যা বিশ্বাস গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত যে তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় অটল থাকতে পারবে এবং অন্য কেউ তাদেরকে বিচার দিবসে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। এটি ছিল পূর্ববর্তী জাতিগুলির ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলিম একই ধরণের বিশ্বাস গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে তারা বিশ্বাস করে যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদেরকে বিচার দিবসে শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। যদিও সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪৩০৮ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস সহ অসংখ্য ইসলামী শিক্ষায় মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুপারিশ স্বীকৃত, তবুও এটি একটি বাস্তবতা যে কিছু মুসলিম এখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জাহান্নামে এক মুহূর্তও অভিজ্ঞতা অর্জন করা অসহনীয়, তাই এই ধরণের মানসিকতা এড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু, ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনায় লিপ্ত হওয়া নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর

সুপারিশের তাৎপর্যকে ক্ষুণ্ন করে। ফলস্বরূপ, এই মনোভাব তাদের তার সুপারিশ থেকে বঞ্চিত করতে পারে এবং এমনকি তিনি বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৩০:

" আর রাসূল বলেছেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

এই আয়াতটি মুসলিমদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করে কারণ তারাই একমাত্র গোষ্ঠী যারা পবিত্র কুরআন গ্রহণ করেছে, যেখানে অমুসলিমরা এটি গ্রহণ করেনি এবং তাই এটি ত্যাগ করতে পারে না। মহানবী (সাঃ) যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন, বিচারের দিনে তার পরিণতি স্পষ্ট।

অতএব, ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলা এবং এর পরিবর্তে আল্লাহর রহমতের প্রতি আন্তরিক আশা গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ইসলামী নীতিমালা অনুসারে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি বিজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্যের প্রতি অধ্যবসায়ের সাথে আবদ্ধ থাকা। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৫১:

" আর যারা ভয় করে যে তাদের প্রতিপালকের সামনে একত্রিত করা হবে - তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক এবং সুপারিশকারী থাকবে না - তাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে সতর্ক করুন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের শিক্ষা প্রচার করতেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁকে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ধারাবাহিকভাবে ব্যক্তিদের নিজেদের স্বার্থে ইসলাম গ্রহণের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে আশা করেছিলেন যে অমুসলিমদের মধ্যে প্রভাবশালী নেতারা ধর্মান্তরিত হবেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে এর ফলে তাদের অনুসারীরা ইসলাম গ্রহণ করতে আরও আগ্রহী হবে। মক্কার সম্মানিত অমুসলিম নেতারা যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তখন তারা অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি তাঁর কম ধনী সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাদের আলোচনার সময় চলে যেতে বলুন, কারণ তারা নিম্ন স্তরের সাহাবীদের সাথে মেলামেশা করতে পছন্দ করতেন না। এই অনুরোধের আলোকে এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়ে, নিম্নলিখিত আয়াত এবং তাদের মতো অন্যান্য আয়াত নাজিল হয়েছিল: সূরা 6 আল আন'আম, আয়াত 52:

"আর যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদেরকে তাড়িয়ে দিও না। তাদের কোন হিসাব তোমার উপর নেই এবং তাদের উপর তোমার কোন হিসাব নেই। যদি তুমি তাদের তাড়িয়ে দাও, তাহলে তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

ইমাম আল ওয়াহিদীর " আসবাব আল নুযুল" , ৬:৫২, পৃষ্ঠা ৭৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানটি তুলে ধরে যে ইসলাম একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ধর্ম, জোর দিয়ে যে লিঙ্গ, জাতি, সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার মতো পার্থিব পার্থক্যগুলি ব্যক্তিদের বিভক্ত করা উচিত নয়। মুসলমানদের সকলের সাথে শ্রদ্ধা ও সদয় আচরণ করে ইসলামের নীতিগুলি সমুন্নত রাখতে উৎসাহিত করা হয়। যদিও এটা সত্য যে কিছু ব্যক্তি, যেমন পিতামাতা, বিশেষ বিবেচনার যোগ্য হতে পারে, সকলের প্রতি সদয় আচরণ করা অপরিহার্য। একজন প্রকৃত মুমিনকে অবশ্যই অন্যদের এবং তাদের জিনিসপত্রের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, তা মৌখিক বা শারীরিক হোক, যেমন সুনান আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকন্তু, বস্তুগত সম্পদের উপর ভিত্তি করে নিজেকে কখনও অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা উচিত নয়, কারণ এই ধরনের মানসিকতা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত, এবং তাই, অন্যের যা আছে তা নিয়ে গর্ব করার অধিকার কারও নেই। মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়া যায়। অধ্যায় ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এর অর্থ হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রাপ্ত আশীর্বাদগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। যেহেতু উদ্দেশ্য এবং অনেক কাজ প্রায়শই গোপন থাকে, তাই ব্যক্তিদের নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা বা অন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা থেকে বিরত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সূরা ৫৩ আন নাজম, আয়াত ৩২:

"...তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করে।"

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৫২ নং আয়াত:

"আর যারা সকাল-বিকাল তাদের পালনকর্তাকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের তাড়িয়ে দিও না..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি প্রতিটি পরিস্থিতিতে এবং সারা দিন ধরে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। উপরন্তু, এই আয়াতে ব্যক্তির নিয়তের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে অন্যদের কাছ থেকে অনুমোদন চাওয়ার পরিবর্তে তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপর মনোনিবেশ করে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আন্তরিকতা বিকাশ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে, তারা তাঁর কাছ থেকে কোনও প্রতিদান পাবে না, যেমনটি জামে আত তিরমিযিতে লিপিবদ্ধ ৩১৫৪ নম্বর হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৫২ নং আয়াত:

" ... তাদের হিসাব তোমার উপর নেই এবং তোমার হিসাব তাদের উপর নেই.."

অধিকন্তু, এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর লক্ষ্য হলো কেবল মানবজাতির কাছে ইসলামের শিক্ষা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া। তাঁর লক্ষ্য মানুষকে সঠিক নির্দেশনা গ্রহণ এবং তার উপর কাজ করতে বাধ্য করা নয়। সূরা ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ২১-২২:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দাও যে তুমি কেবল একটি স্মরণ করিয়ে দাও। তুমি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নও।"

এটি এই বিষয়টি বোঝার গুরুত্বকে তুলে ধরে যে, একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো অন্যদের উপর তাদের বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া নয়। বরং, তাদের উচিত জ্ঞান এবং ইসলামী শিক্ষা থেকে স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য প্রকাশ করা, যাতে ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব জীবন পছন্দ করতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়েও, জ্ঞান এবং প্রমাণের ভিত্তিতে নির্দেশনা এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা উচিত, ব্যক্তিগত মতামত চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। অতএব, ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একজন মুসলিমের ভূমিকা নয় এবং এর ফলে অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব এবং চাপ তৈরি হতে পারে।

এরপর মহান আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ সহ একটি সর্বজনীন পরীক্ষার ইঙ্গিত দেন। ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ৫২-৫৩:

"আর যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদেরকে তাড়িয়ে দিও না। তাদের কোন হিসাব তোমার উপর নেই এবং তোমার কোন হিসাব তাদের উপর নেই। যদি তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দাও, তাহলে তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এভাবেই আমি তাদের কাউকে কাউকে অন্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছি যে তারা বলে, "আমাদের মধ্যে কি এদেরকেই আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?"..."

সকল মানুষ এবং তাদের প্রদত্ত পার্থিব জিনিসপত্র অন্যদের জন্য পরীক্ষা। যদি কেউ এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয়, তাহলে অন্যদের পর্যবেক্ষণ করা তাদের জন্য পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। উদাহরণস্বরূপ, যারা আন্তরিকভাবে তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে মহান আল্লাহকে মেনে চলেন এবং ফলস্বরূপ, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করেন, তারা তাদের পার্থিব জীবন উপভোগ করেন না বলে মনে হবে, কারণ তারা তাদের আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকেন। ফলস্বরূপ, অজ্ঞ লোকেরা তাদের প্রতি করুণা করবে এবং তাদের সমালোচনা করবে এবং তাদের আচরণ অনুকরণ করা এড়িয়ে চলবে এই ভেবে যে তারা বিপথগামী। একইভাবে, যখন একজন অজ্ঞ ব্যক্তি ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের তাদের সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হতে দেখে, তখন তারা ভুলভাবে ঈর্ষা অনুভব করে এবং কামনা করে যে তারা তাদের মতো জীবনযাপন করুক। অন্যদের পর্যবেক্ষণের পরীক্ষায় একমাত্র সেই ব্যক্তিই উত্তীর্ণ হবে যে এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষা বোঝে। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

" যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

ফলস্বরূপ, তারা অন্য মানুষের জীবনের বাহ্যিক রূপ দেখে প্রতারিত হবে না এবং পরিবর্তে এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণের দিকে মনোনিবেশ করবে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এই পদ্ধতি ব্যক্তিদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে সহায়তা করবে, যা তাদেরকে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় তাদের সম্পর্ক এবং কর্তব্যগুলিকে কার্যকরভাবে অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম করবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতে শান্তি বৃদ্ধি করবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং ফলস্বরূপ, তারা উভয় জগতেই আরও বেশি পুরষ্কার, আশীর্বাদ এবং করুণা পাবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৫৩:

"আর এভাবেই আমি তাদের কাউকে কাউকে অন্য কাউকে দিয়ে পরীক্ষা করেছি যাতে তারা বলে, "আমাদের মধ্যে কি এদেরকেই আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?" আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে ভালো জানেন না?"

এবং অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"... যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের [অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইচ্ছাকৃতভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। কৃতজ্ঞতার মৌখিক প্রকাশ ইতিবাচক কথা বলা অথবা নীরব থাকা বেছে নেওয়া হতে পারে। অধিকন্তু, কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল এমনভাবে দান করা যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা দাবি করেন না, তাই তিনি যে কোনও ভুল ক্ষমা করবেন, যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৫৪:

"আর যখন তারা তোমার কাছে আসে যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে, তখন বলো, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা নিজের উপর রহমত ফরজ করে নিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশত কোন মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

প্রকৃত অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও জটিলতার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ অন্যায় কাজ এড়াতে এবং আল্লাহ তায়ালা এবং অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পুনরুদ্ধার করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু, ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য

রেখে, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তাঁর আনুগত্য করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু যারা কেবল তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করতে চায় তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না, এমনকি তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে না এবং তাদের আচরণ সংশোধন করবে না। ফলস্বরূপ, সঠিক পথপ্রাপ্ত লোকেরা বিপথগামীদের থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে যায়। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৫৫:

"আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।"

অতএব, প্রতিটি ব্যক্তির উচিত তাদের আচরণের উপর চিন্তা করা এবং তারা কোন পথে যাত্রা করছে তা নির্ধারণ করা, এবং প্রয়োজনে তাদের দিক পরিবর্তন করা উচিত, অন্যথায় তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যাবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক এবং শারীরিক সামঞ্জস্যের অভাব অনুভব করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করবে। এর ফলে তারা যে কোনও বস্তুগত আরাম উপভোগ করুক না কেন, ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনেই চাপ এবং অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে সঠিক পথ এবং ভুল পথের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আরও আলোচনা করেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৫৬:

"বলুন, "আমাকে নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ডাকো, তাদের ইবাদত করতে।" বলুন, "আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না, তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হব এবং আমি [সঠিক] পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হব না।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে, যে কোনও পথ যেখানে কেউ আল্লাহকে অমান্য করে, অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো অন্য কিছুর আনুগত্য করে, তা পার্থিব কামনা-বাসনার বিপথগামী পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে প্রতিটি মানব-রচিত আচরণবিধি কেবল মানুষের আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে। অতএব, যদি কেউ জীবনে মানব-রচিত কোনও আচরণবিধি অনুসরণ করে, তবে তারা অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে কারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা সর্বদা পক্ষপাতদুষ্ট এবং জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার অভাব থাকবে। ফলস্বরূপ, তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি পাবে না।

এছাড়াও, এটা স্পষ্ট যে, যারা মিথ্যা দেবতাদের পূজা করে তারা মূলত তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হয়। এই দেবতারা কেবল সেই আকাঙ্ক্ষার শারীরিক প্রতিনিধিত্ব হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি একটি মূর্তিকে পূজা করে সে বোঝে যে জড় বস্তু তাদের কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করতে পারে না; বরং, উপাসক ব্যাখ্যা করে যে মূর্তি তাদের আচরণ কেমন করতে পছন্দ করবে। এই আচরণবিধি কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর নিহিত। ফলস্বরূপ, তাদের আকাঙ্ক্ষার পূজা তাদের ভক্তির ভিত্তি হয়ে ওঠে। যারা প্রভাবশালী এবং ধনী তারা প্রায়শই এই

মানসিকতায় নিজেদেরকে আরও বেশি আবদ্ধ করে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে ইসলামের সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তাদের একটি নির্দিষ্ট নৈতিক কাঠামো মেনে চলতে হবে, যার ফলে তাদের বিপথগামী আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ কমানো হবে। তাই তারা তাদের ক্ষমতা এবং মর্যাদা হারানোর ভয়ে অন্যদের তাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে। ঐতিহাসিকভাবে, এটি তাদেরকে পবিত্র নবীদের, সা., প্রত্যাখ্যান এবং বিরোধিতাকারীদের মধ্যে প্রথম স্থান দিয়েছে। এই ঘটনাটি ধর্ম হিসাবে ইসলামের বৈধতার প্রতিফলন নয়, বরং ব্যক্তিগত প্রবণতা পূরণের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

অন্যদিকে, ইসলামের ভিত্তি হলো স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণ যা সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পাওয়া যায়। যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সবকিছু জানেন, তাই তিনিই জানেন যে, তিনি যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা কীভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে একজন ব্যক্তি মানসিক ও শারীরিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জন করে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থাপন করে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৫৭:

"বল, "নিশ্চয়ই, আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর আছি..."

মহান আল্লাহ তাআলা ব্যক্তিদের ইসলামের নীতিমালা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান, যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পারে। অন্ধ বিশ্বাসের উপর জোর দেওয়ার পরিবর্তে, তিনি চান যে মানুষ স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে এই শিক্ষার সত্যতা বুঝতে পারে। তবে, এর জন্য ইসলামের নীতিগুলি অন্বেষণ করার সময় একটি উন্মুক্ত এবং নিরপেক্ষ মনোভাব প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

কিন্তু যারা তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা অনুসরণ করার উপর জোর দেয় তারা ইসলামী শিক্ষাকে অস্বীকার করবে এবং উপেক্ষা করবে, কারণ এটি তাদের কামনা-বাসনা পূরণে বাধা দেবে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 57:

"বল, "নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর আছি, আর তোমরা তা অস্বীকার করেছ..."

যেহেতু মক্কার অমুসলিম নেতাদের মনোভাব এই ছিল, তাই তারা তাদের সামাজিক প্রভাব এবং নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে অন্যদের ইসলাম গ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করত। তারা তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নাযিল করার দাবি করত এবং যখন তা না হত, তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ হিসেবে এটি ব্যবহার করত। সূরা ৮ আল আনফাল, আয়াত ৩২:

"আর [স্মরণ করো] যখন তারা বলেছিল, "হে আল্লাহ, যদি এটা তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা আমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নামিয়ে আন।"

এবং ৬ষ্ঠ সূরা আল আন'আম, ৫৭ নং আয়াত:

"...আমার কাছে এমন কিছু নেই যার জন্য তুমি অধৈর্য হচ্ছ। সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহর। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।"

যেহেতু আল্লাহ তাআলা মানুষের অবাধ্যতার প্রতি অত্যন্ত সহনশীল, তাই তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে এবং তাদের পথ সংশোধন করতে পারে। এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে, মহান আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত অবকাশ চিরস্থায়ী নয়। তাৎক্ষণিক শাস্তি না পাওয়া মানে এর অস্তিত্বহীনতা, এটি একটি ভুল ধারণা। শাস্তি বিলম্বিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে এটি ঘটবে না। এই ধরনের আচরণ কেবল একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা চালিয়ে যেতে বাধ্য করবে। এর ফলে মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে। ফলস্বরূপ, পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি, যেমন পরিবার, বন্ধুত্ব, ক্যারিয়ার এবং সম্পদ, উদ্বেগের উৎস হয়ে উঠবে। যদি তারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তাহলে তারা অন্যায়ভাবে তাদের চাপের জন্য অন্যদের, যেমন তাদের সঙ্গীদের দায়ী করতে পারে। ইতিবাচক প্রভাব থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে, তারা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, যার ফলে হতাশা, মাদকাসক্তি বা আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা দেখা দিতে পারে। এই ধরণটি তাদের মধ্যে স্পষ্ট যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, এমনকি ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিরাও, তাদের

বাহ্যিক সাফল্য সত্ত্বেও। অতএব, আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অবকাশ শেষ হওয়ার আগে বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ যথাযথভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৫৮:

"বল, "যদি আমার কাছে তা থাকত যার জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি করছো, তাহলে আমার ও তোমাদের মধ্যে ব্যাপারটির মীমাংসা হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে ভালো জানেন।"

যেহেতু এই পৃথিবীতে যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে তাদের অবকাশ আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে দেওয়া হয়, তাই পরবর্তী আয়াতে তাঁর জ্ঞানের কিছু দিক আলোচনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, ৫৯ নং আয়াত:

"আর তাঁর কাছেই অদৃশ্যের চাবিকাঠি রয়েছে; তিনি ছাড়া কেউ এগুলো জানে না..."

মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস গ্রহণ করার জন্য, সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহর জ্ঞান সহজাত, আকারে অসীম এবং এর কোন শুরু বা শেষ নেই। অন্যদিকে, সৃষ্টির জ্ঞান সর্বদা ঐশ্বরিকভাবে প্রদত্ত, আকারে সীমিত এবং এর একটি শুরু এবং শেষ রয়েছে। এর বাইরে যে কোনও আলোচনা এড়ানো উচিত কারণ কেউ অনিবার্যভাবে অর্থহীন বিতর্ক এবং আলোচনায় লিপ্ত হবে কারণ বিচারের দিনে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। পরিবর্তে, একজনকে

ইসলামী বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করতে হবে যা বিচারের দিনে জিজ্ঞাসা করা হবে, যেমন একজনের ব্যবসায়িক লেনদেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৫৯ নং আয়াত:

"আর তাঁর কাছেই অদৃশ্যের চাবিকাঠি রয়েছে; তিনি ছাড়া কেউ এগুলো জানে না। আর তিনি জানেন স্থলে ও সমুদ্রে যা আছে। এমন কোন পাতা পড়ে না যা তিনি জানেন না। আর পৃথিবীর অন্ধকারে এমন কোন শস্য নেই যা আর্দ্র বা শুষ্ক নয় যা স্পষ্ট কিতাবে লিখিত নেই।"

পবিত্র কুরআনের একটি অলৌকিক দিক হলো, এটি জ্ঞানের মতো বিমূর্ত বিষয়গুলো ব্যবহারিকভাবে আলোচনা করে যা সহজেই দৃশ্যমান এবং বোধগম্য। পবিত্র কুরআনের এই দিকটির একটি সুবিধা হলো, এটি একজন মুসলিমকে পবিত্র কুরআন অধ্যয়নরত অবস্থায়ও মহান আল্লাহকে স্মরণ করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এবং মাটিতে পাতা পড়তে দেখছে, তার উচিত এই আয়াতটি মনে রাখা এবং মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞানের প্রশংসা করা, যা তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই অনুস্মারক তাদেরকে সর্বদা তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মকে সংশোধন করতে উৎসাহিত করবে কারণ উভয় জগতেই তাদের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাই পাতা ঝরে পড়ার মতো একটি পার্থিব জিনিস মহান আল্লাহকে আনুগত্য করার একটি শক্তিশালী স্মারক হয়ে ওঠে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৫৯ নং আয়াত:

"আর তাঁর কাছেই অদৃশ্যের চাবিকাঠি রয়েছে; তিনি ছাড়া কেউ এগুলো জানে না। আর তিনি জানেন স্থলে ও সমুদ্রে যা আছে। এমন কোন পাতা পড়ে না যা তিনি জানেন না। আর পৃথিবীর অন্ধকারে এমন কোন শস্য নেই যা আর্দ্র বা শুষ্ক নয় যা স্পষ্ট কিতাবে লিখিত নেই।"

উপরন্তু, যে ব্যক্তি এই আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে এটি কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে নয়। মানুষ একে অপরের সাথে একইভাবে চিন্তা করে এবং যদি কোনও ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের পরিধি নিয়ে আলোচনা করে, তবে তারা এই আয়াতে উল্লিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করবে না, কারণ এই বিষয়গুলি তাদের কাছে ঘটবে না। পরিবর্তে, তারা অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবে, যেমন গণিত, ব্যবসা বা বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের জ্ঞান। এই আয়াতে এমন বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে যা মানুষের জ্ঞানের পরিধি নিয়ে আলোচনা করার সময় মানুষের মনে আসে না তা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে এই আয়াতটি কোনও মানুষের কাছ থেকে নয়।

এরপর, মহান আল্লাহ পরবর্তী আয়াতগুলিতে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জবাবদিহি করার জন্য প্রয়োজনীয় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা একত্রিত করেছেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৬০:

"আর তিনিই সেইজন যিনি রাতের বেলায় তোমাদের প্রাণ হরণ করেন এবং দিনের বেলায় তোমরা যা করছো তা জানেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে সেখানে পুনরুজ্জীবিত করেন যাতে একটি নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়..."

প্রথম প্রয়োজন হলো মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা। ঘুম হলো মৃত্যুর বোন, কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ, তারপর, যদি কোন ব্যক্তির বেঁচে থাকার নিয়ত থাকে, তাহলে তার আত্মাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবারও জীবন দান করেন। সূরা ৩৯ আয-যুমার, আয়াত ৪২:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

বিচার দিবসে কাউকে জবাবদিহি করার জন্য দ্বিতীয় যে শর্তটি প্রয়োজন তা হলো একজন ব্যক্তির নিয়ত, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৬০:

"আর তিনিই সেইজন যিনি রাতের বেলায় তোমাদের প্রাণ হরণ করেন এবং দিনের বেলায় তোমরা যা করে থাকো তা জানেন। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের

প্রত্যাবর্তন; তারপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।"

বিচার দিবসে কাউকে জবাবদিহি করার জন্য পরবর্তী যে শর্তটি প্রয়োজন তা হল তা করার কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা থাকা, যা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৬১:

"আর তিনি তাঁর বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান..."

বিচার দিবসে একজন ব্যক্তির জবাবদিহি করার জন্য পরবর্তী শর্ত হল তাকে এই পৃথিবীতে মৃত্যু ভোগ করতে হবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৬১:

"...এবং তিনি তোমাদের উপর রক্ষক-ফেরেশতা প্রেরণ করেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে, তখন আমাদের ফেরেশতারা তাকে নিয়ে যায় এবং তারা ব্যর্থ হয় না।"

যখন বিচারের দিনে কাউকে জবাবদিহি করার জন্য এই সমস্ত প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ তাআলা পূরণ করবেন, তখন মহান আল্লাহর আনুগত্য করে বিচারের দিনে তাদের

অনিবার্য জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৬২:

"অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। নিঃসন্দেহে, ফয়সালা তাঁরই, এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

একজন ব্যক্তিকে পুনরুত্থিত করার এবং বিচারের দিনে জবাবদিহি করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তার উপর কেবল মহান আল্লাহই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন না, বরং এই পৃথিবীর মানুষের বিষয়গুলির উপরও তাঁর চূড়ান্ত এবং অবিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ষষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ৬৩-৬৪:

"বলুন, "কে তোমাদেরকে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন [যখন] তোমরা তাঁকে ডাকো [জোরে] এবং গোপনে, 'যদি তিনি আমাদের এই [সঙ্কট] থেকে উদ্ধার করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।'" বলুন, "আল্লাহই তোমাদেরকে এ থেকে এবং প্রতিটি বিপদ থেকে উদ্ধার করেন..."

সকল সৃষ্টির উপর তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের সাথে সাথে, মহান আল্লাহর একত্বের একটি স্পষ্ট নিদর্শন হল এমন একটি ঘটনা যা অনেকেই অনুভব করেন, তাদের বিশ্বাস বা অভাব নির্বিশেষে। সত্যিকারের কঠিন সময়ে, যখন তাদের সম্পদ অপর্যাপ্ত হয়, তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই একাধিক দেবতার সাহায্য নেওয়ার পরিবর্তে এক ঈশ্বর, মহান আল্লাহ, এর দিকে ফিরে যায়, কারণ তাদের অভ্যন্তরীণ

প্রবৃত্তি সংকটের সময় এই একক আবেদনের দিকে পরিচালিত করে। এই বাস্তবতা প্রায়শই চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলিতে চিত্রিত করা হয়, যেখানে চরিত্রগুলি, এমনকি যারা কোনও দেবতায় বিশ্বাস করে না তারাও তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে এক ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে দেখে। চলচ্চিত্র নির্মাতারা ধর্মীয় বিষয়গুলিকে ছোট করার চেষ্টা করলেও, এই সত্যটি সিনেমার জগতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

বিপদের সময় এক ঈশ্বর, মহান আল্লাহকে ডাকার এই সহজাত আকাঙ্ক্ষা মানুষের আত্মার গভীরতা থেকে উদ্ভূত হয়, যা একসময় মহান আল্লাহর উপস্থিতিতে বিদ্যমান ছিল এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর তাঁর সার্বভৌমত্ব, ঐক্য এবং সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকে স্বীকার করেছিল। ৭ম সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ১৭২:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের বের করেছিলেন এবং তাদের নিজেদের উপর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে], "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" তারা বলল, "হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি।"..."

এই মুহূর্তগুলিতে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্ববাদকে প্রতিফলিত করে। এই ধরনের সচেতনতা তাদের মধ্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস জাগাতে পারে যারা এখনও বিশ্বাস করেনি, এবং এটি তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত উপায়ে ব্যবহার করে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, কারণ এতে প্রকৃত শান্তি এবং সাফল্য পাওয়া যায়। এই সত্যটি মানুষের আত্মার গভীরে অনুরণিত হয়, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ২২:

"তিনিই তোমাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমণের ক্ষমতা দেন। এমনকি যখন তোমরা জাহাজে থাকো এবং সেগুলোকে নিয়ে ভালো বাতাস বয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তখন ঝড়ো হাওয়া আসে এবং সর্বত্র তরঙ্গ তাদের উপর আছড়ে পড়ে এবং তারা ডুবে যাওয়ার আশা করে, তখন তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর প্রতি তাঁর দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, "যদি তুমি আমাদের এ থেকে রক্ষা করো, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

এবং ৪১ ফুসসিলাত অধ্যায়, ৫৩ নং আয়াত:

"আমরা তাদেরকে দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

কিন্তু যদিও এই বাস্তবতা অধিকাংশ মানুষই অনুভব করে, তবুও যখন মহান আল্লাহ তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন তারা তাঁর অবাধ্য হয়ে ফিরে যায়, ভুলে যায় যে তারা তাদের কষ্টের সময় কীভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিল। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৬৪:

"বলুন, "আল্লাহই তোমাদেরকে তা থেকে এবং প্রতিটি বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তারপরও তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করো।"

এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে যখন তারা মহান আল্লাহকে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে এবং যখন তারা তাদের প্রয়োজনের সময় তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তখন তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। উদ্দেশ্যের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। কথাবার্তায় কৃতজ্ঞতা বলতে হয় ইতিবাচক কথা বলা অথবা নীরবতা বেছে নেওয়া। অধিকন্তু, কর্মে কৃতজ্ঞতার জন্য পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন । এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতে আরও আশীর্বাদ, শান্তি এবং রহমত লাভ করবে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"... যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের [অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

পরবর্তী আয়াতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হবে, সে অনিবার্যভাবে তার প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক ও শারীরিক সামঞ্জস্যের অভাব অনুভব করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে তাদের পার্থিব এবং পরকালীন জীবনে চাপ এবং অসুবিধা দেখা দেবে, তাদের যে কোনও বস্তুগত আরাম-আয়েশ থাকুক না কেন। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৬৫:

" বলুন, "তিনিই তোমাদের উপর উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে বিপদ পাঠাতে সক্ষম, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং তোমাদেরকে একে অপরের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাতে সক্ষম।" দেখো, আমরা কিভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি যাতে তারা বুঝতে পারে।"

যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্য হয়, তখন তার জীবনের সবকিছুর অপব্যবহার করে, যা তাকে দেওয়া হয়েছে, তা তার জন্য চাপ ও অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তার উপরে যারা আছেন, যেমন তাদের নিয়োগকর্তা, সরকার এমনকি তাদের পরিবারের প্রবীণরাও তাদের জন্য চাপ ও অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে কারণ তারা এই জিনিসগুলির প্রতি তাদের আনুগত্যকে ভুলভাবে স্থান দেবে অথবা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের প্রবীণদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য অবলম্বন করে, সে অবশ্যই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে তাদের খুশি করার জন্য। যেহেতু মানুষ চঞ্চল প্রকৃতির, এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত তাদের প্রবীণদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না, এবং তাদের প্রবীণরা তাদের মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যখন একটি সমাজ ব্যাপকভাবে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তখন তাদের নেতারা, রাজনীতিবিদরাও একই কাজ করবে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে জনগণ তাদের জবাবদিহি করবে না, কারণ তারা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত। এর ফলে সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ও অবিচার ছড়িয়ে পড়বে। যারা হলিউডের নির্বাহীদের মতো তাদের নিয়োগকর্তাদের খুশি করার জন্য মহান আল্লাহর অবাধ্য হন, তারা পার্থিব সাফল্যের জন্য অনিবার্যভাবে তাদের মূল্যবোধ, আত্মসম্মান এবং আত্মমর্যাদার সাথে আপস করবেন। এই আচরণ কেবল তখনই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে পরিচালিত করে যখন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের মানসিক শান্তিতে নিয়ে যায়নি। অতএব, যারা মহান আল্লাহর

অবাধ্যতা করে, তারা তাদের উপর থেকে শাস্তি ভোগ করবে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 65:

" বলুন, "তিনিই তোমাদের উপর থেকে বিপদ পাঠাতে সক্ষম..."

যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তাদের নিম্নস্তরের লোকেরাও শাস্তি পাবে, যেমন তাদের সন্তান, কর্মচারী এবং তাদের ব্যবসা। যখন কেউ আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তখন তারা আল্লাহ তাআলা এবং মানুষের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ, তাদের জীবনের মানুষ তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। উদাহরণস্বরূপ, তারা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন করবে না । ফলস্বরূপ, তাদের সন্তানরা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ এবং দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যারা তাদের কর্মচারীদের অধিকার পূরণ করে না তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের নিয়োগকর্তার প্রতি অসততা অবলম্বন করবে এবং ব্যবসাকে সফল করার জন্য তাদের পূর্ণ প্রচেষ্টাও নিবেদন করবে না। এই জিনিসগুলি সর্বদা ব্যবসায়কে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। যারা তাদের ব্যবসায়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তারা হারাম উপার্জন করতে পারে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের অবৈধ সম্পদ দিয়ে যা কিছু করে তা তাদের জন্য চাপ এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ আল্লাহ তাআলা হারাম থেকে উদ্ভূত এমন কিছু গ্রহণ করেন না। অতএব, যারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করবে, তারা তাদের নীচ থেকে শাস্তি ভোগ করবে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৬৫:

" বলুন, "তিনিই তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে কোন বিপদ পাঠাতে সক্ষম..."

যখন মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তখন তারা তাদের সমাজের মানুষের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে সর্বদা দুর্নীতি ও অবিচারের বিস্তার ঘটবে। যখন এই জিনিসগুলি সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সর্বদা অনৈক্য এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকে পরিচালিত করে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৬৫:

" বলুন, "তিনিই তোমাদের উপর উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে কোন বিপদ পাঠাতে সক্ষম, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একে অপরের উপর জুলুমের স্বাদ গ্রহণ করাতে সক্ষম..."

অতএব, আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে, প্রদত্ত নিয়ামতগুলোর অপব্যবহার করলে, তা সর্বদাই সমস্যা, চাপ এবং সকল দিক থেকে সমস্যার সৃষ্টি করে, যা ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমগ্র সমাজ পর্যন্ত মানুষকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত নিয়ামতগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, সে ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার মাধ্যমে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে মানসিক শান্তি অর্জন করবে। উপরন্তু, তারা আল্লাহ তাআলা এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে। এটি সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং শান্তির বিস্তার নিশ্চিত করবে। সূরা 6 আল আন'আম, আয়াত 65:

"...দেখো, আমি কিভাবে নিদর্শনাবলী নানাভাবে বর্ণনা করি যাতে তারা বুঝতে পারে।"

যেহেতু স্পষ্ট প্রমাণ এবং ইসলামী জ্ঞান মানবজাতির কাছে নিখুঁত রোল মডেল সহ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তাই তাদের নিজেদের স্বার্থে ইসলামের স্পষ্ট সত্য অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন অজুহাত নেই। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৬৬:

"কিন্তু তোমার সম্প্রদায় একে অস্বীকার করেছে, যদিও তা সত্য। বলো, "আমি তোমাদের উপর কোন ব্যবস্থাপক নই।"

অতএব, ব্যক্তিদের উচিত তাদের নিজস্ব স্বার্থে ইসলামী নীতিমালা গ্রহণ করা এবং প্রয়োগ করা, এমনকি যদি এই নীতিগুলি তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ মেনে চলেন, স্বীকার করেন যে এটি তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করে, নির্দিষ্ট চিকিৎসা এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাসের অস্বস্তি সত্ত্বেও। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী সর্বোত্তম মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করতে পারেন, তেমনি ইসলামী শিক্ষা অনুসরণকারী যে কেউ পারেন। এর কারণ হল, একমাত্র মহান আল্লাহরই একজন ব্যক্তিকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা রয়েছে, যা তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রকে কার্যকরভাবে অগ্রাধিকার দেয় এবং আল্লাহ, মহিমান্বিত, এবং মানুষের অধিকার পূরণের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রসার ঘটায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৬৬ নং আয়াত:

"কিন্তু তোমার সম্প্রদায় একে অস্বীকার করেছে, যদিও তা সত্য। বলো, "আমি তোমাদের উপর কোন ব্যবস্থাপক নই।"

এটি এই বিষয়টি বোঝার গুরুত্বকে তুলে ধরে যে, একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো অন্যদের উপর তাদের বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া নয়। বরং, তাদের উচিত জ্ঞান এবং ইসলামী শিক্ষা থেকে স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য প্রকাশ করা, ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করা। একইভাবে, ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়গুলিতে, জ্ঞান এবং প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নির্দেশনা এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা উচিত, ব্যক্তিগত মতামত চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। অতএব, ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণমূলক মানসিকতা থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একজন মুসলিমের ভূমিকা নয় এবং এর ফলে অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব এবং চাপ তৈরি হতে পারে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৬৬ নং আয়াত:

"কিন্তু তোমার সম্প্রদায় একে অস্বীকার করেছে, যদিও তা সত্য। বলো, "আমি তোমাদের উপর কোন ব্যবস্থাপক নই।"

ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ তাদেরকে যে অবকাশ দেওয়া হয়েছে তা কেবল ক্ষণস্থায়ী। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৬৭:

"প্রত্যেক ঘটনাই একটি চূড়ান্ত ঘটনা; এবং তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে চলেছে, তাদের এই বিশ্বাসে প্রতারিত হওয়া উচিত নয় যে তাৎক্ষণিক পরিণতির অভাব বা কোনও প্রতিফল দেখতে না পারা মানে তারা সম্পূর্ণরূপে শাস্তি এড়াতে পারবে। তাদের মনোভাব অনিবার্যভাবে তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্যহীন করে তুলবে এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল পথে চালিত করবে। ফলস্বরূপ, তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক, যেমন পরিবার, বন্ধুত্ব, ক্যারিয়ার এবং সম্পদ, তাদের জন্য চাপের উৎস হয়ে উঠবে। যদি তারা আল্লাহর নির্দেশনা উপেক্ষা করতে থাকে, তাহলে তারা ভুলভাবে তাদের নিকটতম ব্যক্তিদের, যেমন তাদের স্ত্রীর উপর তাদের চাপের জন্য দোষারোপ করতে পারে। এই ইতিবাচক প্রভাবগুলি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখলে, তারা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলিকে আরও খারাপ করার ঝুঁকিতে থাকে, যা হতাশা, মাদকাসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাভাবনাও ডেকে আনতে পারে। এই আচরণ প্রায়শই এমন ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায় যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের ক্রমাগত অপব্যবহার করে, যার মধ্যে ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত, বস্তুগত সম্পদের আপাত উপভোগ সত্ত্বেও। উপরন্তু, যখন কেউ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা অনিবার্যভাবে তাঁর অধিকার এবং মানুষের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে সমাজের মধ্যে কেবল অন্যায় ও দুর্নীতির বিস্তার ঘটবে, যা মানুষের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে তুলবে।

যারা ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করে চলে, কারণ এটি তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী, তারা সর্বদাই আল্লাহকে অমান্য করবে এবং যারা তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করে তাদের সমালোচনা করবে। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন ব্যক্তি তার সমবয়সীদের চেয়ে ভিন্ন পথ বেছে নেয়, তখন এটি অন্যদের মধ্যে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অযোগ্যতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে, বিশেষ করে যদি সেই সিদ্ধান্তগুলি মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলার চেয়ে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে জোর দেয়। ফলস্বরূপ, এটি তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার কারণ হতে পারে যারা তাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকে, প্রায়শই পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে।

অধিকন্তু, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন ট্রেন্ড এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মতো সামাজিক প্রভাবগুলি প্রায়শই ইসলামী মূল্যবোধ সমুন্নত রাখে এমন ব্যক্তিদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইসলামকে প্রায়শই আর্থিক সাফল্য এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে বাধা হিসেবে দেখা হয়। ইসলাম যেসব ক্ষেত্রকে সমালোচনা করে, বিশেষ করে মদ এবং বিনোদনের সাথে সম্পর্কিত, তারা সক্রিয়ভাবে ইসলামী নীতির গ্রহণযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং মুসলমানদের তাদের ধর্ম মেনে চলা থেকে বিরত রাখে। এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ইসলামবিরোধী মনোভাবের ব্যাপক প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অধিকন্তু, যারা ইসলামী নীতিমালা মেনে চলার চেষ্টা করে, যা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষায় সংযম এবং প্রদত্ত আশীর্বাদের সঠিক ব্যবহারকে উৎসাহিত করে, তারা প্রায়শই এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সম্মুখীন হয় যারা অতিরিক্ত কাজ করে - সীমাহীনভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করে, কারণ ইসলাম তাদেরকে পশুসুলভ দেখায়। এই ব্যক্তিরা অন্যদের ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে এবং

মুসলমানদের তাদের বিশ্বাস অনুশীলন থেকে নিরুৎসাহিত করতে চেষ্টা করতে পারে, তাদেরকে অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষার জীবনযাত্রায় প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। তারা প্রায়শই ইসলামের নির্দিষ্ট দিকগুলিকে লক্ষ্য করে, যেমন মহিলাদের পোশাক কোড, এর আবেদনকে দুর্বল করে। যাইহোক, সংবেদনশীল ব্যক্তিরা সহজেই এই সমালোচনার উপর ভিত্তি করে চিনতে পারেন, যা ইসলামের আত্ম-শৃঙ্খলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা মেনে নিতে অনিচ্ছা থেকে উদ্ভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা মহিলাদের জন্য ইসলামিক পোশাক কোডের সমালোচনা করতে পারে, তবে তারা আইন প্রয়োগকারী, সামরিক, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং ব্যবসার মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পেশায় পোশাক কোডের ক্ষেত্রে একই স্তরের তদন্ত প্রয়োগ করে না। অন্যান্য পোশাক কোডের উপর তাদের নীরবতার বিপরীতে, ইসলামী পোশাক কোডের এই নির্বাচনী সমালোচনা তাদের যুক্তির দুর্বলতা এবং ভিত্তিহীন প্রকৃতিকে তুলে ধরে। পরিশেষে, ইসলামের নীতিমালা এবং এর অনুসারীদের সুশৃঙ্খল আচরণই ইসলামের উপর এই বিভিন্ন আক্রমণকে উস্কে দেয়, কারণ তারা অন্যদের তাদের বিপথগামী পথে টেনে আনতে চায়।

এই ধরণের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং তাদের অধিকার পূরণের সময় এই ধরণের লোকদের সাথে সঙ্গ এড়িয়ে চলতে হবে, অন্যথায় তারা এই খারাপ সঙ্গীদের দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। সুনান আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৬৮:

"আর যখন তুমি তাদেরকে দেখো যারা আমার আয়াত সম্পর্কে [আপত্তিকর] আলোচনা করে, তখন তাদের থেকে সরে যাও যতক্ষণ না তারা অন্য ধর্মান্তরে লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরেও জালেমদের সাথে থেকো না।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, একজন মুসলিমের কর্তব্য হল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষের অধিকার পূরণ করা, কিন্তু তাদের কর্তব্য হল মানুষের উপর সঠিক নির্দেশনা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নয়। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৬৯:

"আর যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের উপর এর কোন জবাবদিহিতা নেই, বরং [কেবলমাত্র] একটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য - যাতে তারা তাঁকে ভয় করে।"

একজন মুসলিমের উচিত বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা যাতে অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিমরা ইসলামের ব্যাপক উপকারিতা উপলব্ধি করতে পারে। এটি কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা শেখে এবং তার উপর আমল করে যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত, এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে যার ফলে সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তি ছড়িয়ে পড়বে। এছাড়াও, এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে, যেমন উদারতা, ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন অহংকার, হিংসা এবং অকৃতজ্ঞতা এড়াবে। এটি তাদেরকে বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে সহায়তা করবে।

যদিও একজন মুসলিমকে অবশ্যই বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে, তবুও তাদের এমন লোকদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যাদের

একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হলো তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করা। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বর হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে যে, একজন মুসলিম তার বন্ধুদের পথ অনুসরণ করে। এর অর্থ হল, ব্যক্তিরা অজান্তেই তাদের বন্ধুদের বৈশিষ্ট্য, ইতিবাচক বা নেতিবাচক, গ্রহণ করবে। ফলস্বরূপ, একজন মুসলিমের জন্য এমন লোকদের সাহচর্য অর্জন করা অপরিহার্য যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৭০:

"যারা তাদের ধর্মকে খেলা ও তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে, তাদেরকে পরিত্যাগ করো..."

এর মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কখন ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করবে এবং কখন তা উপেক্ষা করবে তা বেছে নেয়। তারা ইসলামকে একটি পোশাকের মতো বিবেচনা করে যা তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে পরে এবং খুলে ফেলে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনার উপাসনা করছে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি তাদেরকে কেবল মহান আল্লাহর অবাধ্য হতে উৎসাহিত করবে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে।

ফলস্বরূপ, তারা নিজেদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যের অভাব অনুভব করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত থাকবে না। এর ফলে তাদের বর্তমান জীবন এবং পরকালীন জীবনে চাপ এবং ঝামেলা দেখা দেবে, তাদের কাছে যে কোনও বস্তুগত সম্পদ থাকুক না কেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ৭০:

"যারা তাদের ধর্মকে খেলা ও তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে, তাদেরকে পরিত্যাগ করো..."

এটি সেইসব মুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যাদের ইসলামী শিক্ষা শেখার এবং তার উপর আমল করার কোন ইচ্ছা নেই এবং তারা বিনোদনের জন্য ইসলামিক বিষয়বস্তু, যেমন অদ্ভুত গল্প, শোনে এবং শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করে নিজেদেরকে বিশ্বাস করার জন্য যে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে, যদিও তাদের ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার কোন ইচ্ছা নেই, যার ফলে তাদের প্রদত্ত নিয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি কেবল তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলির অপব্যবহার চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে এবং তাদের বিশ্বাস করবে যে তারা একজন ভালো এবং বাধ্য মুসলিম।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ৭০:

"যারা তাদের ধর্মকে খেলা ও তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে, তাদেরকে পরিত্যাগ করো..."

এটি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা তাদের ধর্মবিশ্বাসকে বিভক্ত করে যাতে তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু তাদের জীবনের অন্যান্য দিক যেমন তাদের পরিবার, কর্ম, ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের উপর তাদের বিশ্বাসের কোন প্রভাব নেই। ফলস্বরূপ, তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করেই চলে। এইভাবে নিজের বিশ্বাসকে বিভক্ত করা একটি প্রধান কারণ, কারণ অনেক মুসলিম যারা ইবাদতের মৌলিক আশীর্বাদগুলি পূরণ করে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে না কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করেই চলে। ফলস্বরূপ, তারা একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা ভোগ করে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে ফেলে দেয়।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ৭০:

"যারা তাদের ধর্মকে খেলা ও তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে, তাদেরকে পরিত্যাগ করো..."

এটি অজ্ঞ মুসলিমদেরও বোঝায় যারা বিশ্বাস করে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো পার্থিব জিনিস মেনে চলার মধ্যে মনের শান্তি নিহিত এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে চলেছে, একই সাথে তারা বিশ্বাস করে যে তারা আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা। একইভাবে, এই আয়াতে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণা সমর্থন করার প্রয়োজন নেই। পৃথিবী তাদের এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করেছে যে উভয় জগতের মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস যথেষ্ট। ফলস্বরূপ, তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে চলেছে, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা একজন প্রকৃত মুসলিম। বাস্তবে, এই মুসলিম তাদের ঈমান হারানোর বড় ঝুঁকিতে রয়েছে। এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে ঈমান এমন একটি উদ্ভিদের মতো যার উন্নতি ও টিকে থাকার জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে লালন-পালনের প্রয়োজন হয়। ঠিক যেমন সূর্যালোকের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বঞ্চিত একটি উদ্ভিদ ধ্বংস হয়ে যাবে, তেমনি আনুগত্যের মাধ্যমে টিকিয়ে না রাখলে একজন ব্যক্তির ঈমানও ধ্বংস হতে পারে। এটি সবচেয়ে বড় ক্ষতির প্রতিনিধিত্ব করে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ৭০:

"যারা তাদের ধর্মকে খেলা ও তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে, তাদেরকে পরিত্যাগ করো..."

যদিও এই মনোভাব গ্রহণকারী ব্যক্তিদের সাথে সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তারা তাদের আচরণ গ্রহণ করতে পারে, তবুও একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামী

শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং কীভাবে এটি মানসিক প্রশান্তি লাভ করে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনে স্থান দিয়ে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এই অনুস্মারকটি ব্যক্তির চরিত্রের মাধ্যমে দেখানো উচিত, উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে যাতে অন্যরা, যেমন তার আত্মীয়স্বজন, ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের ব্যাপক সুবিধাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 70:

"...কিন্তু এর মাধ্যমে [অর্থাৎ কুরআন] স্মরণ করিয়ে দাও, যাতে কোন আত্মা তার কৃতকর্মের জন্য ধ্বংসের মুখে পতিত না হয়; আল্লাহ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক এবং সুপারিশকারী থাকবে না..."

এই আয়াতে এই ধারণার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) এর মতো একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, তাদের কর্মের ফলাফল থেকে মানুষকে রক্ষা করবেন, তা তাদের কর্ম যাই হোক না কেন। এই ধরণের ধারণা মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা প্রতিফলিত করে না, বরং ইসলামে মূল্যহীন এক ধরণের ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা। ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা হল মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উপেক্ষা করা, একই সাথে ইহকাল ও পরকালে তাঁর রহমত ও ক্ষমার প্রত্যাশা করা। অন্যদিকে, প্রকৃত আশার অর্থ হলো ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে সক্রিয়ভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করা। কেবলমাত্র এই প্রকৃত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ আন্তরিকভাবে এই পৃথিবী এবং পরকালে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের আশা করতে পারে। জামে আত তিরমিযীর ২৪৫৯ নম্বর হাদিসে এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি তুলে ধরা হয়েছে। এই পার্থক্যটি বোঝা এবং মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রতি খাঁটি আশা জাগানো অপরিহার্য, এই কামনা-বাসনার ফাঁদ এড়িয়ে চলা যা ইহকাল বা পরকালে কোন

প্রকৃত সাহায্য করে না। অধিকন্তু, যদিও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুপারিশ প্রকৃতপক্ষে একটি বাস্তবতা, যারা এই বিশ্বাস করে উপহাস করে যে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখলেও মুক্তি পাবে, তারা বিচারের দিনে এই সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। পরিবর্তে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) সেই দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন যে তারা যথাযথ কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকৃত বিশ্বাসকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৩০:

" আর রাসূল বলেছেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

এই আয়াতে মুসলিমদের কথা বলা হয়েছে কারণ তারাই পবিত্র কুরআন গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে অমুসলিমরা যারা তা গ্রহণ করেনি এবং তাই তা ত্যাগ করতে পারে না। এটা স্পষ্ট যে, বিচারের দিনে মুসলিমদের কী হবে, যার বিরুদ্ধে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন। অতএব, কেবল আকাঙ্ক্ষার বাইরে গিয়ে আল্লাহর রহমতের উপর খাঁটি আশা পোষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে, ইসলামী নীতিমালা অনুসারে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ যথাযথভাবে ব্যবহার করে বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর আনুগত্য মেনে চলার মাধ্যমে, বিচারের দিনে মহানবী (সাঃ) এর সুপারিশ কামনা করা।

আল্লাহ তাআলা অন্য ধরণের ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধেও সতর্ক করে দিচ্ছেন, যেখানে কেউ বিশ্বাস করে যে তারা বিচারের দিনে আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে, অথবা তাদের কর্মের পরিণতি এড়াতে কোনও অজুহাত দেখাবে। সূরা ৩০ আর রুম, আয়াত ৫৭:

"অতএব, সেদিন তাদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না যারা অন্যায় করেছে এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

এবং ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, ৭০ নং আয়াত:

"... আর যদি এটি সমস্ত প্রতিদান প্রদান করে, তবুও এটি থেকে তা নেওয়া হবে না। এরাই তারা যারা তাদের উপার্জনের জন্য ধ্বংসের মুখে পতিত হয়..."

এই আয়াতটি তাদের সতর্ক করে শেষ করা হয়েছে যারা তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে কাজে সমর্থন না করে তাদের ঈমানকে রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করে। ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ৭০:

"... তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানি পান করার ব্যবস্থা এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা কুফরী করত।"

এই পৃথিবীতে, ব্যক্তিদের তাদের মৌখিক বিশ্বাসের স্বীকৃতির ভিত্তিতে মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে, পরকালে, প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের প্রকৃত

অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুসারে, যা অন্যদের থেকে গোপন থাকে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মূল্যায়ন করা হবে। ফলস্বরূপ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতা স্বীকার করে, কিন্তু তাদের ঘোষণার সাথে তাদের কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য বজায় রাখে না, তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব থাকতে পারে। ফলস্বরূপ, এই পৃথিবীতে আইনত মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও, বিচারের দিন তাদের অমুসলিম হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

পরবর্তী আয়াতে যেমনটি ইঙ্গিত করা হয়েছে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই পরিণতি এড়াতে আল্লাহর প্রতি তাদের মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে হবে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৭১:

"বলুন, "আমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না এবং আল্লাহ আমাদেরকে পথ দেখানোর পর আমাদের পশ্চাদপসরণে ফিরিয়ে দেওয়া হবে?"..."

ইসলামের মাধ্যমে নির্দেশনা লাভের পর পথভ্রষ্টতা এড়াতে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে এমন জিনিসগুলি মেনে চলা এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে পরিচালিত হবে যাতে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে আল্লাহ, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো অবাধ্যতার অন্যান্য বিষয়গুলি মেনে চলে, সে অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত অনুগ্রহগুলির অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক এবং শারীরিক

সামঞ্জস্যের অভাব অনুভব করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তারা তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হবে না। এর ফলে তারা যে কোনও বস্তুগত আরাম উপভোগ করুক না কেন, এই জীবন এবং পরকালীন জীবনে চাপ এবং অসুবিধা দেখা দেবে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 71:

"...[আমরা তখন] সেই ব্যক্তির মতো হব যাকে শয়তানরা পৃথিবীতে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে প্ররোচিত করেছিল, [যখন তার সঙ্গীরা তাকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে এবং [ডাক দিচ্ছে], 'আমাদের কাছে এসো'।"

যদি কেউ মহান আল্লাহর দাসত্ব অস্বীকার করে, তাহলে তারা অনিবার্যভাবে অন্যান্য জিনিসের, যেমন মানুষ, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং তাদের নিয়োগকর্তাদের, অধীনস্থ হয়ে পড়বে। একাধিক এবং অন্যায্য প্রভুর সাথে কারবার করলে কেবল চাপই বাড়ে, কারণ তাদের অপ্রত্যাশিত প্রকৃতির কারণে তাদের সকলকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। ঠিক যেমন একাধিক মনিবের সাথে একজন কর্মচারী সকলের প্রত্যাশা পূরণ করতে সংগ্রাম করে, তেমনি যারা মহান আল্লাহর দাসত্ব প্রত্যাখ্যান করে, তারা নিজেদেরকে অনেক মনিবের দ্বারা বোঝা মনে করবে, অবশেষে তাদের মানসিক শান্তি হারাবে। সময়ের সাথে সাথে, এই ব্যক্তিরা দুঃখ, একাকীত্ব, হতাশা এবং এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাও অনুভব করবে, কারণ তাদের পার্থিব প্রভুদের খুশি করার প্রচেষ্টা তাদের কাঙ্ক্ষিত পরিপূর্ণতা আনতে ব্যর্থ হয়। এই মৌলিক সত্যটি তাদের শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে সকলের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু যদি কেউ এই পরিণতি এড়াতে চায় এবং এর পরিবর্তে মানসিক শান্তি অর্জন করতে চায়, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থাপন করে, তাহলে তাদের অবশ্যই

সর্বজ্ঞ, মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আচরণবিধি গ্রহণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৭১ নং আয়াত:

"...বলুন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হেদায়াতই একমাত্র হেদায়াত; এবং আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করি।"

অতএব, ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব স্বার্থে ইসলামী নীতিগুলি গ্রহণ এবং প্রয়োগ করা উচিত, এমনকি যখন এই নীতিগুলি তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। তাদের একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ মেনে চলেন, স্বীকার করেন যে এটি তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করে, নির্দিষ্ট চিকিৎসা এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাসের সাথে সম্পর্কিত অস্বস্তি সত্ত্বেও। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী সর্বোত্তম মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা অর্জন করতে পারেন, তেমনি যে কেউ ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ এবং অনুশীলন করেন তারাও একই রকম ফলাফল অর্জন করতে পারেন। এর কারণ হল, একজন ব্যক্তিকে ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ জ্ঞান আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে, যা কার্যকরভাবে তাদের জীবনের সকল দিককে অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু, যেমনটি পরবর্তী আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে, এর জন্য কর্মের মাধ্যমে তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা প্রয়োজন। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 71-72:

"...বলুন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হেদায়েতই একমাত্র হেদায়েত; এবং আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের আনুগত্য করি। এবং সালাত কায়েম করি এবং তাঁকে ভয় করি।"..."

ইসলামে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে কারণ এটি কর্মের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। অতএব, ইসলামের অন্যান্য সমস্ত কাজ ফরজ নামাজের চারপাশে আবর্তিত হয়। ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার অনুশীলনের মধ্যে সময়োপযোগীভাবে পালন সহ এর সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা এবং শিষ্টাচার মেনে চলা জড়িত। পবিত্র কুরআনে এই নামাজ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্যের উপর বারবার জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ এগুলি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শন হিসাবে কাজ করে। অধিকন্তু, সারা দিন ধরে পাঁচটি ফরজ নামাজ, বিচার দিনের ধারাবাহিক স্মারক হিসেবে কাজ করে, যা ব্যক্তিদেরকে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে, ফরজ নামাজের প্রতিটি ধাপ প্রতীকীভাবে বিচার দিনের সাথে যুক্ত। নামাজের সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো প্রতিফলিত করে যে কীভাবে একজন ব্যক্তি সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনে মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করবেন। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 4-6:

"তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

রুকু করার এই কাজটি অসংখ্য ব্যক্তির মর্মস্পর্শী স্মৃতি হিসেবে কাজ করে যারা তাদের পার্থিব অস্তিত্ব জুড়ে মহান আল্লাহকে মান্য না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচনার মুখোমুখি হবেন। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। নামাজের সময় সিজদার কাজটি বিচারের দিনে সকলের জন্য মহান আল্লাহর সামনে সিজদা করার আহ্বানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে, যারা তাদের পার্থিব অস্তিত্ব জুড়ে সঠিকভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, যার অর্থ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আদেশ মেনে চলা, তারা বিচারের দিনে তা করতে অক্ষম হবে। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

নামাজের সময় হাঁটু গেড়ে বসে থাকার ভঙ্গি ধরে নেওয়া, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সামনে তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভয়ে ভীত হয়ে কোন ভঙ্গি গ্রহণ করবে তার মর্মস্পর্শী স্মারক হিসেবে কাজ করে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদের তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যারা নামাজের সময় এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে রাখবেন তারা তাদের নামাজ সঠিকভাবে আদায় করবেন, যার ফলে নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য নিশ্চিত হবে। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এছাড়াও, জামে আত তিরমিযী, ২৬১৮ নম্বরে লিপিবদ্ধ একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, ফরজ নামাজ বিশ্বাস ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য করে। যারা নামাজের দায়িত্ব পালন করে না তাদের ঈমান ছাড়া এই জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈমান এমন একটি গাছের মতো যার যথাযথ যত্নের মাধ্যমে আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। ঠিক যেমন সূর্যের আলোর মতো অপরিহার্য উপাদান থেকে বঞ্চিত একটি উদ্ভিদ অবশেষে শুকিয়ে মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও দুর্বল হতে পারে এবং আনুগত্যমূলক কর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ না করে ধ্বংস হতে পারে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে এই ক্ষতির বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় ৬ আল আন'আম, আয়াত ৭২:

" আর নামায কায়েম করো এবং তাঁকে ভয় করো। আর তাঁরই কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।"

কিয়ামতের দিনে নিজের কর্মের পরিণতি ভোগ করাই এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য এবং তাই তাকে ভয় করা উচিত। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৭৩:

"আর তিনিই সেইজন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টি করেছেন..."

মহাবিশ্ব পরীক্ষা করলে, ভারসাম্যের অসংখ্য উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে একটি আদর্শ দূরত্ব বজায় রাখে, এর বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে; যেকোনো বিচ্যুতি এটিকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলতে পারে। একইভাবে, জলচক্র একটি সুসংগত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, সমুদ্র থেকে জল বাষ্পীভূত হয়, বায়ুমণ্ডলে ঘনীভূত হয় এবং বৃষ্টি হিসাবে ফিরে আসে, ফলে পৃথিবীতে জীবন টিকিয়ে রাখে। মাটিকে সহায়ক, সূক্ষ্ম চারা গজানোর অনুমতি দেয় এবং ভারী কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক করে তোলে। এই উদাহরণগুলি কেবল একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয় না বরং ভারসাম্যের নীতিকেও তুলে ধরে। যাইহোক, মানবজাতির কর্মকাণ্ডে একটি উল্লেখযোগ্য ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান। প্রায়শই দেখা যায় যে নিপীড়ক ব্যক্তিরা পরিণতি এড়ায়, যখন অনেকেই কষ্ট এবং নিপীড়ন সহ্য করে তাদের ধৈর্যের জন্য পর্যাপ্ত স্বীকৃতি পায় না। অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই জীবনে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, তাদের প্রাপ্য পুরস্কারের একটি অংশই পান, অন্যদিকে যারা ঐশ্বরিক নির্দেশনা উপেক্ষা করেন তারা প্রায়শই পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করেন। ঠিক যেমন মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিতে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, তেমনি কর্মের জন্য পুরস্কার এবং শাস্তিও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। এই পৃথিবীতে এই ভারসাম্যহীনতা ইঙ্গিত দেয় যে প্রকৃত ন্যায়বিচার পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়িত হবে, বিশেষ করে বিচারের দিনে।

প্রতিফল দিবস শুরু হওয়ার জন্য, বস্তুজগতের অবসান অবশ্যই হতে হবে। এটি অপরিহার্য কারণ শাস্তি এবং পুরস্কারের ধারণাগুলি কেবলমাত্র সমস্ত কর্ম বন্ধ হয়ে গেলেই পরিচালিত হতে পারে। ফলস্বরূপ, প্রতিফল দিবসটি মানুষের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘটতে পারে না, যা ইঙ্গিত দেয় যে বস্তুজগত অবশেষে তার পরিণতিতে পৌঁছে যাবে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 73:

"... আর যেদিন তিনি বলবেন, "হও", আর তা হয়ে যাবে, তাঁর কথাই সত্য। আর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন তাঁরই রাজত্ব..."

যেহেতু মহান আল্লাহ সকল মানুষের নিয়ত, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে অবগত, তাই বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতা অনিবার্য। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৭৩:

"...[তিনি] অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিষয়ের জ্ঞানী; এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৭৩ নং আয়াত:

"আর তিনিই আসমান ও জমিনকে সত্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন। আর যেদিন তিনি বলবেন, "হও", তখনই তা হয়ে যাবে, তাঁর কথাই সত্য। আর যেদিন শিংগায় ফুঁ দেওয়া

হবে, সেদিন তাঁরই রাজত্ব। [তিনি] অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু জানেন; এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"

পরিশেষে, যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও শাসনাধীন, তাই ব্যক্তিরা তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য। যেমন একটি জাতির সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন অনুসরণ না করার কারণে কেউ অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে, তেমনি স্রষ্টার নির্দেশাবলী অবহেলা করলে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যদিও একজন ব্যক্তি যদি তার দেশীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলতে অসম্মত হন তবে তিনি দেশ ত্যাগ করতে পারেন, তবুও মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই। যদিও সামাজিক নিয়ম-কানুন পরিবর্তনশীল হতে পারে, তবুও মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ঐশ্বরিক আইন অপরিবর্তনীয় থাকে। অধিকন্তু, একজন গৃহকর্তা যেমন বাহ্যিক মতামত নির্বিশেষে তাদের বাসস্থানের নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনি মহান আল্লাহ মহাবিশ্ব পরিচালনা করেন এবং মানুষের অনুমোদন নির্বিশেষে এর আইন নির্ধারণ করেন। সুতরাং, নিজের স্বার্থে এই ঐশ্বরিক নিয়ম-কানুন মেনে চলা অপরিহার্য। যারা এই সত্যটি উপলব্ধি করবে তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুসারে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের আশীর্বাদগুলি কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। ব্যক্তিদের কাছে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনে লুকিয়ে থাকা জ্ঞান বোঝার বিকল্প রয়েছে , তারা নিজেদের এবং সমাজের জন্য এর উপকারিতা স্বীকার করবে, যা শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে এবং ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে বেছে নিতে পারে। তবে, যারা ইসলামী নীতি অনুসরণ করতে অবহেলা করে তাদের উভয় জগতেই তাদের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, কারণ কোনও পরিমাণ আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগই তাদের পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমি জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা ত্রাণ প্রার্থনা করে, তবে তাদের ত্রাণ ঘোলা তেলের মতো জল দিয়ে ত্রাণ করা হবে, যা [তাদের] মুখ পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট, আর বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

৬ষ্ঠ অধ্যায় – আল আন'আম, আয়াত ৭৪ -৯৪

۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّيٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ
فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾

وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ
﴿٧٥﴾

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ
ٱلْءَافِلِينَ ﴿٧٦﴾

فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي
لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٧٧﴾

فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَٰقَوْمِ
إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا۠
مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾

وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ ۚ قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ
بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْـًٔا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾

وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ
يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
﴿٨١﴾

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ
﴿٨٢﴾

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ
رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾

وَإِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٦﴾

وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَٰهُمْ وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
﴿٨٧﴾

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا
كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا
بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٠﴾

وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ
ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا
وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۚ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى
خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ
حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَن
قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ
وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ
﴿٩٣﴾

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ
ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد
تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

আজরকে বলেছিলেন , "তুমি কি মূর্তিগুলোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো? আমি তোমাকে এবং তোমার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।"

আর এভাবেই আমি ইব্রাহিমকে আসমান ও যমীনের রাজ্য দেখিয়েছিলাম যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অতঃপর যখন রাত তাকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলল, তখন সে একটি তারা দেখতে পেল। সে বলল, "এটি আমার প্রভু?" কিন্তু যখন রাত অস্ত গেল, তখন সে বলল, "আমি অস্ত যাওয়াদের পছন্দ করি না।"

অতঃপর যখন তিনি চাঁদকে উদিত হতে দেখলেন, বললেন, "এটি আমার প্রতিপালক?" কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, তখন বললেন, "যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তাহলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

অতঃপর যখন তিনি সূর্যকে উদিত হতে দেখলেন, তখন বললেন, "এটি আমার প্রতিপালক? এটিই বৃহত্তর।" কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, তখন বললেন, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করো, আমি তাদের থেকে মুক্ত।"

নিঃসন্দেহে, আমি সত্যের দিকে একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরিয়েছি তাঁর দিকে যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

আর তার সম্প্রদায় তার সাথে তর্ক করল। সে বলল, “তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে তর্ক করছো, অথচ তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন? আর তোমরা

যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক করো, আমি তাদের ভয় করি না [এবং তাদের কোন ক্ষতি হবে না], যদি না আমার প্রতিপালক কিছু ইচ্ছা করেন। আমার প্রতিপালক সবকিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টিত করে আছেন, তবুও কি তোমরা চিন্তা করবে না?

আর তোমরা যাদের শরীক করো, তাদেরকে আমি কীভাবে ভয় করব, অথচ তোমরা এই ভয় করো না যে তোমরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক করেছো যার জন্য তিনি তোমাদের উপর কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? তাহলে দুই দলের মধ্যে কে নিরাপত্তার বেশি অধিকারী, যদি তোমরা জানো?

যারা ঈমান আনে এবং তাদের ঈমানকে অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।

আর এটাই ছিল আমাদের [চূড়ান্ত যুক্তি] যা আমি ইব্রাহিমকে তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দিয়েছিলাম। আমরা যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী।

আর আমরা তাকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুব। সকলকেই আমি পথ দেখিয়েছি। আর নূহকে পথ দেখিয়েছি পূর্বে এবং তার বংশধরদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

আর যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা ও ইলিয়াস - আর সকলেই ছিলেন সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।

আর ইসমাঈল, ইলীশায়, ইউনুস ও লূতকে - আর সকলকেই আমি বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

এবং তাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে, তাদের বংশধরদের মধ্যে এবং তাদের ভাইদের মধ্যেও - এবং আমরা তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেছি।

এটা আল্লাহর পথনির্দেশনা, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু যদি তারা আল্লাহর সাথে শিরক করত, তাহলে তাদের সকল কর্মই তাদের জন্য নিষ্ফল হত।

এরাই তারা যাদেরকে আমি কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত দান করেছি, কিন্তু যদি তারা [কাফেররা] তা অস্বীকার করে, তবে আমি তা এমন এক সম্প্রদায়ের হাতে অর্পণ করেছি যারা তা অস্বীকারকারী নয়।

এরাই [পবিত্র নবীগণ, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক] যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন, অতএব তাদের পথপ্রদর্শন থেকে তোমরা উদাহরণ গ্রহণ করো। বলো, "আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য একটি উপদেশ মাত্র।"

আর যখন তারা বলে, "আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই অবতীর্ণ করেননি", তখন তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করেনি। বলো, "মুসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিলেন, তা কে নাযিল করেছে, যা মানুষের জন্য আলো এবং পথনির্দেশনা হিসেবে? তোমরা [ইহুদীরা] পাতায় পাতায় লিখে রাখো, কিছু প্রকাশ করো এবং অনেক গোপন করো। আর তোমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যা তোমরা জানতে না, না তোমাদের পূর্বপুরুষরা।" বলো, "আল্লাহ।" তারপর তাদেরকে তাদের [অর্থাৎ] আলোচনায় রত থাকতে দাও, যেন তারা নিজেদেরকে মজা করতে পারে।

আর এটি এমন একটি কিতাব যা আমরা নাযিল করেছি, বরকতময় এবং পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, যাতে তুমি মক্কা ও তার আশেপাশের লোকদের সতর্ক করতে পারো। যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা এতে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাযের হিফাযত করে।

আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে অথবা বলে, "আমার উপর ওহী করা হয়েছে', অথচ তার উপর কোন ওহী করা হয়নি, এবং যে বলে, "আমিও আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মতো কিছু নাযিল করব।" আর যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন জালেমরা মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণায় ভোগে, আর ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে বলছে, "তোমাদের আত্মা বের করে দাও! আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে কারণ তোমরা আল্লাহর উপর সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলছো এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর প্রতি অহংকার করেছো।"

“[তাদের বলা হবে], “আর তোমরা অবশ্যই আমাদের কাছে একাকী এসেছো যেমন আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, এবং তোমরা যা কিছু দিয়েছিলাম তা তোমাদের পিছনে ফেলে এসেছো। আর তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদেরও আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যাদেরকে তোমরা নিজেদের মধ্যে [আল্লাহর] অংশীদার বলে দাবী করতে। তোমাদের মধ্যে [সবকিছু] বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা দাবি করতে তা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে।”

ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করে উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনের গুরুত্ব আলোচনা করার পর, মহান আল্লাহ ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতির উপর জোর দেন। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৭৪:

" আর যখন ইব্রাহিম তার পিতা আযরকে বললেন, "তুমি কি মূর্তিগুলোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো? আমি তোমাকে এবং তোমার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।"

পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কথা আলোচনা করা হয়েছে কারণ তিনি মক্কার অমুসলিম এবং মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাব উভয়েরই পূর্বপুরুষ। উভয়েই তাঁর উত্তরাধিকারকে ধরে রাখার দাবি করেছিলেন, যদিও তারা উভয়েই মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা চালিয়ে গিয়েছিলেন, নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বিপরীতে, যার প্রতিটি নিঃশ্বাস ছিল মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিহিত, এমনকি যদি এর অর্থ তিনি তাঁর পরিবার এবং জনগণের বিরোধিতা করতেন। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৭৪:

" আর যখন ইব্রাহিম তার পিতা আযরকে বললেন, "তুমি কি মূর্তিগুলোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো? আমি তোমাকে এবং তোমার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।"

তারা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে ছিল কারণ সত্য হল যে মিথ্যা দেবতাদের প্রতিটি উপাসক কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার পূজা করছে। তাদের দেবতারা সেই ইচ্ছার শারীরিক প্রতিনিধিত্ব করে যা তারা পূজা করে। এটি স্পষ্ট কারণ যে ব্যক্তি কোনও দেবতার পূজা করে, তা সে বাস্তব, যেমন মূর্তি, অথবা অদৃশ্য, যেমন ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি, সে বোঝে যে জড় দেবতা তাদের জীবনযাপনের নির্দেশ দিতে পারে না; পরিবর্তে, উপাসকরা নিজেরাই নির্ধারণ করে যে তারা বিশ্বাস করে যে তাদের প্রাণহীন দেবতা তাদের আচরণ কীভাবে চাইবে। এই ব্যক্তিগত আচরণবিধি কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে। ফলস্বরূপ, এই আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাদের উপাসনার ভিত্তি। ধনী এবং প্রভাবশালীরা এই মানসিকতায় আরও বেশি দৃঢ়, কারণ তারা বুঝতে পারে যে ইসলামের সত্যকে গ্রহণ করলে তারা একটি নির্দিষ্ট নৈতিক কাঠামো মেনে চলতে বাধ্য হবে যা তাদের বিপথগামী আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করতে বাধা দেবে। এইভাবে তারা তাদের প্রভাব এবং ক্ষমতা হারানোর ভয়ে অন্যদের তাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে। এই কারণেই ইতিহাস দেখায় যে তারা প্রায়শই পবিত্র নবীদের প্রত্যাখ্যান এবং বিরোধিতা করেছিল, শাস্তি তাদের উপর। এই মনোভাব স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম সঠিক না ভুল ধর্ম তা নিয়ে নয়; এটি কেবল তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা পূরণের বিষয়ে।

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলেন যখন তিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৭৫:

" আর এভাবেই আমি ইব্রাহিমকে আসমান ও যমীনের রাজ্য দেখিয়েছিলাম যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।"

আসমান ও জমিনের এই প্রতিফলন পরবর্তী আয়াতগুলিতে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সময়ের মানুষ এবং সম্প্রসারিতভাবে, ভবিষ্যতের মানুষ, মহান আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর আনুগত্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর জাতির ভ্রান্ত বিশ্বাসকে খণ্ডন করার জন্য একটি ব্যঙ্গাত্মক সুর গ্রহণ করেছিলেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৭৫:

" অতঃপর যখন রাত তাকে [অন্ধকারে] ঢেকে ফেলল, তখন সে একটি তারা দেখতে পেল। সে বলল, "এটি আমার প্রভু?" কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, তখন সে বলল, "আমি অদৃশ্যদের পছন্দ করি না।"

যে কোনও বস্তু, যেমন স্বর্গীয় নক্ষত্র, একটি নির্দিষ্ট ধরণ এবং পথ অনুসরণ করে, উপাসনার যোগ্য হতে পারে না কারণ তারা অন্য কারও, অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাবের অধীনে। কোনও দেবতা অন্য কোনও কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, বরং এটি অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৭৭:

" আর যখন সে চাঁদকে উদিত হতে দেখল, তখন বলল, "এটা আমার প্রভু?" কিন্তু যখন তা অস্ত গেল..."

ঠিক যেমন স্বর্গীয় নক্ষত্র এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণী তাদের স্রষ্টা, মহান আল্লাহর নির্দেশনার অধীনে, তেমনি উভয় জগতে মানসিক শান্তির পথ বোঝার জন্য মানুষেরও নির্দেশনার প্রয়োজন। ষষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ৭৭-৭৮:

"আর যখন সে চাঁদকে উদিত হতে দেখল, তখন বলল, "এটা আমার রব?" কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, তখন বলল, "যদি আমার রব আমাকে পথ না দেখান, তাহলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।" আর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল, তখন বলল, "এটা আমার রব? এটা বৃহত্তর।" কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, তখন বলল, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করো, আমি তাদের থেকে মুক্ত।"

যখন কেউ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করবে, তখন তারা প্রশান্তি ও শান্তি দেখতে পাবে। এই কারণেই মানুষ আকাশের প্রশান্তি পর্যবেক্ষণ করে আরাম ও প্রশান্তি খুঁজে পাবে। মহাবিশ্বকে শান্ত ও প্রশান্ত মনে হওয়ার প্রধান কারণ হল, মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টি সেই পথ অনুসরণ করছে যা মহান আল্লাহ তার জন্য বেছে নিয়েছেন। যদি প্রতিটি সৃষ্টি, যেমন সূর্য বা চাঁদ, নিজস্ব পথ বেছে নেয়, তাহলে তা মহাবিশ্বের জন্য বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, মহাবিশ্বের মধ্যে যে প্রশান্তি ও প্রশান্তি দেখা যায় তা প্রতিটি সৃষ্টির দ্বারা মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত পথ অনুসরণ করার প্রত্যক্ষ ফলাফল। একইভাবে, মানুষ যেহেতু সৃষ্টির অংশ, তাই যখন তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথ অনুসরণ করে বাকি সৃষ্টির পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তখন তারাও মানসিক শান্তি ও সান্ত্বনা পাবে। এই পথে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি সুসংগত মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে যথাযথভাবে স্থান দেবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত

থাকবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতেই প্রশান্তি বয়ে আনবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৭৯:

"নিশ্চয়ই, আমি সত্যের দিকে ঝুঁকে আমার মুখ তাঁর দিকে ফিরিয়েছি, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, এবং আমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

অন্যদিকে, যারা সৃষ্টির অন্যান্য সকলের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত পথের পরিবর্তে জীবনের অন্য পথ বেছে নেয়, তারা বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে, ঠিক যেমন সূর্যের মতো মহাবিশ্বের মধ্যে সৃষ্টি যদি আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত পথের পরিবর্তে অন্য কোন পথ গ্রহণ করে তবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা নিজেদেরকে একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার মধ্যে দেখতে পাবে, তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে না। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং কষ্টের সৃষ্টি হবে, এমনকি তারা কিছু বস্তুগত আরাম-আয়েশ ভোগ করলেও।

অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত নিজের স্বার্থের জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা, এমনকি যদি তা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হয়। তাদের উচিত একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা যিনি তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ অনুসরণ করেন, বুঝতে পারেন যে এটি তার সর্বোত্তম স্বার্থে, এমনকি যখন অপ্রীতিকর ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাসের মুখোমুখি হন। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী

শিক্ষা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা একজন ব্যক্তিকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে অবস্থানে রাখতে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার বোধগম্যতা এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট হবে না, ব্যাপক গবেষণা সত্ত্বেও, কারণ এটি একজন ব্যক্তির জীবনে সম্মুখীন হওয়া প্রতিটি চ্যালেঞ্জের সমাধান করতে পারে না। তাদের নির্দেশনা সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ প্রতিরোধ করতে পারে না, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং অন্তর্নিহিত পক্ষপাতের সীমাবদ্ধতার কারণে এটি তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেকের সঠিক অবস্থান নিশ্চিত করতে পারে না। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতিকে যে ব্যাপক জ্ঞান দান করেছেন, তা কেবল মহান আল্লাহ তাআলারই আছে। এই বাস্তবতা তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রাপ্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। যদিও অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বৈজ্ঞানিক নীতিগুলি বুঝতে পারে না এবং এইভাবে তাদের ডাক্তার, মহান আল্লাহ তাআলার উপর অন্ধ বিশ্বাস রাখে, তবুও তিনি ব্যক্তিদের ইসলামের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করেন যাতে তারা তাদের জীবনে এর উপকারী প্রভাবগুলি বুঝতে পারে। তিনি মানুষকে অন্ধভাবে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেন না; বরং তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে এর সত্যতা স্বীকার করুক। তবে, এর জন্য একজন ব্যক্তিকে নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন নিয়ে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের একমাত্র শাসক, মনের শান্তির আবাসস্থল, তাই তিনিই একমাত্র নির্ধারণ করেন কে তা গ্রহণ করবে এবং কে করবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবলমাত্র তাদেরই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৭৯:

" নিশ্চয়ই, আমি আমার মুখ তাঁর দিকে ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন..."

মহান আল্লাহর মুখোমুখি হওয়ার অর্থ হলো, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সকল সময়ে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য করা। অতএব, মহান আল্লাহর আনুগত্য করা শারীরিক ইবাদতের বাইরেও বিস্তৃত। ইসলামকে এমন একটি পোশাকের মতো বিবেচনা করা উচিত নয় যা তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে পরিধান করে এবং খুলে ফেলে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপাসনা করছে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। ২৫তম অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৭৯ নং আয়াত:

" নিশ্চয়ই, আমি সত্যের দিকে ঝুঁকে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন..."

সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়া হল এই সত্যটি গ্রহণ করা এবং তার উপর কাজ করা যে, কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই মানসিক শান্তি পাওয়া সম্ভব, কারণ তিনিই জানেন কিভাবে উভয় জগতে এটি অর্জন করা যেতে পারে।

এছাড়াও, মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার মধ্যে কিছু মেনে চলা, যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। এই জিনিসগুলি একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় থাকবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং সংগ্রামের সৃষ্টি হবে, যদিও তারা যেকোনো বস্তুগত আরাম উপভোগ করতে পারে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৭৯:

" নিশ্চয়ই, আমি সত্যের দিকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছি যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

অধিকন্তু, পরবর্তী আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যখন একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীদের চেয়ে ভিন্ন জীবনযাত্রা বেছে নেয়, তখন এটি অন্যদের মধ্যে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অযোগ্যতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে, বিশেষ করে যদি সেই সিদ্ধান্তগুলি মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর আস্থা রাখার চেয়ে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেয়। ফলস্বরূপ, এটি তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে প্রায়শই তাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকা ব্যক্তিদের সমালোচনার দিকে পরিচালিত করতে পারে। ষষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ৮০:

"এবং তার সম্প্রদায় তার সাথে তর্ক করেছিল..."

অধিকন্তু, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন ট্রেন্ড এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মতো সামাজিক কারণগুলি প্রায়শই ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইসলামের পক্ষে প্রচারণা প্রায়শই তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলাম যেসব শিল্পের সমালোচনা করে, বিশেষ করে মদ এবং বিনোদনের সাথে সম্পর্কিত, তারা ইসলামী নীতির গ্রহণযোগ্যতাকে দুর্বল করার এবং মুসলমানদের তাদের ধর্ম অনুসরণ করতে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ইসলামবিরোধী মনোভাবের ব্যাপক প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

অধিকন্তু, যখন ব্যক্তিরা ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করার চেষ্টা করে, যা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষায় সংযম এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের সঠিক ব্যবহারের পক্ষে কথা বলে, তখন যারা অতিরিক্ত জীবন বেছে নেয় - তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ না করে - তারা প্রায়শই ইসলাম এবং এর অনুশীলনকারীদের নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে কারণ এটি তাদের পশুসুলভ দেখায়। ফলস্বরূপ, তারা অন্যদের ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে এবং মুসলমানদের তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করতে নিরুৎসাহিত করে, তাদের অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষার জীবনযাত্রায় প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। তারা প্রায়শই ইসলামের বিশেষ উপাদানগুলির উপর মনোযোগ দেয়, যেমন মহিলাদের পোশাক কোড, এর আকর্ষণ হ্রাস করার জন্য। তবুও, যারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তারা সহজেই তাদের সমালোচনার ভাসাভাসাতা দেখতে পান, যা ইসলামের আত্ম-শৃঙ্খলার উপর জোর দেওয়ার প্রতি ঘৃণা থেকে উদ্ভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা মহিলাদের জন্য ইসলামী পোশাক কোডের সমালোচনা করতে পারে, তারা আইন প্রয়োগকারী, সামরিক, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং ব্যবসার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রের অন্যান্য প্রয়োজনীয় পোশাক কোডের ক্ষেত্রে একই রকম তদন্ত প্রসারিত করে না। অন্যান্য পোশাক কোড সম্পর্কে তাদের নীরবতার বিপরীতে, ইসলামী পোশাক কোডের এই নির্বাচনী সমালোচনা, তাদের যুক্তির ভঙ্গুরতা এবং ভিত্তিহীনতা তুলে ধরে। পরিশেষে, ইসলামের নীতিমালা এবং এর অনুসারীদের সুশৃঙ্খল আচরণই তাদেরকে অন্যদের তাদের বিপথগামী জীবনযাত্রার দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য ইসলামের উপর বিভিন্ন আক্রমণ চালাতে প্ররোচিত করে।

কিন্তু এই ধরণের ক্ষেত্রে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। তাদের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে মানুষকে খুশি করলে কখনোই মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে না, কারণ মানুষ আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। উপরন্তু, মানুষ যেহেতু চঞ্চল প্রকৃতির, তাই যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা

কখনোই তাদেরকে খুশি করতে পারবে না। তাই শেষ পর্যন্ত, তারা মহান আল্লাহকে খুশি করতে পারবে না, না মানুষকে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার লক্ষ্য রাখে সে অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্যহীনতা অনুভব করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য অপর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে। এর ফলে উভয় দিক থেকেই চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং কষ্টের সৃষ্টি হবে, তাদের কাছে যে কোনও বস্তুগত আরাম থাকুক না কেন। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 80-81:

"...সে বলল, "তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করছো, অথচ তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন? আর তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক করো, আমি তাদের ভয় করি না [এবং তাদের কোন ক্ষতি হবে না], যদি না আমার প্রভু কিছু চান। আমার প্রভু জ্ঞানে সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করেন; তাহলে কি তোমরা স্মরণ করবে না?" আর তোমরা যাকে শরীক করো, আমি তাদের কীভাবে ভয় করব, অথচ তোমরা ভয় করো না যে তোমরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক করেছো যার জন্য তিনি তোমাদের উপর কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? তাহলে দুই দলের মধ্যে কোনটি নিরাপত্তার বেশি অধিকারী, যদি তোমরা জানতে?"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে, কিন্তু মানুষকে অসন্তুষ্ট করে, সে আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, সে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মনের এবং শরীরের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জন করবে, তাদের জীবনের সকল দিক সঠিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে

প্রস্তুত হবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সূরা 6 আল আন'আম, আয়াত 82:

"যারা ঈমান আনে এবং তাদের ঈমানকে অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত।"

যেহেতু ইসলামের শিক্ষা সহজ এবং স্পষ্ট জ্ঞান ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তৈরি, তাই কাউকেই এগুলো উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান করার অজুহাত দেওয়া হয় না। ষষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ৮৩:

"আর এটাই ছিল আমাদের [চূড়ান্ত] যুক্তি যা আমরা ইব্রাহিমকে তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দিয়েছিলাম..."

যে ব্যক্তি এই বাস্তবতা গ্রহণ করে, সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করবে, এমনকি যদি ইসলামী শিক্ষা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। মনের ও শরীরের শান্তি অর্জনের জন্য নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা একটি ক্ষুদ্র ত্যাগ, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য তাদের খাদ্যাভ্যাস পরিচালনা করে। বিপরীতে, যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা যতই পূরণ করুক না কেন, তাদের জন্য জীবন এক অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয়। ধনী এবং বিখ্যাতদের জীবন দেখলে এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 83:

"... আমরা যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী।"

অতএব, উভয় জগতে উচ্চ মর্যাদা অর্জনের সাথে আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সম্পর্ক রয়েছে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অতএব, উচ্চ মর্যাদা পার্থিব সাফল্য বা অন্যান্য পার্থিব বিষয়, যেমন লিঙ্গ, জাতিগততা বা অন্য কিছুর সাথে সম্পর্কিত নয়। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"হে মানবজাতি, আমরা তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

উপরন্তু, এটা বোঝা অপরিহার্য যে যেহেতু একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য অন্যদের থেকে গোপন থাকে, তাই ব্যক্তিরা কেবল বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে অন্যদেরকে উত্তম হিসেবে বিচার করতে পারে না। অতএব, তাদের নিজেদের বা অন্যদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ কেবলমাত্র মহান আল্লাহই প্রতিটি ব্যক্তির উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজ জানেন। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৩২:

"...তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করে।"

মহান নবী ইব্রাহিম (আঃ) যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, যেমন তাঁর পথভ্রষ্ট লোকদের চ্যালেঞ্জ করা, ধৈর্যের সাথে তাদের নির্যাতন মোকাবেলা করা এবং তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া, তখনই আল্লাহ তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। মরিয়ম অধ্যায় ১৯, আয়াত ৪৯:

"অতঃপর যখন সে তাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের তারা উপাসনা করত তাদের ছেড়ে চলে গেল, তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করলাম এবং প্রত্যেককে নবী করলাম।"

এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৮৪ নং আয়াত:

"আর আমরা ইব্রাহিমকে দান করেছি, ইসহাককে এবং ইয়াকুবকে..."

এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে, একজন ব্যক্তি যেমন ডাক্তার হওয়ার মতো পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে না, তেমনি প্রচেষ্টা ও ত্যাগ ছাড়া উভয় জগতেই

মানসিক শান্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম ভুল করে ভাবেন যে, ইসলামে বিশ্বাস ঘোষণা করাই তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট, যার ফলে তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের নিজেদের প্রচেষ্টা বা ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। ইসলাম একটি সরল ও ব্যাপক দর্শন উপস্থাপন করে: ব্যক্তিরা তাদের প্রচেষ্টার ভিত্তিতে উভয় জগতেই কল্যাণ লাভ করবে। যদি একজন মুসলিম ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা না করে, তাহলে তাদের মহান আল্লাহর কাছ থেকে খুব বেশি আশা করা উচিত নয়। সূরা ৫৩ আন নাজম, আয়াত ৩৯:

"এবং কোন ব্যক্তির জন্য কেবল সেই [কল্যাণ] ই থাকে যার জন্য সে চেষ্টা করে।"

এমনকি নবীগণও, তাদের উপর বর্ষিত হোক, কেবলমাত্র তখনই সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করেছিলেন যখন তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করেছিলেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৮৪-৮৬:

"আর আমি ইব্রাহিমকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুব। সকলকেই আমি পথ দেখিয়েছি। আর নূহকে আমরা পূর্বে পথ দেখিয়েছি; আর তার বংশধরদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুন। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর জাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা ও ইলিয়াস - এবং সকলেই ছিলেন সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আর ইসমাঈল, ইলীশায়, ইউনুস ও লূত - আর সকলকেই আমি বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

প্রকৃতপক্ষে, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, বাকি মানবজাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণে। সূরা ৪৯, আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"হে মানবজাতি, আমরা তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষ যারা এই সত্যটি বুঝতে পেরেছিলেন, তারা পবিত্র নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে। ফলস্বরূপ, তারা উভয় জগতেই মানসিক প্রশান্তির দিকে পরিচালিত হয়েছিল, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার মাধ্যমে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৮৭:

"এবং তাদের পিতৃপুরুষদের, বংশধরদের এবং তাদের ভাইদের থেকে - এবং আমরা তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেছি।"

অতএব, যে ব্যক্তি উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত হতে চায়, তাকে অবশ্যই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৮৮:

"এটা আল্লাহর হেদায়েত, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ দেখান..."

কিন্তু যদি কেউ সঠিক নির্দেশনা উপেক্ষা করে এবং প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তাহলে তার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে, সে তার জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধা দেখা দেবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। ফলস্বরূপ, পার্থিব সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে কারণ এটি তাদের মানসিক শান্তিতে নিয়ে যায়নি এবং তাই তারা উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৮৮:

"...কিন্তু যদি তারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করত, তাহলে তাদের কর্মকাণ্ড তাদের জন্য বৃথা হত।"

এবং অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ১০৩-১০৪:

"বলুন, "আমরা কি তোমাদেরকে কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা] তারা যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

এরপর আল্লাহ তাআলা মক্কার অমুসলিমদের এবং মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, নবীগণ, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, সর্বদা একই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৮৯:

"তারা তো তারাই যাদেরকে আমি কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুওত দান করেছি..."

বইটি হয়তো আইনের দিকে ইঙ্গিত করছে, যা আচরণবিধি হিসেবে কাজ করে যা ব্যক্তিদের তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য মেনে চলতে হবে। এই আনুগত্য নিশ্চিত করবে যে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করবে এবং মহান আল্লাহর, সেইসাথে অন্যান্য ব্যক্তির অধিকার পূরণ করবে। ফলস্বরূপ, এই আইন সমাজের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। প্রজ্ঞা অপরিহার্য, কারণ এটি ব্যক্তিদের তাদের জ্ঞান, আইন সহ, কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার নির্দেশ দেয়, যাতে এটি তাদের এবং এই পৃথিবী এবং পরকালে অন্যদের উভয়ের জন্যই উপকারী হয়। একটি ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার জন্য, আইন এবং প্রজ্ঞা উভয়ই অপরিহার্য। প্রজ্ঞা ছাড়া, আইনের সহজেই ভুল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা ব্যক্তিদের অন্যদের ক্ষতি করার জন্য ফাঁকগুলি কাজে লাগাতে দেয়। বিপরীতে, আইনবিহীন প্রজ্ঞা ব্যক্তিদের সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত

সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত বোধগম্যতার উপর ভিত্তি করে একটি ব্যক্তিগত আচরণবিধি গ্রহণ করতে পরিচালিত করতে পারে। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতার ঘাটতি এবং ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পক্ষপাতের উপস্থিতির কারণে মানব-সৃষ্ট সমস্ত আচরণবিধি অবশেষে মানসিক শান্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হবে। সুতরাং, আইন ছাড়া জ্ঞান মানসিক শান্তি অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করবে এবং সমাজের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচারের প্রচারকে বাধাগ্রস্ত করবে, কারণ ব্যক্তিরা অন্যদের অধিকার সঠিকভাবে সমুন্নত রাখতে অবহেলা করবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৮৯ নং আয়াত:

"তারা তো তারাই যাদেরকে আমি কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুওত দান করেছি..."

তাই মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) একই বার্তা প্রদান করছেন এবং এই পৃথিবীতে নবীর মিশনের সমাপ্তি। মক্কার অমুসলিম এবং আহলে কিতাব উভয়ই এই সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিল কিন্তু ইসলামকে অস্বীকার করেছিল কারণ এটি তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং ইসলামের আগমনের সাথে সাথে তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে।

মক্কার অমুসলিমরা আরবি ভাষায় দক্ষ হওয়ায় বুঝতে পেরেছিল যে পবিত্র কুরআন কোন সৃষ্ট সত্তার সৃষ্টি নয়। অধিকন্তু, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবুওয়াত ঘোষণার

আগে চল্লিশ বছর তাঁর সাথে কাটিয়ে তারা বুঝতে পেরেছিল যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১৬:

"...কারণ আমি এর আগে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারবে না?"

পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থের অপরিবর্তিত ও নির্ভুল শিক্ষাকে সমর্থন করে এবং পরিবর্তিত শিক্ষাগুলিকে সংশোধন করে, এই সত্য সত্ত্বেও আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা ইসলামকে অস্বীকার করেছিলেন। যেহেতু মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলির সাথে জড়িত ছিলেন না - যা আহলে কিতাব এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ের দ্বারাই স্বীকৃত, তাই তিনি এই ঐশী গ্রন্থগুলির সম্পাদিত বা অসম্পাদিত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত থাকতে পারেন না, যা পবিত্র কুরআনের ঐশী উৎসের অতিরিক্ত প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৮:

"আর তুমি এর আগে কোন কিতাব পাঠ করোনি এবং তোমার ডান হাতে কোন কিতাব লিখে রাখোনি। তাহলে [অর্থাৎ, অন্যথায়] মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কারণ হত।"

আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে পণ্ডিতরা ইসলামের প্রকৃতত্ব স্বীকার করেছিলেন, কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহ, এর সাথে পরিচিত ছিলেন। তারা পবিত্র নবী

মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআনকেও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কারণ উভয়েরই তাদের পবিত্র লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

আহলে কিতাবগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ঈর্ষান্বিত বোধ করতেন, কারণ তিনি তাঁর ভাই হযরত ইসহাকের বংশধর ছিলেন না, বরং হযরত ইসমাঈল (সাঃ) এর বংশধর ছিলেন। তাদের পুরো ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল বংশের গুরুত্বের উপর কেন্দ্রীভূত, যা তাদের মনে হয়েছিল অন্যদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। ফলস্বরূপ, তারা একজন ভিন্ন বংশ থেকে আসা নবী (সাঃ) কে গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে সংগ্রাম করতেন, কারণ এটি তাদের তৈরি শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতাকে চ্যালেঞ্জ করবে।

ফলস্বরূপ, মক্কার অমুসলিম এবং মদীনার আহলে কিতাবদের অনেক পণ্ডিত উভয়ই ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু তাদের অস্বীকার কেবল তাদের ক্ষতি করেছিল, কারণ এমন মানুষ সর্বদা থাকবে যারা সত্যকে চিনবে এবং গ্রহণ করবে এই জেনে যে এটি তাদের উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 89:

"...কিন্তু যদি কাফেররা তা অস্বীকার করে, তাহলে আমরা এটি এমন এক সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ করেছি যারা এতে কাফের নয়।"

আল্লাহ তাআলা কারো উপর সঠিক নির্দেশনা চাপিয়ে দেন না; বরং তিনি ভুল পথ থেকে সঠিক পথকে আলাদা করে দেন, যার ফলে ব্যক্তিরা যদি চান তাহলে ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই শান্তি খুঁজে পেতে পারেন। যারা এই অপরিহার্য সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হন তারা অহংকারে ভুগতে পারেন, ভুল করে ভাবেন যে তারা ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি অনুগ্রহ করছেন। এই অহংকার আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত আনুগত্যকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, বিশেষ করে যখন তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা তাঁর আদেশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে। বিপরীতে, যারা বোঝে যে তাদের ঈমান এবং আনুগত্য চূড়ান্তভাবে তাদের নিজেদের উপকারে আসে তারা আল্লাহর সামনে বিনয় লালন করবে এবং পরীক্ষা এবং স্বস্তি উভয় সময়েই তাদের আনুগত্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। কঠিন মুহূর্তে, তারা ধৈর্য প্রদর্শন করবে এবং স্বস্তির সময়ে, তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। উদ্দেশ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা বোঝায়, অন্যদিকে কথার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভালো কথা বা নীরবতার মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। অধিকন্তু, কর্মের প্রতি কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা অনুসারে প্রাপ্ত আশীর্বাদগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা বোঝায়। ধৈর্যের অর্থ হলো কথা ও কাজে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকা, একই সাথে সর্বদা মহান আল্লাহর

আনুগত্য করা, এই বিশ্বাসে যে তিনি সর্বদা তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা নির্বাচন করেন, এমনকি তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট না হলেও। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

ফলস্বরূপ, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে এই সঠিক আচরণ অনুসারে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে অবিচল সমর্থন এবং রহমত লাভ করবে। এটি ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনেই প্রশান্তি নিয়ে আসে, যেমনটি সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ সহ একটি সাধারণ শিক্ষা দেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯০:

" এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন, অতএব তাদের পথপ্রদর্শন থেকে তোমরা আদর্শ গ্রহণ করো..."

মহান আল্লাহ তাআলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের আচরণ থেকে সঠিক নির্দেশনা লাভের নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণভাবে, এটি ব্যক্তিদের আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এড়াতে উৎসাহিত করে, যেখানে তারা কেবল তাদের নিজস্ব জীবন এবং বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করে। যারা এই ধরণের মানসিকতা গ্রহণ করে তারা বৃহত্তর ইতিহাস এবং তাদের ব্যক্তিগত ভ্রমণ, সেইসাথে তাদের চারপাশের পরিস্থিতি উভয় থেকে মূল্যবান শিক্ষা হারায়। এই উপাদানগুলি থেকে বোধগম্যতা অর্জন করা হল নিজের আচরণ উন্নত করার এবং অতীতের ভুলগুলি পুনরাবৃত্তি করা এড়াতে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি, যা শেষ পর্যন্ত মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ধনী এবং বিখ্যাতদের তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ অপচয় করতে দেখা, কেবল চাপ, মানসিক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ, আসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা দ্বারা জর্জরিত হওয়া - সুখ এবং বিলাসিতা সত্ত্বেও - একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে কাজ করে। এটি দর্শকদের তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়, এই ধারণাটিকে আরও দৃঢ় করে যে প্রকৃত মানসিক শান্তি বস্তুগত সম্পদ এবং প্রতিটি ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে অর্জিত হয় না। একইভাবে, অসুস্থ কাউকে দেখার মাধ্যমে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি উপলব্ধি জাগানো উচিত এবং তা কেড়ে নেওয়ার আগে এর যথাযথ ব্যবহারকে উৎসাহিত করা উচিত। অতএব, ইসলাম মুসলমানদের সর্বদা সচেতন এবং পর্যবেক্ষণশীল থাকার জন্য উৎসাহিত করে, নিজেদের জীবনে এতটাই মগ্ন না হয়ে যে তারা তাদের চারপাশের জগৎকে অবহেলা করে। ৪৭ সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ১০:

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?"...

মানুষকে উপদেশ এবং সঠিক নির্দেশনা গ্রহণে বাধাগ্রস্ত করার অন্যতম প্রধান কারণ হল তা অর্জনের জন্য যে অর্থ প্রদান করতে হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে

বলেছেন যে ইসলামী শিক্ষা এবং নির্দেশনা উভয় জগতে মানসিক শান্তি পেতে ইচ্ছুকদের জন্য একটি উপহার। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯০:

"... বলুন, "আমি এই বার্তার জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। এটি কেবল বিশ্ববাসীর জন্য একটি স্মারক।"

এটি তাঁর সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর আন্তরিকতাকে তুলে ধরে। ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ বা ইসলাম লাভবান হন না। এই সুবিধা কেবল মানুষই লাভ করে। এই স্তরের আন্তরিকতা এই পৃথিবীতে অন্য কোনও আচরণবিধিতে পাওয়া যাবে না এবং তাই এটি ইসলামের সত্যতা প্রমাণের আরেকটি প্রমাণ।

কিন্তু যারা তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের সুবিধা দেখতে ব্যর্থ হয়, তারা ইসলামী শিক্ষাকে অস্বীকার করার জন্য অনেক চেষ্টা করবে, যদিও এর মানুষের প্রতি আন্তরিকতা এবং এটি গ্রহণ ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে যে ব্যাপক উপকারিতা পাওয়া যায়। অধ্যায় ষষ্ঠ আল আন'আম, আয়াত ৯১:

"আর তারা যখন বলে, "আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই অবতীর্ণ করেননি", তখন তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করেনি।"...

মক্কার অমুসলিমদের জন্য অথবা মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবের জন্য, কারোর জন্যই এটা বোকামিপূর্ণ ছিল না যে পবিত্র কুরআন একজন মানুষের লেখা। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মক্কার অমুসলিমরা, আরবি ভাষার বিশেষজ্ঞ হওয়ায়, বুঝতে পেরেছিল যে পবিত্র কুরআন একজন সাধারণ মানুষের কথা হতে পারে না। অধিকন্তু, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবুওয়াত ঘোষণার আগে চল্লিশ বছর তাঁর সাথে কাটিয়েছিলেন, তারা ভালভাবেই জানতেন যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১৬:

"...কারণ আমি এর আগে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারবে না?"

আহলে কিতাব এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ই জানত যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলির সাথে জড়িত ছিলেন না, যার ফলে তাঁর পক্ষে পবিত্র কুরআন আবিষ্কার করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৪৮:

"আর তুমি এর আগে কোন কিতাব পাঠ করোনি এবং তোমার ডান হাতে কোন কিতাব লিখে রাখোনি। তাহলে [অর্থাৎ, অন্যথায়] মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কারণ হত।"

আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা ইসলামের সত্যতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন, তাদের পবিত্র গ্রন্থে পাওয়া তাঁর বাণীর সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে, মহান

আল্লাহকে পবিত্র কুরআনের লেখক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অধিকন্তু, তাদের ঐশী গ্রন্থে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এবং পবিত্র কুরআন উভয়েরই উল্লেখ ছিল। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

এবং ৬ষ্ঠ সূরা আল আন'আম, ৯১ নং আয়াত:

"আর তারা যখন বলে, "আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই অবতীর্ণ করেননি", তখন তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করেনি। বলো, "মুসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিলেন, তা কে অবতীর্ণ করেছে, মানুষের জন্য আলো এবং পথনির্দেশনা হিসেবে? তোমরা [ইহুদীরা] পাতায় পাতায় ভাগ করে দাও, কিছু প্রকাশ করো এবং অনেক গোপন করো..."

যদিও পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলি মানুষের জন্য আলোর উৎস ছিল যা তাদেরকে সঠিক পথের মধ্যে পার্থক্য করতে সাহায্য করেছিল, যা তাদেরকে জীবনের ভুল পথ থেকে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করেছিল, সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসের লোভে, আহলে কিতাবদের অনেক পণ্ডিত ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশী জ্ঞানের ভুল ব্যাখ্যা, সম্পাদনা এবং গোপন করেছিলেন। দুঃখের বিষয় হল, এমনকি কিছু মুসলিম পণ্ডিত, যারা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের চেয়ে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারাকে অগ্রাধিকার দেন, তারাও একই আচরণ প্রদর্শন করেন। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী শিক্ষাকে বিকৃত করেন এবং তাদের অজ্ঞ অনুসারীদের মধ্যে ভয় জাগিয়ে তোলেন, তাদেরকে অন্যান্য চিন্তাধারার পণ্ডিতদের কথা শুনতে বা অনুসরণ করতে নিরুৎসাহিত করেন। এটি তাদের অনুসারীদের ধরে রাখার একটি প্রচেষ্টা, যারা তাদের অতিরিক্ত সম্মান, প্রশংসা এবং উপহার প্রদান করে। মুসলমানদের অন্যদের চিন্তাহীন অনুকরণ এড়িয়ে চলা উচিত; তাদের ইসলামী নীতিগুলি বোঝার এবং প্রয়োগ করার চেষ্টা করা উচিত। এই ধরনের নিষ্ঠা তাদেরকে পবিত্র কুরআনের খাঁটি শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য মেনে চলতে সাহায্য করবে, অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করার পরিবর্তে। ইসলাম অবিবেচক অনুকরণের অনুশীলনের তীব্র নিন্দা করে, জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে এবং ইসলামী শিক্ষার চিন্তাশীল প্রয়োগের পক্ষে পরামর্শ দেয়। অধিকন্তু, যে পণ্ডিতের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো অনুসারী সংগ্রহ করা এবং তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা, যেমন প্রশংসা এবং উপহার, পূরণ করা, তিনি আবিষ্কার করবেন যে তাদের অর্জিত বস্তুগত লাভ ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনেই চাপ এবং অসুখের দিকে পরিচালিত করবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব থেকে, বিশেষ করে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের উপর, মানসিক শান্তির আবাসস্থল থেকে, এড়াতে পারবেন না। ৫৩ তম অধ্যায় আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

অধিকন্তু, এই ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক ও শারীরিকভাবে অস্থির হয়ে পড়বে, তাদের সম্পর্ক এবং দায়িত্বে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে, যা তাদেরকে বিচারের দিনে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে অপ্রস্তুত রাখবে। এর ফলে উভয় জগতেই উদ্বেগ, চ্যালেঞ্জ এবং কষ্টের সৃষ্টি হবে, তাদের যতই বস্তুগত আরাম থাকুক না কেন। উপরন্তু, সুনান ইবনে মাজাহের ২৫৩ নম্বর হাদিসে এই পণ্ডিতদের জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ঐশী শিক্ষায় প্রাপ্ত জ্ঞান আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন উৎস থেকে সরাসরি অর্জন করা যায় না, যেমন বিজ্ঞানের মতো জ্ঞানের অন্যান্য শাখা, যা পরোক্ষভাবে গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে অর্জন করা যেতে পারে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯১:

"... বলুন, "মুসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিলেন তা কে নাজিল করেছিলেন, যা মানুষের জন্য আলো এবং পথনির্দেশনা হিসেবে ছিল? তোমরা [ইহুদীরা] পাতায় পাতায় লিখে রাখো, কিছু প্রকাশ করো এবং অনেক গোপন করো। আর তোমাদের এমন কিছু শেখানো হয়েছিল যা তোমরা জানতে না, না তোমাদের পূর্বপুরুষরা।"..."

সাধারণভাবে, মুসলমানদের জন্য এটা স্বীকার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের পার্থিব জ্ঞান, যতই বিস্তৃত হোক না কেন, তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য অপর্যাপ্ত। ইসলামী শিক্ষা অনুসারে উপকারী পার্থিব জ্ঞান অর্জন প্রশংসনীয়, কারণ এটি নিজের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য বৈধ জীবিকা

নিশ্চিত করার জন্য একটি মূল্যবান উপায় হিসেবে কাজ করে, তবে এটি তাদের এই পৃথিবীতে তাদের ধর্মীয় যাত্রার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করে না। উদাহরণস্বরূপ, পার্থিব জ্ঞান প্রায়শই ব্যক্তিদেরকে চ্যালেঞ্জ বা পরীক্ষাগুলিকে এমনভাবে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয় যা মহান আল্লাহকে খুশি করে, যার ফলে ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনেই পুরষ্কার অর্জন করা যায়। যে মুসলিম কেবল পার্থিব জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, সে মহান নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং ঐতিহ্য পালন করতে পারে না। বাস্তবে, ধর্মীয় জ্ঞান উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে, অন্যদিকে পার্থিব জ্ঞান কেবল এই জীবনেই সহায়তা প্রদান করে। যাদের ধর্মীয় জ্ঞান আছে তারা আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করতে পারে। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য নিশ্চিত করবে, এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে। বিপরীতে, পার্থিব জ্ঞান ব্যক্তিদের সঠিক পথপ্রাপ্তদের, বিশেষ করে ধার্মিক পূর্বসূরীদের শিক্ষা অনুসরণ করার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় পথ তৈরি করতে উৎসাহিত করতে পারে। ধর্ম নিজের পথ আবিষ্কার করার বিষয়ে নয়; এটি মূলত ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করার বিষয়ে।

দুঃখের বিষয় হল, পার্থিব জ্ঞানসম্পন্ন অসংখ্য মুসলিম এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি বুঝতে ব্যর্থ হন, যা উভয় জগতে তাদের সাফল্যের সুযোগকে হ্রাস করে। ফলস্বরূপ, উভয় জগতে সাফল্য পেতে চাইলে মুসলমানদের ধর্মীয় এবং ব্যবহারিক উভয় জাগতিক জ্ঞান অর্জন এবং প্রয়োগ করা উচিত। এটি সুনান ইবনে মাজাহ, ২২৪ নম্বরের একটি হাদিসে বর্ণিত সকল মুসলমানের জন্য উপকারী জ্ঞান অর্জনের বাধ্যবাধকতাকে তুলে ধরে। কিন্তু যারা ঐশ্বরিক জ্ঞানের মূল্য এবং এটি কীভাবে উভয় জগতে মানুষকে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটতে থাকবেন। অধ্যায় ৬ আল আন'আম, আয়াত ৯১:

"... বলো, "আল্লাহ [এটি প্রকাশ করেছেন]।" তারপর তাদেরকে তাদের বিভ্রান্তিতে, নিজেদেরকে মজা করতে ছেড়ে দাও।"

তাদের মনোভাবের ফলে, এই ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা নিজেদেরকে একটি অস্থির মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার মধ্যে দেখতে পাবে, যার ফলে তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় ফেলে দেবে, শেষ পর্যন্ত বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং কষ্টের সৃষ্টি হবে, এমনকি তারা কিছু বস্তুগত আরাম-আয়েশ ভোগ করলেও।

কিন্তু যারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পেতে চান, তারা ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক উপকারিতা উপলব্ধি করবেন এবং ফলস্বরূপ, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করবেন। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯২:

"আর এটি এমন একটি কিতাব যা আমি নাযিল করেছি, বরকতময় এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবগুলির সত্যায়নকারী..."

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী ঐশী ধর্মগ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত সঠিক শিক্ষাগুলিকে নিশ্চিত করে এবং ইতিহাস জুড়ে মানুষ দ্বারা পরিবর্তিত

শিক্ষাগুলিকে সংশোধন করে। পূর্ববর্তী ঐশী ধর্মগ্রন্থগুলিতে করা পরিবর্তনগুলি প্রায়শই ক্ষমতা এবং সম্পদের মতো বস্তুগত লাভের জন্য পণ্ডিতদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী এই ধর্মগ্রন্থগুলির বিপরীতে, পবিত্র কুরআন যেকোনো পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত, কারণ মহান আল্লাহ এটি সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এর অলৌকিক প্রকৃতির আরেকটি ইঙ্গিত হিসেবে কাজ করে। অধ্যায় ১৫ আল হিজর, আয়াত ৯:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ, কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই, আমরাই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

যদিও এটি পরিবর্তন করা যায় না, তবুও ক্ষমতা এবং সম্পদের মতো পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য এর ভুল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আহলে কিতাবদের আলেমদের অনুকরণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এই পথ উভয় জগতেই কেবল অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়। এইভাবে অর্জিত পার্থিব লাভ শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই চাপ, কষ্ট এবং দুঃখ নিয়ে আসবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে লিপিবদ্ধ একটি হাদিসে এই ধরণের ব্যক্তিদের জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। অধিকন্তু, এই ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বিকৃত করে অন্যদের বিপথগামী করার ফলে, তাদের ভুল ব্যাখ্যার অনুসারীদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তাদের পাপ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। জামে আত তিরমিযীর ২৬৭৪ নম্বরে একটি হাদিসে এই সতর্কীকরণ পাওয়া যায়।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কর্তব্য ছিল চূড়ান্ত বাণী প্রচার করা এবং মানুষকে তাঁর নিজস্ব আদর্শ

অনুকরণের জন্য রেখে যাওয়া। তাঁর কর্তব্য ছিল মানুষের উপর সঠিক নির্দেশনা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নয়। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯২:

" আর এটি এমন একটি কিতাব যা আমি নাযিল করেছি, বরকতময় এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, যাতে আপনি জনপদের মাতৃভূমি এবং তার আশেপাশের লোকদের সতর্ক করতে পারেন..."

এবং ৮৮তম অধ্যায় আল গাশিয়াহ, আয়াত ২১-২২:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দাও যে তুমি কেবল একটি স্মরণ করিয়ে দাও। তুমি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নও।"

সাধারণভাবে, এটি এই বিষয়টি বোঝার গুরুত্বকে তুলে ধরে যে একজন মুসলিমের কর্তব্য হল তাদের বিশ্বাস বা মতামত অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়। বরং, তাদের উচিত ইসলামী শিক্ষায় বিদ্যমান জ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য প্রকাশ করা, যা ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করে। একইভাবে, ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়গুলিতে, জ্ঞান এবং প্রমাণের উপর ভিত্তি করে পরামর্শ এবং ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত, অন্যদের উপর তাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। অতএব, ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় পরিস্থিতিতেই নিয়ন্ত্রণমূলক মানসিকতা থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একজন মুসলিমের কাজ নয় এবং এর ফলে অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব এবং চাপ তৈরি হতে পারে।

এরপর মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন যে, যারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার ভয় করে, কেবল তারাই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তার উপর আমল করবে, কারণ এটাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে তারা তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯২:

"... যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা এতে বিশ্বাস করে..."

এই সত্য থেকে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি তাদের বিশ্বাস কতটা দৃঢ় তা বিচার করা যায়। কারও বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, তারা তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তত বেশি ইসলামী শিক্ষা শিখবে এবং তার উপর আমল করবে। বিচারের দিনে তাদের বিশ্বাস যত দুর্বল হবে, তারা তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুতি নিতে আগ্রহী না হওয়ায় ইসলামী শিক্ষা তত কম শিখবে এবং তার উপর আমল করবে। অতএব, বিচারের দিনে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে তারা ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করে এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত হয়।

মহাবিশ্ব অসংখ্য নিদর্শনে পরিপূর্ণ যা বিচার দিবসের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বৃষ্টি ব্যবহার করে একটি প্রাণহীন, অনুর্বর ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটি মৃত বীজকে জীবিত করেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন, যেমনটি মাটিতে পুনরুত্থিত একটি মৃত বীজের সাথে তুলনা করা

হয়েছে, ঠিক যেমন বীজ জীবিত হয়। ঋতুর পরিবর্তন পুনরুত্থানের একটি স্পষ্ট উদাহরণ। উদাহরণস্বরূপ, শীতকালে, গাছের পাতা শুকিয়ে যায় এবং পড়ে যায়, যার ফলে গাছটি প্রাণহীন বলে মনে হয়। তবে, অন্যান্য ঋতুতে, পাতাগুলি পুনরায় উদিত হয় এবং গাছ আবার প্রাণে সজীব হয়ে ওঠে। উপরন্তু, সমস্ত জীবের ঘুম-জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ হিসেবে কাজ করে। ঘুম মৃত্যুর অনুরূপ, কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মাকে পুনরুদ্ধার করেন যদি সেগুলি বেঁচে থাকার জন্য হয়, এইভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। অধ্যায় 39 আয-যুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

অধিকন্তু, বিচার দিবস এমন একটি ঘটনা যা ঘটতে নির্ধারিত। মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করলে ভারসাম্যের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে একটি আদর্শ এবং সুষম দূরত্ব বজায় রাখে। যদি এটি আরও সামান্য কাছাকাছি বা দূরে থাকত, তবে এটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ত। একইভাবে, জলচক্র, যার মধ্যে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবন এবং তারপরে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ যাতে পৃথিবীতে জীবন বিকাশ লাভ করতে পারে। ভূমি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে সূক্ষ্ম শাখা এবং বীজের অঙ্কুর ভেঙে যায়, জীবিকা নির্বাহের জন্য ফসল সরবরাহ করে, একই সাথে এটি তার উপর নির্মিত ভারী কাঠামোকে সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা কেবল একজন স্রষ্টার দিকেই ইঙ্গিত করে না বরং ভারসাম্যের ধারণার দিকেও ইঙ্গিত করে। যাইহোক, এই পৃথিবীর

একটি উল্লেখযোগ্য দিক স্পষ্টতই ভারসাম্যহীন: মানবতার কর্মকাণ্ড। এই জীবনে পরিণতি এড়াতে নিপীড়ক এবং অত্যাচারী ব্যক্তিদের দেখা সাধারণ। বিপরীতে, অসংখ্য ব্যক্তি নিপীড়ন ভোগ করে এবং তাদের ধৈর্যের জন্য তাদের প্রাপ্য পুরস্কার না পেয়ে বিভিন্ন কষ্টের সম্মুখীন হয়। অনেক মুসলিম যারা বিশ্বস্তভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, তারা প্রায়শই এই পৃথিবীতে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং তাদের প্রতিদানের খুব সামান্য অংশই পায়, অন্যদিকে যারা প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা পার্থিব বিলাসিতায় লিপ্ত হয়। ঠিক যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনি কর্মের জন্য পুরস্কার এবং শাস্তিও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিত। তবুও, এই পৃথিবীতে এটি স্পষ্টতই প্রযোজ্য নয়, যে কারণে এটি অন্য সময়ে, বিশেষ করে বিচারের দিনে ঘটতে হবে।

মহান আল্লাহ, এই জীবনে সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত এবং শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা রাখেন। তবে, এই পৃথিবীতে তিনি সম্পূর্ণরূপে শাস্তি না দেওয়ার একটি কারণ হল ব্যক্তিদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের কর্ম সংশোধন করার অসংখ্য সুযোগ প্রদান করা। তিনি এখানে মুসলমানদের তাদের পূর্ণ পুরষ্কার প্রদান থেকে বিরত থাকেন কারণ এই জীবন জান্নাত নয়। অধিকন্তু, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস, বিশেষ করে পরকালে মুসলমানদের জন্য অপেক্ষা করা সম্পূর্ণ পুরষ্কার, বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রকৃতপক্ষে, অদৃশ্যের উপর এই বিশ্বাসই ঈমানকে আলাদা করে। যদি কেউ কেবল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দৃশ্যমান বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করতে পারত, যেমন এই জীবনে পূর্ণ পুরষ্কার পাওয়া, তাহলে এর গুরুত্ব একই রকম থাকত না।

এছাড়াও, পূর্ণ শাস্তির ভয় এবং পরকালে পূর্ণ প্রতিদান লাভের আশা ব্যক্তিদের পাপপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকতে এবং পুণ্যকর্মে লিপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রতিফল দিবস শুরু হওয়ার জন্য, বস্তুজগতের অবসান অবশ্যই হতে হবে। এর কারণ হল, সমস্ত কর্ম বন্ধ হয়ে গেলেই শাস্তি এবং পুরষ্কার প্রদান করা সম্ভব। ফলস্বরূপ, ব্যক্তির কর্ম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিফল দিবস সংঘটিত হতে পারে না। এর অর্থ হল, শীঘ্রই হোক বা পরে হোক, বস্তুজগতের অবসান ঘটবে। অধ্যায় ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ২২:

"কারণ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রতিটি প্রাণী তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

এই আলোচনাটি চিন্তা করলে বিচার দিবসের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে প্রাপ্ত আশীর্বাদগুলি কাজে লাগিয়ে প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত হবে, যা পরিণামে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে এই ব্যবহারিক প্রস্তুতির সারসংক্ষেপ করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ৯২:

"... যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা এতে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাজ কায়েম করে।"

ইসলামে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠাকে কর্মের একটি মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ফলস্বরূপ, ইসলামের অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ড এই ফরজ নামাজের উপর কেন্দ্রীভূত। ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এগুলো সঠিকভাবে পালন করা প্রয়োজন, যার মধ্যে সময়মতো পালন করাও অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে এই নামাজের গুরুত্ব প্রায়শই তুলে ধরা হয়েছে, কারণ এগুলো মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ। উপরন্তু, সারা দিন ধরে বিতরণ করা পাঁচটি ফরজ নামাজ, বিচার দিনের ধ্রুবক স্মারক হিসেবে কাজ করে, ব্যক্তিদেরকে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করে, ফরজ নামাজের প্রতিটি অংশ প্রতীকীভাবে বিচার দিনের সাথে যুক্ত। নামাজের সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো বোঝায় যে কীভাবে একজন ব্যক্তি সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনে মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করবেন। অধ্যায় ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ৪-৬:

"তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

রুকু করার ভঙ্গি সেইসব লোকদের স্মরণ করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে মহান আল্লাহর আদেশ পালন না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচনার সম্মুখীন হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের অক্ষমতাকে তুলে ধরে। নামাজের সময় সিজদার কাজটি বিচারের দিনে সকলের জন্য মহান আল্লাহর সামনে সিজদা করার আহ্বানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে, যারা পৃথিবীতে থাকাকালীন, অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আদেশ অনুসরণ করার সময়, তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা আবিষ্কার করবে যে তারা বিচারের দিনে তা করতে অক্ষম। আল-কালাম, আয়াত 68:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

নামাজের সময় হাঁটু গেড়ে বসে থাকা, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সামনে একজন ব্যক্তি যে অবস্থান নেবেন, তার একটি শক্তিশালী স্মারক হিসেবে কাজ করে, যখন সে তার চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে শঙ্কায় ভরা থাকবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদের তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যারা নামাজের সময় এই দিকগুলো মনে রাখবেন, তারা তাদের নামাজ সঠিকভাবে আদায় করবেন, ফলে তাদের নামাজের মধ্যবর্তী সময়কালে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত আত্মসমর্পণ নিশ্চিত হবে। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

অধিকন্তু, জামে আত তিরমিযী, ২৬১৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ফরজ নামাজ বিশ্বাস ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য করে। যারা নামাজের দায়িত্ব অবহেলা করে তাদের ঈমান ছাড়া এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। এটা স্বীকার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈমান এমন একটি গাছের মতো যার বৃদ্ধির জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে যথাযথ লালন-পালনের প্রয়োজন। ঠিক যেমন সূর্যালোকের মতো অপরিহার্য উপাদানের অভাবে একটি উদ্ভিদ শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও আনুগত্যমূলক কাজের পুষ্টি ছাড়াই হ্রাস পেতে এবং মারা যেতে পারে।

ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে, যারা কেবল তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করতে চেয়েছিল তারা ঐশ্বরিক নির্দেশনা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য কতটা এগিয়ে গিয়েছিল এবং অন্যদেরকে ঐশ্বরিক নির্দেশনা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার জন্য তারা কতটা এগিয়ে গিয়েছিল, কারণ তারা তাদের সামাজিক অবস্থান এবং নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে ছিল। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯৩:

" আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে অথবা বলে, "আমার উপর ওহী করা হয়েছে', অথচ তার উপর কিছুই ওহী করা হয়নি, এবং যে বলে, "আমিও আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুরূপ কিছু নাযিল করব।"..."

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একটি প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে দেখা করতে আসে। তাদের মধ্যে ছিলেন মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা, যিনি মদিনায় পৌঁছে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কেবল নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করবেন, যদি তাকে তাঁর পরে ইসলামী জাতির নেতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) স্বপ্নে মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা সম্পর্কে সতর্কীকরণ পেয়েছিলেন, যে পরবর্তীতে মিথ্যাভাবে তাঁর নবুওয়াত দাবি করবে। তাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে একটি দৃঢ় সতর্কীকরণ জারি করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইয়ামামায় ফিরে আসার পর, মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা করেন। বস্তুগত সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তার অনেক অনুসারী তাকে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে, তিনি মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে একটি চিঠি পাঠান, যাতে তিনি তাঁর ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত হন এবং একটি আপস আলোচনার চেষ্টা করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে তারা যৌথভাবে নেতৃত্বের কর্তৃত্ব ভাগ করে নেবে। মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে একটি চিঠি পাঠানোর সময় তিনি সূরা আল-আ'রাফের ১২৮ নম্বর আয়াত উদ্‌ধৃত করেন:

"...নিশ্চয়ই, পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন। এবং [সর্বোত্তম] পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য।"

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ৪৫২-৪৫৪-এ এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা পবিত্র কুরআনের অনুরূপ আয়াত তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, অন্যদেরকে এই ভেবে প্রতারিত করার লক্ষ্যে যে সেও ঐশ্বরিক ওহী পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ আলোচিত মূল আয়াত, সূরা আল আন'আম, আয়াত ৯৩ নাযিল করেছেন:

"আর তার চেয়ে বড় জালেম কে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে অথবা বলে, "আমার উপর ওহী করা হয়েছে," অথচ তার উপর কিছুই ওহী করা হয়নি, এবং যে বলে, "আমিও আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মতো কিছু নাযিল করব।" আর যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন জালেমরা মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণায় ভোগে, আর ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে বলছে, "তোমাদের আত্মা বের করে দাও! আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তোমরা আল্লাহর উপর সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলছো এবং তাঁর আয়াতের প্রতি অহংকার করেছো।"

এই প্রচেষ্টাটি করার সময় সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে তাঁর প্রজ্ঞার অভাব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ তাঁর সু-রচিত কবিতাগুলি এমন তুচ্ছ বিষয়গুলিকে ঘিরে আবর্তিত হত যা কারও উপকারে আসে না। তিনি অটল আনুগত্যের মাধ্যমে এবং ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার মতো বস্তুগত পুরষ্কার প্রদানের মাধ্যমে অনুসারীদের আকৃষ্ট করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "দ্য বায়োগ্রাফি অফ আবু বকর

আস সিদ্দিক", পৃষ্ঠা ৪৮০ এবং ইমাম ওয়াহিদীর " আসবাব আল নুযুল" , ৬:৯৩, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তার খিলাফতের সময়, আবু বকর খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার মুখোমুখি করার জন্য পাঠান। জুবাইর ইবনে মুত'আমের মুক্ত দাস ছিলেন ওয়াহশী । নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের তৃতীয় বছরে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধে, ওয়াহশী নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) কে হত্যা করেন। বহু বছর পর, ওয়াহশী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করার লক্ষ্যে সেরা ব্যক্তির মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত করেন। যুদ্ধের সময়, ওয়াহশী মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার দিকে বর্শা নিক্ষেপ করেন এবং তাকে মারাত্মকভাবে আহত করেন। আরেক সাহাবী, আবু দুজানা (রাঃ) মিথ্যাবাদী মুসাইলিমাকে হত্যা করেন। সহীহ বুখারীতে লিপিবদ্ধ একটি হাদিসে এই ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, সংখ্যা 4072।

মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা এবং তার অনুসারীদের মতো, যখন একজন ব্যক্তি সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি চরম ভালোবাসা পোষণ করে তখন তাকে সমস্ত বৈধ সীমা অতিক্রম করতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 93:

" আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে অথবা বলে, "আমার উপর ওহী করা হয়েছে', অথচ তার উপর কিছুই ওহী করা হয়নি, এবং যে বলে, "আমিও আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুরূপ কিছু নাযিল করব।"..."

জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৬ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, সম্পদ ও মর্যাদার পেছনে ছুটতে থাকা, ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা ধ্বংসের চেয়েও ঈমানের জন্য বেশি ক্ষতিকর। কারণ যারা এই বস্তুগত সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করে তারা প্রায়শই তাদের বিশ্বাসকে ত্যাগ করে। সম্পদ ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষায়, তারা এই সম্পদ অর্জন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সময়, বিশেষ করে আধুনিক সময়ে, এই সম্পদ অর্জন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সময়, মহান আল্লাহকে অমান্য করবে। এই ধরণের জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা যত তীব্র হবে, মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ লঙ্ঘন করার এবং অন্যদের ক্ষতি করার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। ঐতিহাসিক নথিপত্র দেখায় যে ব্যক্তিরা ক্ষমতা এবং সম্পদ অর্জনের জন্য কত চরম পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নিরপরাধদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা। একজন মুসলিমের পরিবর্তে তাদের চাহিদা এবং দায়িত্ব পূরণ করে এমন একটি বৈধ আয় উপার্জনের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। যদি তাদের নেতৃত্বের ভূমিকা দেওয়া হয়, তাহলে তাদের উচিত এমনভাবে তা সম্পাদন করা যা মহান আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করে, নিশ্চিত করে যে এটি তাদের এবং অন্যদের জন্য এই জীবন এবং পরকালে শান্তি বয়ে আনবে। অন্যদিকে, ইতিহাস যেমন দেখিয়েছে, সম্পদ এবং ক্ষমতার অনুপযুক্ত ব্যবহার অবশেষে ব্যক্তির জন্য চাপ, অসুবিধা এবং চ্যালেঞ্জের দিকে পরিচালিত করবে, যদিও এই প্রভাবগুলি তাদের বা তাদের চারপাশের লোকেদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান নাও হতে পারে। এই পৃথিবীতে, তারা যে আশীর্বাদ পেয়েছে তার অপব্যবহার তাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের ভারসাম্যহীনতার দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে, যা শেষ পর্যন্ত বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করবে। এর ফলে তারা যতই বস্তুগত আরাম-আয়েশ উপভোগ করুক না কেন, এই জীবন এবং পরকালে উভয় ক্ষেত্রেই চাপ, অসুবিধা এবং কষ্টের দিকে পরিচালিত হবে। অধিকন্তু, বিচারের দিনে, ন্যায়বিচার কার্যকর করা হবে। ফলস্বরূপ, অত্যাচারী তাদের সৎকর্মগুলি তাদের শিকারের কাছে স্থানান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত তারা তাদের শিকারের পাপ বহন করবে। পরিশেষে, এর ফলে অত্যাচারীকে বিচারের দিনে জাহান্নামে নিন্দা করা হতে পারে, তারা মহান আল্লাহর অধিকারকে

সম্মান করেছে কিনা তা নির্বিশেষে। এই সতর্কতা সহিহ মুসলিমে প্রাপ্ত একটি হাদিসে লিপিবদ্ধ আছে, 6579 নম্বরে।

অতএব, সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি অতিরঞ্জিত ভালোবাসা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে, যা তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহারের মাধ্যমে। এই মনোভাব উভয় জগতেই কেবল সমস্যা এবং শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯৩-৯৪:

"...আর যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর, আর ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে বলছে, "তোমাদের আত্মা বের করে দাও! আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলতে এবং তাঁর আয়াতের প্রতি অহংকার করতে। আর তোমরা অবশ্যই আমাদের কাছে একা এসেছ যেমন আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, আর তোমরা যা কিছু দিয়েছিলাম তা তোমাদের পিছনে ফেলে এসেছ..."

আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা এবং উভয় জাহানে শাস্তি থেকে অন্য কেউ তাদের রক্ষা করবে বলে মিথ্যা বিশ্বাস করা, এমন ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটি তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্য হতে উৎসাহিত করবে, এবং তিনি যে অনুগ্রহ তাদের দিয়েছেন তার অপব্যবহার করবে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯৪:

"আর তোমরা অবশ্যই আমাদের কাছে একাকী এসেছো যেমন আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, আর তোমরা তোমাদের পিছনে ফেলে এসেছো যা আমরা তোমাদের দিয়েছিলাম। আর তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদেরও আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যাদেরকে তোমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহর শরীক বলে দাবী করতে। তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা দাবি করতে তা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে।"

অথচ, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশার মূলে রয়েছে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার প্রচেষ্টা, যার অর্থ ইসলামী নীতিমালা অনুসারে তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা, একই সাথে ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে লিপিবদ্ধ একটি হাদিসে এই পার্থক্যটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, এই পার্থক্যটি স্বীকৃতি দেওয়া এবং কেবলমাত্র ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা থেকে দূরে থেকে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রতি প্রকৃত আশা গড়ে তোলা অপরিহার্য, কারণ এটি তাদের এই জীবনে বা পরকালে কোনও উপকারে আসবে না।

অধিকন্তু, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুপারিশ বাস্তবতা, তবুও যারা এই ধারণা নিয়ে উপহাস করে যে, তাদের কর্ম যাই হোক না কেন, তারা মুক্তি পাবে। তারা বিচার দিবসে তা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। সম্ভবত নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিচার দিবসে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন, কারণ তারা তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে অনুরূপ কাজের সাথে সমর্থন করেনি। ২৫তম অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ৩০:

" আর রাসূল বলেছেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

এই আয়াতে মুসলিমদের কথা বলা হয়েছে, কারণ তারাই পবিত্র কুরআন গ্রহণ করেছে, যেখানে অমুসলিমরা তা গ্রহণ করেনি, এবং তাই তারা তা ত্যাগ করতে পারে না। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যার বিরুদ্ধে কথা বলেন, বিচারের দিনে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে তা স্পষ্ট। অতএব, কেবল আকাঙ্ক্ষার বাইরে গিয়ে আল্লাহর রহমতের উপর খাঁটি আশা পোষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী নীতিমালা অনুসারে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করে বিচারের দিনে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুপারিশ কামনা করা।

৬ষ্ঠ অধ্যায় – আল আন'আম, আয়াত ৯৫ -১৩৩

۞ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ
ٱلْحَىِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ
ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا
ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ
لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۖ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟
إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ
سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ
شَىْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا۠
عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾

وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
﴿١٠٥﴾

ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾

وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكُواْۚ وَمَا جَعَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗاۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِيلٖ ١٠٧

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٠٨

وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ لَئِن جَآءَتۡهُمۡ ءَايَةٞ لَّيُؤۡمِنُنَّ بِهَاۚ قُلۡ إِنَّمَا ٱلۡأٓيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشۡعِرُكُمۡ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٠٩

وَنُقَلِّبُ أَفۡـِٔدَتَهُمۡ وَأَبۡصَٰرَهُمۡ كَمَا لَمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٖ وَنَذَرُهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ١١٠

۞ وَلَوۡ أَنَّنَا نَزَّلۡنَآ إِلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَحَشَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ كُلَّ شَيۡءٖ قُبُلٗا مَّا كَانُواْ لِيُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَجۡهَلُونَ ١١١

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ ١١٢

وَلِتَصۡغَىٰٓ إِلَيۡهِ أَفۡـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ وَلِيَرۡضَوۡهُ وَلِيَقۡتَرِفُواْ مَا
هُم مُّقۡتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡتَغِي حَكَمٗا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلٗاۚ
وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٞ مِّن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
ٱلۡمُمۡتَرِينَ ﴿١١٤﴾

وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۖ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ
﴿١١٥﴾

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا
ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ ﴿١١٦﴾

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ﴿١١٧﴾

فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِينَ ﴿١١٨﴾

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

وَذَرُوا۟ ظَٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا
كَانُوا۟ يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ
لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ
فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟
يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۚ وَمَا
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

وَإِذَا جَآءَتۡهُمۡ ءَايَةٞ قَالُواْ لَن نُّؤۡمِنَ حَتَّىٰ نُؤۡتَىٰ مِثۡلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِۘ ٱللَّهُ
أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ
وَعَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا كَانُواْ يَمۡكُرُونَ ١٢٤

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ
صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ
ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٢٥

وَهَٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسۡتَقِيمٗاۗ قَدۡ فَصَّلۡنَا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦

۞ لَهُمۡ دَارُ ٱلسَّلَٰمِ عِندَ رَبِّهِمۡۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٢٧

وَيَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ جَمِيعٗاۚ يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ قَدِ ٱسۡتَكۡثَرۡتُم مِّنَ ٱلۡإِنسِۖ وَقَالَ أَوۡلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ
رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضٖ وَبَلَغۡنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيٓ أَجَّلۡتَ لَنَاۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثۡوَىٰكُمۡ خَٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا
مَا شَآءَ ٱللَّهُۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٞ ١٢٨

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعۡضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعۡضَۢا بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ١٢٩

يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَقُصُّونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِي وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَاۚ قَالُواْ شَهِدۡنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَاۖ وَغَرَّتۡهُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَٰفِرِينَ ١٣٠

ذَٰلِكَ أَن لَّمۡ يَكُن رَّبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ بِظُلۡمٖ وَأَهۡلُهَا غَٰفِلُونَ ١٣١

وَلِكُلّٖ دَرَجَٰتٞ مِّمَّا عَمِلُواْۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعۡمَلُونَ ١٣٢

وَرَبُّكَ ٱلۡغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحۡمَةِۚ إِن يَشَأۡ يُذۡهِبۡكُمۡ وَيَسۡتَخۡلِفۡ مِنۢ بَعۡدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوۡمٍ ءَاخَرِينَ ١٣٣

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ শস্য ও খেজুর বীজের ছিদ্রকারী। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। তিনিই আল্লাহ; তাহলে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছো?"

[তিনি] প্রভাত বিদীর্ণকারী এবং রাত্রিকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটি পরাক্রমশালী, জ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ।

আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও। আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

আর তিনিই সেইজন যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য একটি আবাসস্থল ও সংরক্ষণের স্থান দিয়েছেন। আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি তাদের জন্য যারা বোধগম্য।

আর তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমি তা দ্বারা সকল কিছুর উৎপাদন করি। আমরা তা থেকে সবুজ গাছপালা উৎপন্ন করি, যা থেকে আমরা স্তরে স্তরে শস্য উৎপন্ন করি। আর খেজুর গাছ থেকে তার ফলের গুচ্ছ তৈরি হয়, ঝুলন্ত। আর আঙ্গুরের বাগান, জলপাই ও ডালিম, যা একই রকম কিন্তু বিচিত্র। এর ফলের দিকে তাকাও যখন তা ফল দেয় এবং তার পাকা হওয়ার দিকে। নিঃসন্দেহে এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে জিনদের অংশীদার সাব্যস্ত করেছে, অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং অজ্ঞতাবশত তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা বানিয়েছে। তিনি পবিত্র এবং তারা যা বলে তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই, অথচ তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, অতএব তাঁরই উপাসনা করো, আর তিনি সকল কিছুর কর্মবিধায়ক।

দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারে না, কিন্তু তিনি [সমস্ত] দৃষ্টি দেখতে পান; এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।

তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জ্ঞান এসেছে। অতএব যে ব্যক্তি দেখতে পায়, সে তার নিজের জন্যই দেখে, আর যে অন্ধ হয়, সে তার নিজের ক্ষতি করে। আর [বলুন], "আমি তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নই।"

আর এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী নানাভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা [অবিশ্বাসীরা] বলে, "তুমি অধ্যয়ন করেছ', এবং যাতে আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য [পবিত্র কুরআন] স্পষ্ট করে বলি।

[নবী মুহাম্মদ, সা. তাঁর উপর আশীর্বাদ ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক], তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার অনুসরণ করো - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই - এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শিরক করে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

কিন্তু যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা শির্ক করত না। আর আমরা তোমাকে তাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের উপর তত্ত্বাবধায়কও নও।

আর আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে গালি দিও না, পাছে তারা অজ্ঞতাবশত শত্রুতাবশত আল্লাহকে গালি দেয়। এভাবেই আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করেছি। তারপর তাদের প্রতিপালকের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

আর তারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলে যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তাহলে তারা অবশ্যই তাতে বিশ্বাস করবে। বলো, "নিদর্শন তো কেবল আল্লাহর কাছেই আছে।" আর তুমি কি বুঝতে পারো যে, যদি তা (নিদর্শন) আসে, তবুও তারা বিশ্বাস করবে না?

আর আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেব, যেমন তারা প্রথমবার এতে বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেব।

আর যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতাদের নাযিল করতাম, মৃতরা তাদের সাথে কথা বলত এবং তাদের সামনে সমস্ত কিছু একত্রিত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনত না, যদি না আল্লাহ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু সৃষ্টি করেছি - মানুষ ও জিনের মধ্যে থেকে শয়তান, যারা একে অপরকে বিভ্রান্তির জন্য কাল্পনিক কথাবার্তা বলে। কিন্তু তোমার প্রতিপালক যদি চাইতেন, তাহলে তারা তা করত না। অতএব, তাদেরকে এবং তারা যা কিছু মিথ্যা বলে তা ত্যাগ করো।

আর [এটা] যাতে যারা পরকালে অবিশ্বাস করে তাদের অন্তর এর দিকে ঝুঁকে পড়ে [প্রতারণামূলক কথাবার্তা] যাতে তারা এতে সন্তুষ্ট থাকে এবং তারা যা করছে তা করতে থাকে।

তাহলে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে খুঁজব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত কিতাব [কুরআন] অবতীর্ণ করেছেন?"

আর যাদেরকে আমরা পূর্বে কিতাব দিয়েছি, তারা জানে যে এটি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, অতএব তোমরা কখনও সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

আর তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের সাথে পূর্ণ হয়েছে। তাঁর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নাও, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে এবং তারা কেবল অনুমান করে।

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকই সবচেয়ে বেশি জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন কারা [সঠিকভাবে] সৎপথপ্রাপ্ত।

অতএব, যে [গোশতের] উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার করো। যদি তোমরা তাঁর আয়াতসমূহের [অবতীর্ণ আইনের] প্রতি বিশ্বাসী হও।

আর কেন তোমরা এমন কিছু খাও না যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে, অথচ তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যা তিনি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, তবে যা তোমাদের বাধ্য করা হয় তা ছাড়া। আর অনেকেই অজ্ঞতাবশত তাদের নিজস্ব প্রবৃত্তির মাধ্যমে অন্যদেরকে বিপথগামী করে। নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।

আর প্রকাশ্য পাপ এবং গোপন পাপ পরিত্যাগ করো। যারা পাপ অর্জন করে, তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পাবে।

আর যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ করো না, কারণ তা গুরুতর অবাধ্যতা। আর শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করার জন্য প্ররোচিত করে। আর যদি তোমরা তাদের কথা মেনে নাও, তাহলে অবশ্যই তোমরা (তাঁর সাথে অন্যদের) শিরক করবে।

আর যে মৃত ছিল, তাকে আমি জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারে আছে, যে কখনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না? এভাবেই কাফেরদের কাছে তাদের কর্মকাণ্ড সুশোভিত করা হয়েছে।

আর এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে তার প্রধান অপরাধীদেরকে ষড়যন্ত্র করার জন্য নিযুক্ত করেছি, কিন্তু তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে এবং তারা তা উপলব্ধি করে না।

আর যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তখন তারা বলে, "আমরা কখনও বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমাদেরকে আল্লাহর রাসূলদের যা দেওয়া হয়েছিল, তার অনুরূপ দেওয়া হয়।" আল্লাহই ভালো জানেন যে, তিনি তাঁর বার্তা কোথায় রাখেন। অচিরেই জালেমরা আল্লাহর কাছ থেকে অপমান এবং তাদের মন্দ চক্রান্তের জন্য কঠোর শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হবে।

অতএব আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন; আর যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে এমনভাবে সংকুচিত ও সংকীর্ণ করে দেন যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের উপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন।

আর এটাই তোমার প্রতিপালকের সরল পথ। আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি সেইসব লোকের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে শান্তির আবাস থাকবে এবং তিনি তাদের বন্ধু হবেন তাদের কর্মের কারণে।

আর [স্মরণ করো], যেদিন তিনি তাদেরকে একত্রিত করবেন [এবং বলবেন], "হে জিন দল, তোমরা অনেক মানুষকে [বিপথগামী করেছ]।" আর তাদের মানবিক সহযোগীরা বলবে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কেউ কেউ অন্যদের ব্যবহার করেছিল এবং আমরা [এখন] আমাদের জন্য নির্ধারিত সময়সীমায় পৌঁছে গেছি।" তিনি বলবেন, "তোমাদের আবাসস্থল আগুন, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী।"

আর এভাবেই আমি কিছু জালেমকে তাদের কৃতকর্মের কারণে অন্যদের বন্ধু বানাবো।

"হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করতেন এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতের বিষয়ে সতর্ক করতেন?" তারা বলবে, "আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি'; আর পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল, এবং তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে তারা কাফের ছিল।

এটা এজন্য যে, তোমার প্রতিপালক জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন না যখন তার অধিবাসীরা অজ্ঞ থাকে।

আর প্রত্যেকের জন্যই তাদের কর্মের উপর ভিত্তি করে মর্যাদা রয়েছে। আর তোমার প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

আর তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, করুণার অধিকারী। তিনি যদি চান, তাহলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিতে পারেন এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য জাতির বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

মহান আল্লাহ মহাবিশ্বের মধ্যে এমন কিছু নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন যা সৃষ্টির উপর তাঁর একত্ব এবং অসীম ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয় এবং এর ফলে মানুষ তাদের নিজেদের স্বার্থে তাঁর আনুগত্য করতে উৎসাহিত হয়। এই আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তিনি যে আশীর্বাদগুলি তাদের দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে, তাদের জীবনের সমস্ত দিক এবং ব্যক্তিদের যথাযথভাবে অবস্থান করবে, একই সাথে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য নিজেদেরকে যথেষ্ট প্রস্তুত করবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতে প্রশান্তি বর্ধন করবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৯৫:

" নিশ্চয়ই আল্লাহ শস্য ও খেজুর বীজের ছিদ্রকারী..."

একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টিকে রিযিক দান করেন। রিযিক প্রাপ্তির এই দিকটি অন্য সকলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। একটি বীজকে জীবিত করার কাজটি বিচারের দিনে মানবজাতির পুনরুত্থানের সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। অতএব, মহান আল্লাহ তাআলা, মানুষ নামক মৃত বীজকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা এবং ইচ্ছার অধিকারী, যা মাটিতে সমাহিত থাকে, যেমন একটি মৃত বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং জীবিত হয়। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৯৫:

"... তিনি মৃতের ভেতর থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিতের ভেতর থেকে মৃতকে বের করেন..."

মহাবিশ্বের মধ্যে আরও অনেক নিদর্শন রয়েছে যা চূড়ান্ত পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দেয়। শীতকালে, গাছের পাতা মারা যায় এবং ঝরে পড়ে এবং গাছটি প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে, পাতাগুলি আবার গজায় এবং গাছটি প্রাণবন্ত দেখায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগ্রত চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। ঘুম মৃত্যুর বোন, কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি কেটে ফেলা হয়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা বেঁচে থাকার জন্য নির্ধারিত হয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবার জীবন দান করে। সূরা ৩৯ আয-যুমার, আয়াত ৪২:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

অধিকন্তু, বিচার দিবস এমন একটি ঘটনা যা ঘটতে চলেছে। মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করলে, ভারসাম্যের অসংখ্য উদাহরণ সনাক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে একটি আদর্শ এবং স্থিতিশীল দূরত্ব বজায় রাখে। পৃথিবী যদি সূর্যের আরও সামান্য কাছাকাছি বা দূরে থাকে, তবে এটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। একইভাবে, জলচক্র, যার মধ্যে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবন এবং তারপরে বৃষ্টিপাতের জন্য ঘনীভূত হয়, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ, যা পৃথিবীতে জীবনকে টিকে থাকতে দেয়। মাটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যা বীজের সূক্ষ্ম শাখা এবং অঙ্কুরগুলিকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম করে, যার ফলে জীবিকা নির্বাহের জন্য ফসল উৎপাদন করে, একই সাথে এটি তার উপর নির্মিত বিশাল কাঠামোর ওজনকে সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা কেবল একজন স্রষ্টাকেই নয় বরং ভারসাম্যের নীতিকেও নির্দেশ করে। তবে, এই পৃথিবীর একটি উল্লেখযোগ্য দিক স্পষ্টতই ভারসাম্যহীন বলে মনে

হয়, বিশেষ করে মানবজাতির কর্মকাণ্ড। প্রায়শই দেখা যায় যে নিপীড়ক এবং অত্যাচারী ব্যক্তিরা এই জীবনে পরিণতি এড়ায়। বিপরীতে, অসংখ্য ব্যক্তি নিপীড়ন এবং অন্যান্য কষ্ট সহ্য করে কিন্তু তাদের ধৈর্যের জন্য তাদের প্রাপ্য পুরস্কার পায় না। অনেক মুসলিম যারা বিশ্বস্তভাবে আল্লাহর আদেশ মেনে চলে, তারা প্রায়শই এই পৃথিবীতে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং পুরস্কারের একটি সামান্য অংশ পায়, অন্যদিকে যারা স্পষ্টতই আল্লাহকে অমান্য করে, তারা পার্থিব বিলাসিতায় লিপ্ত হয়। ঠিক যেমন আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, তেমনি কর্মের জন্য পুরস্কার এবং শাস্তিও এই ভারসাম্যকে প্রতিফলিত করা উচিত। তবে, বর্তমান পৃথিবীতে এটি স্পষ্টতই প্রযোজ্য নয়, যা ইঙ্গিত দেয় যে এটি অন্য সময়ে, বিশেষ করে বিচারের দিনে প্রকাশিত হবে।

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে ব্যক্তিদের পূর্ণ পুরষ্কার এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। তবে, এখানে পূর্ণ শাস্তি না দেওয়ার একটি কারণ হল, মহান আল্লাহ ব্যক্তিদেরকে সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত হওয়া এবং তাদের কর্ম সংশোধন করার জন্য অসংখ্য সুযোগ প্রদান করেন। তিনি মুসলিমদের এই জীবনে পূর্ণ পুরষ্কার প্রদান থেকে বিরত থাকেন, কারণ এই পৃথিবী জান্নাতের সমতুল্য নয়। অধিকন্তু, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস, বিশেষ করে পরকালে একজন মুসলিমের জন্য যে সম্পূর্ণ পুরষ্কার অপেক্ষা করছে, তা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রকৃতপক্ষে, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসই ঈমানের পার্থক্য করে। যদি কেউ কেবল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা অনুভব করা যায়, যেমন এই পৃথিবীতে পূর্ণ পুরষ্কার প্রাপ্তি, তাতে বিশ্বাস করে, তাহলে এর গুরুত্ব একই রকম থাকবে না।

এছাড়াও, পূর্ণ শাস্তির ভয়, পরকালে পূর্ণ প্রতিদান লাভের আশা সহ, ব্যক্তিদের পাপপূর্ণ কর্ম থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ আচরণে লিপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রতিফল দিবস শুরু হওয়ার জন্য, এই বস্তুগত জগতের অবসান অপরিহার্য। এই প্রয়োজনীয়তা এই সত্য থেকে উদ্ভূত হয় যে শাস্তি এবং পুরষ্কার কেবলমাত্র সমস্ত কর্ম বন্ধ হয়ে গেলেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিদের কর্ম চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিফল দিবস ঘটতে পারে না। এর অর্থ হল যে বস্তুগত জগতকে শেষ পর্যন্ত শেষ করতে হবে, তা তাড়াতাড়ি হোক বা পরে হোক।

এই আলোচনাটি চিন্তা করলে একজন ব্যক্তির বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে, ফলে তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি কাজে লাগিয়ে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত হবে। এই প্রস্তুতি উভয় জগতেই শান্তি এবং সাফল্য নিশ্চিত করবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২২:

"কারণ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রতিটি প্রাণী তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

তবুও, যারা এই পৃথিবীতে তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করার ধারণাকে অপছন্দ করে, কারণ তারা কেবল তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করতে চায়, তারা কিয়ামতের দিন সংঘটিত পুনরুত্থানকে অস্বীকার করবে বা উপেক্ষা করবে, যদিও এর সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে এমন অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৯৫:

"...তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। তিনিই আল্লাহ; তাহলে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?"

মৃত বীজকে জীবিত করার ক্ষুদ্র ও অদৃশ্য লক্ষণ উল্লেখ করার পর, পরবর্তী আয়াতটি সূর্যের মতো বৃহৎ জিনিসের উপর মহান আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত দেয়। সূরা আল আন'আম, আয়াত ৯৬:

"ভোরের ছোরা..."

দিন ও রাতের চক্র পর্যবেক্ষণ করলে, কেউ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, রাতের বেলায় মৃত্যুসদৃশ অবস্থা সহ্য করার পর, মহান আল্লাহ কীভাবে পৃথিবীকে সূর্যের আলো দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করেন।

এছাড়াও, দিন ও রাতের সঠিক সময়সীমা এবং বছরজুড়ে তাদের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের কারণে ব্যক্তিরা তাদের থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হয়। যদি দিন দীর্ঘ হয়, তাহলে দীর্ঘ সময়ের কারণে ব্যক্তিরা ক্লান্তি অনুভব করতে পারে। বিপরীতে, যদি রাত দীর্ঘ হয়, তাহলে ব্যক্তিরা তাদের জীবিকা নির্বাহ এবং জ্ঞান অর্জনের মতো অন্যান্য মূল্যবান প্রচেষ্টা, যেমন জ্ঞান অর্জন, করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবে না। ছোট রাতের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিরা পর্যাপ্ত বিশ্রাম অর্জনের জন্য সংগ্রাম করবে, যা সর্বোত্তম স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। অধিকন্তু, দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কৃষি

উৎপাদনের উপরও প্রভাব ফেলবে, যা মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। মহাবিশ্বের মধ্যে দিন, রাত এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার সুসংগত পরিচালনা মহান আল্লাহর একত্বের স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে কাজ করে, কারণ যদি একাধিক দেবতা থাকত, তাহলে তাদের পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষা অনিবার্যভাবে মহাবিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত। অধ্যায় ২১ আল আম্বিয়া, আয়াত ২২:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, ৯৬ নং আয়াত:

"প্রভাত ছেদক এবং রাত্রিকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য তৈরি করেছেন। এটি পরাক্রমশালী, জ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ।"

আকাশমণ্ডলীয় বস্তু, যেমন ছায়াপথের মধ্যে থাকা নক্ষত্র, রাতে ভ্রমণকারীদের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। বাস্তবে, এই ধরণের নেভিগেশন আজও মানুষ ব্যবহার করে। ষষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ৯৭:

" আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও..."

যারা মহাকাশীয় বস্তু অধ্যয়ন করেন তারা দাবি করতে পারেন না যে তারার অবস্থান এলোমেলো কারণ তারা বিভিন্ন ঋতুতে মানুষকে সঠিকভাবে পথ দেখায়। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 97:

"... আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।"

মহান আল্লাহ যে মানুষকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা আরেকটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, তারা হাড় ও ধূলিতে পরিণত হওয়ার পরও তিনি তাদেরকে পুনরুত্থিত করতে পারেন। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯৮:

" আর তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন..."

মহান আল্লাহ, মানুষকে এই পৃথিবীতে একটি অস্থায়ী বাসস্থান এবং পুনরুত্থান পর্যন্ত তাদের বিশ্রামের জন্য একটি স্থান প্রদান করেছেন। তিনি তাদের গতিবিধি এবং বিশ্রামস্থল সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখেন, তাই, তাদের পুনরুত্থিত করা তাঁর জন্য একটি সহজ কাজ। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯৮:

"... এবং [তোমাকে] থাকার জায়গা এবং সঞ্চয়স্থান দিয়েছি..."

এবং অধ্যায় ৫০ ক্বাফ, আয়াত ৪:

" পৃথিবী তাদের থেকে কতটুকু কমিয়ে দেয় তা আমরা জানি এবং আমাদের কাছে একটি সংরক্ষণযোগ্য হিসাব আছে।"

এবং ৭৫তম অধ্যায় আল-ক্বিয়ামাহ, ৪র্থ আয়াত:

" হ্যাঁ। [আমরা] তার আঙুলের ডগা সমান করতেও সক্ষম।"

এই এবং আরও অনেক নিদর্শন স্পষ্ট করে যে, মহান আল্লাহ তাআলা মৃতদের পুনরুত্থিত করার এবং তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করার ক্ষমতা এবং জ্ঞান রাখেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯৮:

"... আমরা নিদর্শনগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি তাদের জন্য যারা বোধগম্য।"

এরপর মহান আল্লাহ সৃষ্টির জন্য তাঁর প্রদত্ত রিযিকের আলোচনা প্রসারিত করেন, যা আগে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছিল। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯৯:

" আর তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমি তা দ্বারা সকল কিছুর উৎপাদন করি। আমরা তা থেকে সবুজ গাছপালা উৎপন্ন করি, যা থেকে আমরা স্তরে স্তরে শস্য উৎপন্ন করি। আর খেজুর গাছ থেকে- তার ফলের গুচ্ছগুলি ঝুলন্ত। আর আঙ্গুরের বাগান, জলপাই ও ডালিম, একই রকম কিন্তু বিচিত্র। [প্রতিটি] তার ফলের দিকে তাকাও যখন তা ফল দেয় এবং [তার পরিপক্কতার দিকে]..."

সৃষ্টির জন্য রিজিক উৎপাদনের প্রতিটি স্তরই একমাত্র আল্লাহ তাআলা নিয়ন্ত্রণ করেন। পবিত্র কুরআন যেমন সত্য বলেছে, মহান আল্লাহ তাআলা বাগান তৈরিতে মানুষের ভূমিকা স্বীকার করেছেন, যেমন তাদের বাগানকে ঘিরে রাখার জন্য বেড়া তৈরি করা, কারণ তিনি উল্লেখ করেননি যে তিনি একাই বাগান তৈরি করেন, যেমন এই আয়াতে উল্লেখিত অন্যান্য সমস্ত জিনিস তিনি একাই তৈরি করেন। উপরন্তু, যদিও একটি গাছ এক ধরণের ফল দেয়, তবুও ফলগুলি প্রায়শই ভিন্ন স্বাদের হয়, যদিও একই গাছ দ্বারা উৎপাদিত হয়, যা একই জল এবং পুষ্টি দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। এই পার্থক্যটি আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃজনশীল শক্তির নিদর্শন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

অধিকন্তু, ফসল ও উদ্ভিদ উৎপাদনের জন্য মৃত ভূমিকে জীবিত করা পুনরুত্থানের আরেকটি নিদর্শন। মহান আল্লাহ যেমন মৃত ভূমিকে জীবিত করেন, তেমনি তিনি মৃত মানুষকেও জীবিত করবেন। সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৩৯:

" আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হলো তুমি পৃথিবীকে স্থির দেখতে পাও, অতঃপর যখন আমরা তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা কাঁপে ও বৃদ্ধি পায়। নিঃসন্দেহে যিনি একে জীবিত করেছেন, তিনিই মৃতদের জীবিত করার কর্তা। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

কিন্তু যারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস রাখে, কেবল তারাই পুনরুত্থানের এই চিহ্ন দ্বারা প্রভাবিত হবে যাতে তারা কার্যত তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হয়। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত মহান আল্লাহ তাদের যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৯৯:

"... নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

প্রতিটি প্রজন্মের মানুষ উভয় জগতে তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করার বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়ার একটি প্রধান উপায় ছিল, মহান আল্লাহর সাথে এমন কিছু অংশীদার স্থাপন করা যারা তাদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে, যার ফলে তারা

তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করা থেকে রক্ষা পাবে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০০:

" কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে জিনদের অংশীদার সাব্যস্ত করেছে, অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং অজ্ঞতাবশত তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা বানিয়েছে..."

এই অদ্ভুত এবং ভিত্তিহীন বিশ্বাসগুলি গ্রহণ করার ফলে তারা একনিষ্ঠ উপাসক হিসেবে আবির্ভূত হতে পেরেছিল এবং একই সাথে তাদের সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার স্বাধীনতা দিয়েছিল, তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করার ভয় ছাড়াই, কারণ অন্য কোনও সৃষ্টি তাদের কর্মের পরিণতি থেকে রক্ষা করবে।

অধিকন্তু, ইতিহাস জুড়ে, অসংখ্য ব্যক্তি আল্লাহকে একজন পার্থিব রাজার মতোই উপলব্ধি করেছেন। একজন পার্থিব রাজা স্বাধীনভাবে তার রাজ্যের কার্যক্রম তদারকি করতে অক্ষম হন এবং তাই তার অঞ্চলের শাসনকার্যে সহায়তা করার জন্য গভর্নরের মতো সহকারী নিয়োগ করেন। ফলস্বরূপ, এই ধারণার কারণে, মুসলিম সহ অনেক ব্যক্তি তাদের সময়, শক্তি এবং সম্পদ আধ্যাত্মিক সত্তা এবং ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য বিনিয়োগ করেন যাদের বিশ্বাস করা হয় যে তারা মহান আল্লাহর সাথে একটি অনন্য সংযোগ রাখে, যা একজন গভর্নরের একজন রাজার সাথে বিশেষ সম্পর্কের মতো। তাদের উদ্দেশ্য হল এই আধ্যাত্মিক সত্তা বা ব্যক্তিদের অনুগ্রহ অর্জন করা যাতে তারা তাদের পক্ষে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারে, ঠিক যেমন একজন গভর্নর রাজার কাছে এমন একজন ব্যক্তির পক্ষে ওকালতি করতে পারেন যিনি উপহার এবং অসাধারণ শ্রদ্ধা ও স্নেহ প্রদর্শনের মাধ্যমে গভর্নরের কাছে নিজেকে প্রিয় করে তুলেছেন। অধ্যায় 39 আয-যুমার, আয়াত 3:

"...আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে [বলে], "আমরা কেবল তাদের ইবাদত করি এজন্য যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।"..."

অতএব, আধ্যাত্মিক বলে বিবেচিত ব্যক্তিরা, বিভিন্ন সত্তার সাথে, সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং মহান আল্লাহ তায়ালার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে, যা ইসলামের নীতির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। ফলস্বরূপ, একজন মুসলিমের জন্য একজন দক্ষ শিক্ষকের কাছ থেকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তাদের যথাযথ সম্মান প্রদান করা বাধ্যতামূলক; তবে, তাদের এই বিশ্বাস রাখা উচিত নয় যে, যারা আধ্যাত্মিক বলে মনে হয় তাদের সম্মান করতে হবে যাতে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০০:

"...তিনি পবিত্র এবং তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।"

মহান আল্লাহ, অন্য কাউকে দেবত্ব আরোপের মিথ্যা বিশ্বাসকে দূর করে দেন এই সত্যের মাধ্যমে যে তিনি একাই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। যদি অন্য কোন সত্তা ঐশ্বরিক হত, তাহলে তাঁর শাসনে তাদের কিছু অংশ থাকত। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১০১:

" আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তাঁর কোন সঙ্গী নেই এবং তিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, তার পুত্র কীভাবে হতে পারে?"

অধিকন্তু, একজন ঐশ্বরিক সত্তার সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকে, বিশেষ করে তার বান্দাদের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান, যেমন তাদের কর্ম এবং চাহিদা। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সবকিছু জানেন না, তাই অন্য কোন সত্তাকে ঐশ্বরিক বলে বিবেচনা করা যায় না। ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ১০১:

"...এবং তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।"

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১০১:

" আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তাঁর কোন সঙ্গী নেই এবং তিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, তার পুত্র কীভাবে হতে পারে?"

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিস্তারের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তাঁর অলৌকিক জন্ম, তাঁর দ্বারা সম্পাদিত অলৌকিক ঘটনা এবং জীবদ্দশায় তাঁর স্বর্গারোহণ। পবিত্র কুরআন হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের অলৌকিক প্রকৃতির

সত্যতা নিশ্চিত করে এবং পিতা ছাড়া তাঁর জন্মকে মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৭:

“তিনি [মারিয়াম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট] বললেন, “হে আমার প্রতিপালক, আমার সন্তান কিভাবে হবে যখন কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি?” [ফেরেশতা] বললেন, “আল্লাহ তা-ই, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন, ‘হও’, আর তা হয়ে যায়।”

মহান আল্লাহ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পিতা ছাড়াই অস্তিত্বে এনেছিলেন, ঠিক যেমন তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পিতা বা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। এই সত্যটি ইঙ্গিত দেয় না যে তাদের মধ্যে দেবত্ব রয়েছে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৯:

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বলেছেন, "হও", আর সে হয়ে গেল।"

এটা অদ্ভুত যে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে হযরত ঈসা (আঃ) হলেন মহান আল্লাহর পুত্র, কারণ তিনি পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে, তারা হযরত আদম (আঃ)-কে মহান আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে না, যদিও তিনি পিতা বা মাতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর তুলনায় হযরত আদম (আঃ)-এর আল্লাহর পুত্র উপাধির দাবি বেশি বলে মনে হয়, তবুও তারা

এটি দাবি করে না। হযরত আদম (আঃ)-এর প্রসঙ্গে তারা যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান কীভাবে প্রয়োগ করে, তা সত্যিই কৌতূহলের বিষয়, যদিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে তা করতে ব্যর্থ হয়।

পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি আরোপিত অলৌকিক ঘটনাগুলির সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই অলৌকিক ঘটনাগুলি মহান আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি এবং আদেশের মাধ্যমে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। যদি মহান নবী ঈসা আলাইহিস সালাম ঐশী হতেন, তাহলে তিনি মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির প্রয়োজন করতেন না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৯:

“আর [ঈসা আলাইহিস সালামকে] বনী ইসরাঈলের জন্য একজন রাসূল বানাও, [যিনি বলবেন], 'আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করি, অতঃপর তাতে ফুঁ দেই, আল্লাহর নির্দেশে তা পাখি হয়ে যায়। আর আমি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করি এবং আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি। আর আমি তোমাদেরকে তোমাদের খাবার এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখি তা জানিয়ে দেই.."

অধিকন্তু, খ্রিস্টানরা স্বীকার করে যে অন্যান্য পবিত্র নবীগণ, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, অলৌকিক কাজ করেছিলেন, যার মধ্যে হযরত মুসা আলাইহিস সালামও ছিলেন। তবে, এটি অদ্ভুত যে তারা এই অন্যান্য পবিত্র নবীগণ, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তাদের অলৌকিক কাজ সত্ত্বেও, তাদের দেবত্বের জন্য দায়ী করে না।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জীবিত অবস্থায় আসমানে আরোহণ করা মহান আল্লাহর শক্তির আরও একটি প্রমাণ হিসেবে কাজ করে, যিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য এই যাত্রাকে সহজ করে দিয়েছিলেন। যদি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দেবত্বের অধিকারী হতেন, তাহলে তিনি তাঁর নিজস্ব সহজাত শক্তির মাধ্যমে এই যাত্রা শুরু করতে পারতেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৫:

"[স্মরণ করো] যখন আল্লাহ বললেন, "হে ঈসা, আমি অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করব এবং আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং তোমাকে পবিত্র করব [অর্থাৎ, কাফেরদের থেকে মুক্ত করব..""

পবিত্র কুরআন খ্রিস্টানদের জানায় যে, নবী ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি, যা তাদের বিশ্বাসের বিপরীত। ক্রুশে যার সাদৃশ্য দেখা গিয়েছিল তিনি নবী ঈসা (আঃ)-কে নন, বরং এমন একজন ব্যক্তি যাকে তাঁর সাদৃশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে, মহান আল্লাহ, নবী ঈসা (আঃ)-কে ইতিমধ্যেই আসমানে উন্নীত করেছেন। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৫৬-১৫৮:

"এবং তাদের অবিশ্বাস এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে তাদের বিরাট অপবাদের জন্য। এবং তাদের এই কথার জন্য যে, "আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়মের পুত্র মসীহ ঈসাকে হত্যা করেছি।" তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশেও চড়ায়নি; বরং তাদের কাছে তার অনুরূপ করা হয়েছিল... বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে তুলে নিয়েছেন।"

নবী ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, যার অর্থ হত্যা করা, এই ভ্রান্ত খ্রিস্টান বিশ্বাস সহজাতভাবেই অদ্ভুত, কারণ একজন প্রকৃত ঐশ্বরিক সত্তা মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে। যদি কোন সত্তা মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম হয়, তবে তাকে ঐশ্বরিক বলে বিবেচনা করা যায় না। অতএব, ক্রুশবিদ্ধকরণের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাস স্বভাবতই তাঁর ঐশ্বরিকতার প্রতি তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরোধিতা করে।

একটি ঐশ্বরিক সত্তা, তার স্বভাবগতভাবেই, স্বয়ংসম্পূর্ণতা দ্বারা চিহ্নিত, যা ইঙ্গিত করে যে এটি জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে না। যদি কোন সত্তা তার অস্তিত্বের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে তাকে ঐশ্বরিক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মা মরিয়ম (আঃ) উভয়ই ঐশ্বরিক সত্তা ছিলেন না, কারণ তারা পুষ্টির জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করেছিলেন, যার অর্থ হল তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা ছিলেন না। অধ্যায় ৫ আল মায়িদা, আয়াত ৭৫:

"মরিয়মপুত্র মসীহ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না; তাঁর পূর্বে আরও রসূল গত হয়ে গেছেন। আর তাঁর মা ছিলেন সত্যবাদী। তাঁরা দুজনেই খাবার খেতেন। দেখো, আমি কীভাবে তাদের কাছে নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করি; তারপর দেখো, কীভাবে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে।"

অধিকন্তু, এটাও বলা যায় না যে, ফেরেশতাদের, তাদের ভোগের অভাবের কারণে, দেবতা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, তাদেরও আল্লাহ তাআলা দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, যদিও একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে, তাই তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাদের সৃষ্টির অস্তিত্ব এবং অন্যান্য সকল প্রাণীর মতো তাদের মৃত্যুর অনিবার্যতাই তাদের দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

একজন জৈবিক বংশধরের অবশ্যই তাদের পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে। তবে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে, তিনি মহান আল্লাহর কোন গুণাবলী প্রদর্শন করেন না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্য মানবজাতির জন্য সাধারণ। তিনি খাদ্য ও জল দ্বারা জীবিত হয়েছিলেন এবং অন্যান্য সকল মানুষের মতো মৃত্যু ও পুনরুত্থান অনুভব করবেন। তাঁর গুণাবলী ঈশ্বরত্বের যেকোনো ধারণাকে যথেষ্টভাবে খণ্ডন করে।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানরা তাদের বিশ্বাস ব্যবস্থায় নবী ঈসা (আঃ)-কে ঐশ্বরিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে, যা তারা তাদের পূর্ববর্তী ধর্ম, পৌত্তলিকতা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। তারা জিউস, হারকিউলিস এবং ওডিনের মতো কিংবদন্তি এবং পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি একজন মহৎ ও শ্রদ্ধেয় পবিত্র নবী (সাঃ)-কে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে। কেবলমাত্র সামান্য সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় যে, যে সত্তা অন্যের দ্বারা সৃষ্ট, রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়, সে সত্তা ঐশ্বরিক হতে পারে না, কারণ এই গুণাবলী মৌলিকভাবে ঐশ্বরিক সত্তার সারাংশের সাথে সাংঘর্ষিক।

মহানবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, অসংখ্য খ্রিস্টান তাঁর সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাসে আঁকড়ে আছেন। এই অদ্ভুত

আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল তাদের বড়দের সমালোচনাহীন অনুকরণ। এই ধরনের অন্ধ অনুকরণ ব্যক্তিদের জ্ঞান ও প্রমাণ মূল্যায়ন করতে বাধা দেয়, সেইসাথে তাদের লালন-পালনের সময় তাদের মধ্যে প্রদত্ত বিশ্বাস ও অনুমান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা থেকেও বিরত রাখে। এই অবস্থান ইসলামের নীতি এবং যুক্তিবাদী চিন্তার সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ মানুষকে পশুপালের মতো আচরণ করার পরিবর্তে সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, অন্যদের অচিন্তনীয় অনুকরণ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য, কারণ এটি বিপথগামীতার একটি প্রাথমিক কারণ। পরিবর্তে, ব্যক্তিদের তাদের যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা ব্যবহার করে জ্ঞান ও প্রমাণ মূল্যায়ন করা উচিত, যা তারা সম্মুখীন হয়, ধর্মনিরপেক্ষ হোক বা ধর্মীয়, এবং পরবর্তীতে সুবিবেচনাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এমনকি ইসলামের মধ্যেও, অন্ধ অনুকরণ নিন্দিত, কারণ মহান আল্লাহ চান যে ব্যক্তিরা কেবল অন্যান্য মুসলমানদের কর্ম অনুসরণ করার পরিবর্তে বোধগম্যতার উপর ভিত্তি করে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করুক, বুঝতে পারুক এবং বাস্তবায়ন করুক। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

আল্লাহর রাসূল হিসেবে তাঁর প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, খ্রিস্টানরা কেন নবী ঈসা (আঃ)-এর প্রতি তাদের বিশ্বাসে অটল থাকে তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার আকাঙ্ক্ষা। অসংখ্য খ্রিস্টীয় শিক্ষা খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের জন্য উভয় জগতেই মুক্তির ধারণা প্রচার করে, তাদের কর্ম নির্বিশেষে। এই বিশ্বাস ব্যবস্থা তাদের উভয় জগতেই তাদের মুক্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করার অনুমতি দেয়। ফলস্বরূপ, তারা তাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে সমর্থন করে, কারণ এই জীবনে তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হল তাদের পার্থিব লক্ষ্য অর্জন করা, বরং এমন একটি

উচ্চতর নৈতিক মান মেনে চলা যা তাদেরকে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আশীর্বাদের যথাযথ ব্যবহারে পরিচালিত করবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১০২:

"তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি সবকিছুর স্রষ্টা..."

ইসলাম মানবজাতিকে নির্দেশ দেয় যে, সকল পরিস্থিতিতে আনুগত্যের যোগ্য একমাত্র সত্তা হলেন তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক, মহান আল্লাহ। প্রকৃতপক্ষে, জীবনে যে সত্তার আনুগত্য করা উচিত, তিনিই তাদের উপাসনার বিষয়, তা সে কোনও দেবতার প্রতি অবিশ্বাসের দাবি নির্বিশেষে। মানুষ সহজাতভাবে এমন কিছু অনুসরণ এবং মেনে চলার জন্য তৈরি, তা সে অন্য ব্যক্তি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, প্রবণতা, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, এমনকি তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাই হোক না কেন। ২৫তম অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

একজন ব্যক্তি যে সত্তা বা ব্যক্তিকে আনুগত্য করতে পছন্দ করেন তা তাদের ইবাদতের পরিচায়ক। ফলস্বরূপ, মুসলমানদের তাদের ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি এমন কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য প্রদর্শন করে, সর্বোপরি তাঁর আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেয়। এর অর্থ হল তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। যারা এইভাবে আচরণ করে তারা উভয় জগতেই শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

বিপরীতে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে এবং অন্য সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করতে পছন্দ করে, সে ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপরিহার্য রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। এটি সত্য, এমনকি যদি তারা সমস্ত পার্থিব সম্পদের মালিক হয় এবং ক্ষণস্থায়ী আনন্দ ও আমোদে লিপ্ত হয়, কারণ শেষ পর্যন্ত, কেউই মহান আল্লাহর রাজত্ব ও সার্বভৌমত্বকে এড়াতে পারে না। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় কেন উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১০২:

"তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি সবকিছুর স্রষ্টা..."

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর গঠন, এবং অসংখ্য সুনির্দিষ্টভাবে ক্যালিব্রেটেড সিস্টেম পরীক্ষা করলে, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে একজন একক স্রষ্টা আছেন যিনি কেবল মহাবিশ্ব তৈরিই করেননি বরং রক্ষণাবেক্ষণও করেন। উদাহরণস্বরূপ, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে আদর্শ দূরত্ব একটি জোরালো ইঙ্গিত হিসেবে কাজ করে; সূর্যকে আরও কিছুটা কাছে বা আরও দূরে স্থাপন করা হলে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠত। একইভাবে, পৃথিবীকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং

নির্মল বায়ুমণ্ডলকে লালন করে, যার ফলে এতে জীবন বিকশিত হতে পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... *এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন..."*

দিন ও রাতের সঠিক সময় নির্ধারণ, এবং সারা বছর ধরে তাদের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন, ব্যক্তিদেরকে তাদের থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম করে। যদি দিন দীর্ঘ হয়, তাহলে ব্যক্তিরা দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্লান্তি অনুভব করবে। বিপরীতে, যদি রাত দীর্ঘ করা হয়, তাহলে ব্যক্তিরা তাদের জীবিকা নির্বাহ এবং জ্ঞান অর্জনের মতো অন্যান্য মূল্যবান প্রচেষ্টা অনুসরণ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় খুঁজে পেতে লড়াই করবে। ছোট রাতের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ থাকবে না, যা সর্বোত্তম স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য। দিন ও রাতের সময়কালের পরিবর্তন কৃষি উৎপাদনের উপরও প্রভাব ফেলবে, যা মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। মহাবিশ্বের মধ্যে দিন, রাত এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার সুসংগত ক্রিয়াকলাপ মহান আল্লাহর একত্বের স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে কাজ করে, কারণ একাধিক দেবতার অস্তিত্বের ফলে পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষা তৈরি হবে, যা শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে। অধ্যায় ২১ আল আম্বিয়া, আয়াত ২২:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... *এবং [বড়] জাহাজ যা সমুদ্রে চলাচল করে যা মানুষের উপকার করে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন..."*

অনবদ্য ভারসাম্যপূর্ণ জলচক্র পর্যবেক্ষণ একজন স্রষ্টার স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবে কাজ করে। সমুদ্র থেকে জল বাষ্পীভূত হয়, উপরে উঠে যায় এবং পরবর্তীতে ঘনীভূত হয়ে পাহাড়ের উপর পড়ে অল্পীয় বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। এই পর্বতগুলি অল্পীয় বৃষ্টিপাতকে নিরপেক্ষ করার জন্য কাজ করে, যা এটিকে মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। এই নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থায় যেকোনো পরিবর্তন পৃথিবীর সমস্ত জীবের জন্য বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে আনবে। সমুদ্রে উপস্থিত লবণ জলকে দূষিত করে সামুদ্রিক জীবের পচনকে বাধা দেয়। যদি সমুদ্র দূষিত হয়ে যায়, তাহলে সামুদ্রিক জীবনের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে এবং এর ফলে সৃষ্ট অমেধ্য স্থলজ জীবনের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলবে। মহাসাগর এবং সমুদ্রের পানির গঠন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রকে সমর্থন করা যায় এবং একই সাথে বৃহৎ জাহাজগুলিকে এর পৃষ্ঠে চলাচল করতে দেওয়া যায়। জলের গঠনে সামান্য তারতম্য এই ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে, যার ফলে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যেখানে হয় সামুদ্রিক প্রাণীর বিকাশ ঘটে অথবা জাহাজগুলি জলের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, তবে উভয়ই একই সাথে নয়। আজও, পণ্যের বিশ্বব্যাপী চলাচলের জন্য সামুদ্রিক পরিবহন প্রধান পদ্ধতি হিসেবে রয়ে গেছে। সুতরাং, এই গ্রহে জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য এই নিখুঁত ভারসাম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিবর্তন এক ধরণের মিউটেশনকে প্রতিনিধিত্ব করে, যার স্বভাবতই অসম্পূর্ণতা দ্বারা চিহ্নিত। তবে, অসংখ্য প্রজাতি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তাদের অসাধারণ ভারসাম্যপূর্ণভাবে বিকশিত করা হয়েছে, যা তাদের নিজ নিজ পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উটকে চরম তাপমাত্রা সহ্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং জল গ্রহণ ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকতে পারে। তারা মরুভূমিতে জীবনের জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত। অধ্যায় ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ১৭:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ছাগলটিকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে তার শরীরে উপস্থিত যেকোনো দূষিত পদার্থ এটি উৎপন্ন দুধ থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করা হয়েছে। এই দুটি পদার্থের মিশ্রণ দুধকে খাওয়ার অনুপযুক্ত করে তুলবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৬৬:

"আর অবশ্যই, তোমাদের জন্য পশুপালনের ক্ষেত্রে একটি শিক্ষা রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে - মলমূত্র ও রক্তের মধ্যে - বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

প্রতিটি প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল নির্ধারিত হয় যা যেকোনো একটি প্রজাতিকে অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ,

মাছিদের আয়ুষ্কাল উল্লেখযোগ্যভাবে 3-4 সপ্তাহের এবং তারা 500টি পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। যদি তাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ করা হয়, তাহলে মাছির সংখ্যা অত্যধিক হয়ে যেতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য সমস্ত প্রজাতির উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। বিপরীতে, উল্লেখযোগ্যভাবে দীর্ঘ আয়ুষ্কাল সম্পন্ন অন্যান্য জীব কেবল সীমিত সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করে। এই বৈশিষ্ট্যটি তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আরও অবদান রাখে। এই ধরনের ঘটনাকে দৈব ঘটনা হিসেবে দায়ী করা যায় না, এবং বিবর্তন তত্ত্ব দ্বারা এটিকে পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"... *এবং [তাঁর] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস এবং মেঘের পরিচালনা..."*

বায়ু পরাগায়নে বায়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা ফসল, গাছপালা এবং গাছের প্রজননকে সক্ষম করে। ঐতিহাসিকভাবে, সামুদ্রিক নৌ চলাচলের জন্য বায়ু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা আজও বিশ্বব্যাপী পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে রয়ে গেছে। বৃষ্টির মেঘগুলিকে নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থানান্তরিত করার জন্য বাতাস অপরিহার্য, যা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করে। পৃথিবীতে বাতাসের একটি সুসংগত ব্যবস্থা স্পষ্ট; বাতাসের অনুপস্থিতি জীবনের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে অতিরিক্ত বাতাস একইভাবে ভারসাম্যকে ব্যাহত করবে। একইভাবে, বৃষ্টিপাতও একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখে; অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত খরা এবং দুর্ভিক্ষের কারণ হতে পারে, অন্যদিকে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ভয়াবহ বন্যার কারণ হতে পারে। অধ্যায় ২৩ আল মু'মিনুন, আয়াত ১৮:

"আর আমরা আকাশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। এবং অবশ্যই, আমরা তা প্রত্যাহার করতে সক্ষম।"

এই অনবদ্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে দৈবক্রমে দায়ী করা যায় না এবং এটি স্পষ্টভাবে একজন স্রষ্টার প্রভাব প্রকাশ করে। যে কেউ এই অনবদ্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাগুলি বিবেচনা করে, সে যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন একজন একক স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না যিনি সমস্ত সত্তার উপর কর্তৃত্ব রাখেন।

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, আয়াত ২:

" *আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ..."*

প্রকৃতপক্ষে, যে সত্তা মৃত্যুবরণ করতে পারে এবং জীবিকার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে, তাকে উপাস্য হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এই সত্যটি স্বর্গ ও পৃথিবীর সকল প্রাণীর জন্য দেবত্বকে বাদ দেয়, কেবল আল্লাহ ছাড়া। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০২:

"তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি সবকিছুর স্রষ্টা, অতএব তাঁরই উপাসনা করো..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র স্রষ্টা এবং সকল সৃষ্টির পালনকর্তা, তাই তিনিই একমাত্র আনুগত্যের যোগ্য। যে ব্যক্তি অন্যের কিছু চাহিদা পূরণ করে, যেমন বাসস্থান, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার যোগ্য, তবে মানুষ কেবল মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যিনি এই বিশ্বজগতে তাদের উপর সমস্ত আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন। নিয়তে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কর্ম সম্পাদন করা বোঝায়। যারা অন্য উদ্দেশ্যে কাজ করে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না, যেমনটি জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে লিপিবদ্ধ একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে। আন্তরিক নিয়তের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত হল যে একজন ব্যক্তি অন্যদের কাছ থেকে কোনও স্বীকৃতি বা পুরষ্কার কামনা করে না বা প্রত্যাশা করে না। মৌখিক কৃতজ্ঞতা বলতে ইতিবাচক শব্দ উচ্চারণ করা বা নীরবতা বেছে নেওয়া বোঝায়, অন্যদিকে কর্মের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা বলতে বোঝায় যে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা অনুসারে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য প্রাপ্ত আশীর্বাদগুলিকে কাজে লাগানো। তাঁর উপর বরকত ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এই অভ্যাস আশীর্বাদ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে এবং পরিণামে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক শান্তি বর্ধন করে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"... যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের [অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

অধিকন্তু, যখন কোন ব্যক্তির কোন জিনিস থাকে, তখন সেই জিনিসটি তার ইচ্ছামত ব্যবহার করা তার জন্য উপযুক্ত এবং প্রথাগত বলে মনে করা হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ, মানবজাতি সহ মহাবিশ্বে বিদ্যমান সবকিছুর স্রষ্টা, মালিক এবং প্রতিপালক, তাই তিনিই মহাবিশ্বের মধ্যে কী ঘটবে এবং কী ঘটবে না তার একমাত্র কর্তৃত্বকারী। অতএব, একজন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ, মহিমান্বিতের সাথে মেনে চলা ন্যায়সঙ্গত, কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের একচেটিয়া মালিক, যা তাদেরকে ঘিরে রেখেছে।

একইভাবে, যখন একজন ব্যক্তি তার মালিকানাধীন কোন জিনিস অন্য কাউকে ধার দেন, তখন ঋণগ্রহীতা কেবল মালিকের ইচ্ছানুযায়ী জিনিসটি ব্যবহার করেন। মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির প্রতিটি আশীর্বাদ স্থায়ী উপহার হিসেবে নয় বরং অস্থায়ী ঋণ হিসেবে দান করেছেন। পার্থিব ঋণের মতো, এই ঐশ্বরিক ঋণ পরিশোধের প্রয়োজন হয়। এই ঋণ পরিশোধের একমাত্র পদ্ধতি হল এই আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। বিপরীতভাবে, যেহেতু জান্নাতের আশীর্বাদগুলিকে উপহার হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাই ব্যক্তিরা তাদের ইচ্ছামত তা উপভোগ করার স্বাধীনতা পাবে। অধ্যায় ৭ আল আ'রাফ, আয়াত ৪৩:

"...এবং তাদেরকে বলা হবে, "এটি সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ তোমাদের কর্মের জন্য।"

জান্নাতের ঐশ্বরিক উপহারের সাথে কেবল ঋণ হিসেবে থাকা পার্থিব সুবিধাগুলিকে একত্রিত করা উচিত নয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, সঠিকভাবে পরিচালিত হবে, যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। সূরা 6 আল আন'আম, আয়াত 102:

"... তাই তাঁরই ইবাদত করো। আর তিনিই সবকিছুর কর্তৃত্বকারী।"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে মনের শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও মহান আল্লাহ তাআলা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্যকারীদের উভয় জগতেই মানসিক প্রশান্তির দিকে পরিচালিত করেন, তবুও এর অর্থ এই নয় যে তারা এই পৃথিবীতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হবে না, কারণ এটি

এই পৃথিবীর জীবনের পরীক্ষার একটি অংশ। বরং, যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করেন, তাদের সকল অসুবিধা এবং পরিস্থিতি অতিক্রম করার শক্তি প্রদান করা হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ তাআলা সর্বদা প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেবেন, এমনকি যদি তারা তাঁর পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে ব্যর্থ হয়। সূরা 6 আল আন'আম, আয়াত 103:

"দৃষ্টি তাঁকে উপলব্ধি করে না, কিন্তু তিনি [সমস্ত] দৃষ্টি উপলব্ধি করেন..."

অতএব, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দার জন্য সর্বোত্তম জিনিসটিই বেছে নেন তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে, মানুষের ইচ্ছা অনুসারে নয়, কারণ তারা প্রায়শই এমন জিনিস কামনা করে যা তাদের জন্য ভালো নয়। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০৩:

"...এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।"

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা তাঁর আনুগত্যের প্রতি দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে যে তিনি তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়।

অন্যদিকে, যারা আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রেখে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এই শক্তি অর্জন করবে না এবং ফলস্বরূপ, তারা প্রতিটি পরিস্থিতি এবং কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। ফলস্বরূপ , তারা নিজেদেরকে মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্যহীনতার মধ্যে দেখতে পাবে, যার ফলে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেকের অবস্থান ভুল হয়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে, যদিও তারা যেকোনো পার্থিব বিলাসিতা অনুভব করতে পারে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১০২:

"তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, অতএব তাঁরই উপাসনা করো। তিনি সকল কিছুর কর্তৃত্বকারী।"

ফলস্বরূপ, ব্যক্তিদের নিজেদের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে, এমনকি যখন এই শিক্ষাগুলি তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের চিকিৎসকের চিকিৎসা নির্দেশনা গ্রহণ করেন এবং অনুসরণ করেন, বুঝতে পারেন যে এটি তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে, অপ্রীতিকর ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস নির্ধারণ করা সত্ত্বেও। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী সর্বোত্তম মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও হবেন। এর কারণ হল, কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালাই একজন ব্যক্তির একটি সুসংগত মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে যথাযথভাবে সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী। সমাজের মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার বোধগম্যতা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, পরিচালিত বিস্তৃত গবেষণা নির্বিশেষে, কারণ এটি একজন ব্যক্তির জীবনে সম্মুখীন হওয়া প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে না; তাদের নির্দেশনা সকল ধরণের মানসিক এবং শারীরিক চাপ প্রতিরোধ করতে পারে না, এবং জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং অন্তর্নিহিত পক্ষপাতের সীমাবদ্ধতার কারণে এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে অবস্থান করতে সক্ষম করতে পারে না। এই জ্ঞান কেবল মহান আল্লাহ তাআলারই আছে, যা তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতিকে দান করেছেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০৪:

" তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জ্ঞান এসেছে। অতএব যে ব্যক্তি দেখতে পায় সে তার আত্মার জন্যই তা করে, আর যে অন্ধ সে তার ক্ষতি করে..."

এই বাস্তবতা তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ লক্ষ্য করে যে যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রাপ্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। যদিও অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা তাদের জন্য নির্ধারিত ওষুধের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক নীতিগুলি বুঝতে পারে না এবং এইভাবে তারা প্রশ্ন ছাড়াই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধ বিশ্বাস করে, তবুও, মহান আল্লাহ ব্যক্তিদের ইসলামের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করেন যাতে তারা তাদের জীবনে এর উপকারী প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি ব্যক্তিদের প্রশ্ন ছাড়াই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন না; বরং, তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে এর সত্যতা স্বীকার করুক। তবে, এর জন্য একজন ব্যক্তির নিরপেক্ষ এবং উন্মুক্ত মানসিকতার সাথে ইসলামের শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এখন যেহেতু ঐশ্বরিক বার্তা এবং নিখুঁত আদর্শ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তাই মানুষ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে তারা তাদের দেওয়া ঐশ্বরিক আচরণবিধি গ্রহণ করবে, নাকি তা উপেক্ষা করবে। যেভাবেই হোক, তাদের কর্মের পরিণতি তাদের ভোগ করতে হবে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০৪:

"... এবং [বলুন], "আমি তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নই।"

সাধারণভাবে, এটি এই বিষয়টি বোঝার গুরুত্বকে তুলে ধরে যে, একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাস অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়। বরং, তাদের উচিত ইসলামী শিক্ষায় বিদ্যমান জ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রকাশিত সত্য প্রকাশ করা, যার ফলে ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। একইভাবে, পার্থিব বিষয়ে, জ্ঞান এবং প্রমাণের উপর ভিত্তি করে পরামর্শ এবং ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত, একই সাথে অন্যদের উপর তাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। অতএব, ধর্মীয় এবং পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একজন মুসলিমের ভূমিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এর ফলে অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব এবং চাপ তৈরি হতে পারে। অধ্যায় ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ২১-২২:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দাও যে তুমি কেবল একটি স্মরণ করিয়ে দাও। তুমি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নও।"

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১০৪:

" তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জ্ঞান এসেছে। অতএব যে ব্যক্তি দেখতে পায় সে তার আত্মার জন্যই তা করে, আর যে অন্ধ সে তার ক্ষতি করে..."

কিন্তু যারা কেবল তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করতে চায়, তারা সর্বদা ইসলামী শিক্ষা উপেক্ষা করার এবং অন্যদেরকে তাদের সামাজিক প্রভাব এবং নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর কাজ করা থেকে নিরুৎসাহিত করার অজুহাত খুঁজে পাবে, ঠিক যেমনটি মক্কার অমুসলিমদের নেতারা করেছিলেন। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০৫:

" আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করি এবং ব্যাখ্যা করি যাতে তারা বলে, "তুমি পাঠ করেছ,"..."

এই বক্তব্যটি অযৌক্তিক ছিল, কারণ মক্কার অমুসলিমরা আরবি ভাষায় দক্ষ ছিল এবং বুঝতে পারত যে পবিত্র কুরআন কোনও সৃষ্ট সত্তার উচ্চারণ নয়। অধিকন্তু, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়ত ঘোষণার আগে চল্লিশ বছর তাঁর সাথে কাটিয়ে তারা বুঝতে পেরেছিল যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১৬:

"... কারণ আমি এর আগে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারবে না?"

আহলে কিতাব এবং মক্কায় বসবাসকারী অমুসলিম উভয়ই জানত যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেননি। ফলস্বরূপ, তিনি এই পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলির পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত মতবাদগুলির সাথে পরিচিত হতে

পারেননি, যা পবিত্র কুরআনের ঐশী উৎপত্তির অতিরিক্ত প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৮:

"আর তুমি এর আগে কোন কিতাব পাঠ করোনি এবং তোমার ডান হাতে কোন কিতাব লিখে রাখোনি। তাহলে [অর্থাৎ, অন্যথায়] মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কারণ হত।"

মক্কার অমুসলিম নেতাদের মধ্যে যারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা গ্রহণ এবং মেনে চলা অসহনীয় বলে মনে হয়েছিল, যিনি এতিম হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে সম্মানিত গোত্র থেকে এসেছিলেন। ক্ষমতা, আধিপত্য এবং সম্পদের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের ঈর্ষাকে আরও বাড়িয়ে তোলে যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তাঁকে সমস্ত সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

কিন্তু যারা ইসলামের শিক্ষাকে খোলামেলা ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে গ্রহণ করে, তারা এর ব্যাপক উপকারিতা লক্ষ্য করবে, যেমন একজন ব্যক্তি এবং সমগ্র সমাজকে উভয় জগতে ন্যায়বিচার এবং মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করা। ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ১০৫:

"...এবং যাতে আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এটি [অর্থাৎ সত্য] স্পষ্ট করে দিতে পারি।"

এরা হলো সেইসব মানুষ যারা স্বেচ্ছায় ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে, এমনকি যদি তাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে সাংঘর্ষিকও হয়। তারা বোঝে যে, মনের ও শরীরের প্রশান্তি অর্জনের জন্য নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা একটি ক্ষুদ্র ত্যাগ, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সর্বোত্তম শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য তাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০৬:

"তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার অনুসরণ করো, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই.."

অতএব, যে ব্যক্তি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি কামনা করে, তাকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে প্রতিটি পরিস্থিতিতে কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। এটি তাদের মন এবং শরীরের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করবে, তাদের জীবনের সমস্ত উপাদান এবং মানুষকে একত্রিত করবে এবং একই সাথে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতেই শান্তির দিকে পরিচালিত করবে।

এছাড়াও, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন একজন ব্যক্তি তার সমসাময়িকদের থেকে ভিন্ন পথ বেছে নেয়, তখন অন্যদের মধ্যে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অযোগ্যতার অনুভূতি জাগিয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে যদি সেই সিদ্ধান্তগুলি মহান আল্লাহর শিক্ষা মেনে চলার পরিবর্তে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেয়।

ফলস্বরূপ, এটি তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে প্রায়শই তাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকা ব্যক্তিদের সমালোচনার কারণ হতে পারে।

অধিকন্তু, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন ট্রেন্ড এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মতো সামাজিক প্রভাবগুলি প্রায়শই ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইসলামের পক্ষে প্রচারণা প্রায়শই তাদের সম্পদ এবং সামাজিক অবস্থানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হিসেবে দেখা হয়। ইসলাম যেসব শিল্পের সমালোচনা করে, বিশেষ করে মদ এবং বিনোদনের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলি সক্রিয়ভাবে ইসলামী নীতির গ্রহণযোগ্যতার বিরুদ্ধে কাজ করে এবং মুসলমানদের তাদের ধর্ম মেনে চলা থেকে বিরত রাখে। এই পরিবেশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ইসলাম-বিরোধী আখ্যানের ব্যাপক প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যখন ব্যক্তিরা ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করার চেষ্টা করে যা সংযম এবং তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদের যথাযথ ব্যবহারের পক্ষে কথা বলে, তখন যারা কেবল তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে মনোনিবেশ করে তারা ইসলাম এবং এর অনুসারীদের সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, ইসলামকে তাদের পশুত্বপূর্ণ করে তোলে বলে মনে করে। ফলস্বরূপ, তারা অন্যদের ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে পারে এবং মুসলমানদের তাদের ধর্মীয় অনুশীলনে সম্পূর্ণরূপে জড়িত হতে নিরুৎসাহিত করতে পারে, তাদেরকে অসংযত আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চিহ্নিত জীবনযাত্রার দিকে প্রলুব্ধ করে। তারা প্রায়শই ইসলামের বিশেষ উপাদানগুলিকে লক্ষ্য করে, যেমন মহিলাদের জন্য পোশাক কোড, এর আকর্ষণ হ্রাস করার প্রচেষ্টায়। তবুও, বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকরা সহজেই তাদের সমালোচনার বাহ্যিকতা সনাক্ত করতে পারেন, যা আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর ইসলামের জোর প্রত্যাখ্যান থেকে উদ্ভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা মহিলাদের জন্য ইসলামী পোশাক কোডের সমালোচনা করতে পারে, তবে তারা আইন প্রয়োগকারী, সামরিক, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা

এবং ব্যবসায়ের মতো ক্ষেত্রে পোশাক কোডগুলিকে একই কঠোর পরীক্ষার আওতায় আনে না। অন্যান্য পোশাক কোড সম্পর্কে তাদের নীরবতার সাথে ইসলামী পোশাক কোডের এই নির্বাচনী সমালোচনা তাদের যুক্তির ভঙ্গুরতা এবং ভিত্তিহীনতা প্রকাশ করে। পরিশেষে, ইসলাম এবং এর অনুসারীরাই তাদের পশুসুলভ প্রবণতা প্রকাশ করে, যা তাদেরকে যেকোনো উপায়ে ইসলামের সমালোচনা করতে প্ররোচিত করে।

এ ধরণের ক্ষেত্রে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মানুষের অধিকার পূরণ করতে হবে কিন্তু এ ধরণের লোকদের সাথে সঙ্গ এড়িয়ে চলতে হবে, অন্যথায় তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য থেকে বিরত থাকবে এবং তারা অনিবার্যভাবে তাদের সাথীদের মানসিকতা গ্রহণ করবে। সুনান আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০৬:

"...এবং আল্লাহর সাথে শিরককারীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।"

যদিও মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগতকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তবুও তিনি মানুষের উপর হেদায়েত চাপিয়ে দেন না, কারণ এতে এই পৃথিবীর জীবনের উদ্দেশ্যই বাতিল হয়ে যাবে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০৭:

"কিন্তু যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে তারা শিরক করত না..."

প্রতিটি ব্যক্তিকে সঠিক নির্দেশনা চিনতে, গ্রহণ করতে এবং তার উপর কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জীবনে নিজস্ব পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অতএব, জীবনে সঠিক পথ বেছে নিতে জোর করে কাউকে বাধ্য করা উচিত নয়, অথবা যারা স্বেচ্ছায় ভুল পথ বেছে নেয় তাদের জন্য শোক করা উচিত নয়। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১০৭:

"... আর আমরা তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিনি, আর তুমি তাদের উপর ব্যবস্থাপকও নও।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটি এই স্বীকৃতির তাৎপর্য তুলে ধরে যে একজন মুসলিমের দায়িত্ব তাদের মতামত বা বিশ্বাস অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত ইসলামী শিক্ষায় প্রাপ্ত জ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রমাণের দ্বারা পরিচালিত সত্য প্রকাশ করা, যার ফলে ব্যক্তিদের জীবনের নিজস্ব পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। একইভাবে, ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ে, জ্ঞান এবং প্রমাণের ভিত্তিতে পরামর্শ এবং ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত, একই সাথে অন্যদের উপর তাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। অতএব, ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় প্রেক্ষাপটেই নিয়ন্ত্রণমূলক মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা অপরিহার্য, কারণ এটি একজন মুসলিমের ভূমিকার সাথে সাংঘর্ষিক এবং অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব এবং চাপের কারণ হতে পারে। অধ্যায় ৪৪ আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দাও যে তুমি কেবল একটি স্মরণ করিয়ে দাও। তুমি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নও।"

উপরন্তু, অন্যদের সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করার সময়, তাদের অবশ্যই অন্যদের বিশ্বাসকে অপমান করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ তাদের রাগানো কেবল তাদের সঠিক পথ থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১০৮:

" আর তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ডাকে, তাদেরকে গালি দিও না, পাছে তারা শত্রুতাবশত অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দেয়..."

অতএব, অন্যদের সঠিক নির্দেশনার দিকে উৎসাহিত করার আগে, একজনকে অবশ্যই ভদ্র আচরণ এবং সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অন্যথায়, তারা কেবল তাদের সত্য থেকে নিরুৎসাহিত করবে। সঠিক নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য নিজের অভ্যাস, রীতিনীতি এবং আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করা একটি কঠিন কাজ কারণ এই জিনিসগুলি মানুষের কাছে প্রিয়। ষষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ১০৮:

"...এইভাবে আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য তাদের কাজকর্মকে মনোরম করে দিয়েছি..."

অতএব, সঠিক পথের দিকে আহ্বান করার সময় সঠিক চরিত্র গ্রহণ করা উচিত। যদিও এই পৃথিবীতে মানুষের নিজস্ব পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে, তবুও,

প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০৮:

"...অতঃপর তাদের প্রতিপালকের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন, এবং তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যদেরকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করার সময়, বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য নিজেদের প্রস্তুতিকে অবহেলা করা উচিত নয়। তাদের এমন মোমবাতির মতো আচরণ করা উচিত নয়, যা নিজে জ্বলে ওঠার সময় অন্যদের আলো দেয়।

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কেবল এই পৃথিবীতে তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করতে চায় তারা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করা থেকে বিরত থাকার জন্য অজুহাত দেখাবে এবং অন্যদেরও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করা থেকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করবে, কারণ তারা তাদের সামাজিক প্রভাব এবং নেতৃত্ব হারানোর ভয় পাবে, ঠিক যেমন মক্কার অমুসলিমদের নেতারা করেছিলেন। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১০৯:

"আর তারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলে যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তাহলে তারা অবশ্যই তাতে বিশ্বাস করবে..."

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছ থেকে অলৌকিক ঘটনা দাবি করতেন, আর যখন তাদের তা থেকে বিরত রাখা হত, তখন তারা ইসলামের সত্যতার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে এটি ব্যবহার করতেন। তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অলৌকিক ঘটনা দাবি করতেন, যদিও দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা তাদের সামনে সর্বদা বিদ্যমান ছিল: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র। আল্লাহ তাদের দাবি পূরণে তাদের প্ররোচিত করেননি কারণ তিনি জানতেন যে তিনি যদি তাদের অলৌকিক ঘটনা দেখান তবে তারা বিশ্বাস করবে না। আল্লাহর রীতি কখনও পরিবর্তিত হয়নি। যখন আল্লাহ, মহিমান্বিত, একটি অলৌকিক ঘটনা দেখান যা একটি জাতি দাবি করে এবং তারপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, তখন তিনি জাতিকে ধ্বংস করেন। যেহেতু আল্লাহ, মক্কার অলৌকিক ঘটনা ধ্বংস করতে চাননি, তাদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ঐশ্বরিক বার্তার পতাকাবাহী হয়ে উঠবে, তাই তিনি তাদের অলৌকিক ঘটনা দেখানো থেকে বিরত ছিলেন। সূরা 6 আল-আন'আম, আয়াত 109:

"... বলুন, "নিদর্শন তো কেবল আল্লাহর কাছেই আছে।" আর তুমি কি বুঝতে পারবে যে, যদি কোন নিদর্শন আসে, তবুও তারা বিশ্বাস করবে না।"

যেহেতু তারা ইতিমধ্যেই ইসলামকে অবিশ্বাস করার মনস্থির করে ফেলেছিল, তাই তারা মহান আল্লাহ তাদের যে কোনও অলৌকিক ঘটনা দেখাতেন তা প্রত্যাখ্যান করত। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১১০:

"আর আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেব, যেমন তারা প্রথমবারে এতে বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল..."

আল্লাহ, মহান, সঠিক পথনির্দেশনা গ্রহণের অক্ষমতাকে নিজের উপর আরোপ করেছেন, কারণ তাঁর সম্মতি এবং ইচ্ছা ছাড়া মহাবিশ্বে কিছুই ঘটে না। যাইহোক, এই আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এই ফলাফল সরাসরি তাদের নিজস্ব স্বভাব থেকে উদ্ভূত হয়েছে যারা ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণগুলিকে উপেক্ষা করে চলেছে এবং অন্যদের তা গ্রহণ করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। যেহেতু আল্লাহ, মহান, ব্যক্তিদের উপর সঠিক পথনির্দেশনা চাপিয়ে দেন না, যখন তারা সত্যের প্রতি তাদের মন বন্ধ করে দেয় কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক, তিনি তাদের মন এবং আধ্যাত্মিক হৃদয়কে সত্য বোঝা এবং গ্রহণ করার জন্য বন্ধ করে দেন। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১১০:

"...এবং আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেব।"

এই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখবে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক ও শারীরিক সামঞ্জস্যের অভাব অনুভব করবে, তাদের মনোভাব তাদের সম্পর্ক এবং দায়িত্বগুলিকে ব্যাহত করবে, যা শেষ পর্যন্ত বিচারের দিনে জবাবদিহিতার জন্য তাদের প্রস্তুতিকে বাধাগ্রস্ত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং সংগ্রামের সৃষ্টি হবে, তারা যে কোনও পার্থিব আনন্দ উপভোগ করুক না কেন। মহান আল্লাহ আরও জোর দিয়ে বলেন যে যারা ইসলামী শিক্ষার প্রতি তাদের মনকে আবদ্ধ করে রাখে, কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, তারা এতে বিশ্বাস করবে না বা কাজ করবে না, এমনকি

যদি তাদের কাছে অপ্রতিরোধ্য অলৌকিক ঘটনাও উপস্থিত করা হয়। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১১১:

"আর যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করতাম এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বলত এবং তাদের সামনে সমস্ত কিছু একত্রিত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনত না যদি না আল্লাহ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।"

যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের উপর সঠিক নির্দেশনা জোর করে চাপিয়ে দেন না, কারণ এটি এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত করবে, তাই যদি মানুষ ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণ উপেক্ষা করে তবে তাকে দুর্দশার জীবনে পরিত্যক্ত করা হবে। অতএব, যদি তারা ইসলামের সত্যতা এবং ব্যাপক উপকারিতা স্বীকার করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাস গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে। পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই একটি খোলা এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে এর শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের ফলে ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করা যায় এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি পার্থিব বিষয়েও কেউ সঠিক নির্দেশনা পেতে পারে না যতক্ষণ না তারা প্রতিটি পরিস্থিতিকে একটি খোলা এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করে এবং প্রমাণ ও জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিটি পরিস্থিতির বিচার করে।

যেহেতু এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষায় অসুবিধা এবং বাধা জড়িত, তাই কখনই এমন সরল মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয় যেখানে তারা ধরে নেবে যে সমস্ত মানুষ কেবল ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণগুলি স্বীকৃতি দেবে এবং তাই এটি গ্রহণ করবে এবং তার উপর কাজ করবে। কেবলমাত্র বিশাল সংখ্যক মানুষ ধূমপান এবং

অ্যালকোহলের সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি গ্রহণ করে, তার অর্থ এই নয় যে বিশাল সংখ্যক মানুষ ধূমপান বা অ্যালকোহল গ্রহণ করবে না। এমনকি যখন কোনও কিছুর প্রমাণ স্পষ্ট এবং স্পষ্ট হয়, তখনও অনেকে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 112:

"আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু সৃষ্টি করেছি - মানুষ ও জিনের মধ্যে থেকে শয়তানদের, যারা একে অপরকে বিভ্রান্তির জন্য শোভাকর কথা বলতে উৎসাহিত করে..."

অতএব, এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে যে ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, অনেক মানুষ এখনও এটিকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং এর বিরোধিতা করবে, কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের উপর নির্দেশনা জোর করে চাপিয়ে দেন না, কারণ এটি এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্যকে বিঘ্নিত করবে, তাই তিনি তাদের জীবনে তাদের নিজস্ব পছন্দ করার অনুমতি দেন। ষষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ১১২:

"...কিন্তু তোমার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা তা করত না..."

অতএব, ইসলামিক শিক্ষার মধ্যে আলোচিত স্পষ্ট প্রমাণগুলি উপলব্ধি করার উপর মনোনিবেশ করা উচিত যাতে তাদের ঈমান এবং মহান আল্লাহ তায়ালার

আনুগত্যের প্রতি অঙ্গীকারকে শক্তিশালী করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মন এবং শরীরের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জন করবে, তাদের জীবনের সকল দিককে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতে শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। এছাড়াও, তাদের এমন লোকদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে যারা ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, অন্যথায়, তারা তাদের আচরণ গ্রহণ করতে পারে, কারণ একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। সুনান আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় ৬ আল আন'আম, আয়াত ১১২:

"... তাই তাদেরকে এবং তারা যা কিছু বানায় তা ছেড়ে দাও।"

এই আয়াতটি ধর্মীয় উদ্ভাবনের বিরুদ্ধেও সতর্ক করে। সর্বদা নির্দেশনার দুটি উৎসের শিক্ষা কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে ধর্মীয় উদ্ভাবন এড়িয়ে চলতে হবে: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য। একজন ব্যক্তি যত বেশি ধর্মীয় জ্ঞানের বিকল্প উৎসের উপর নির্ভর করবে, এমনকি যদি এই উৎসগুলি ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করে, ততই তারা নির্দেশনার দুটি প্রধান উৎসের সাথে কম জড়িত হবে, যা শেষ পর্যন্ত পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। অধিকন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরতা যত বেশি হবে, তত বেশি ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক অনুশীলনে লিপ্ত হতে শুরু করতে পারে। এই ধীরে ধীরে বিচ্যুতি হল শয়তান ধাপে ধাপে ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন

নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক অনুশীলন গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে যা ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। যদি এই ব্যক্তি অজ্ঞ থাকে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের বিকল্প উৎস অনুসরণ করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তারা সহজেই এই প্রতারণার শিকার হতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষার সরাসরি বিরোধিতা করে এমন আধ্যাত্মিক অনুশীলনে লিপ্ত হতে পারে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন বিশ্বাস পোষণ করতে পারে যা ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করে, যেমন এই ধারণা যে ব্যক্তি বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে, কারণ তাদের বোধগম্যতা নির্দেশনার দুটি প্রধান উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে উদ্ভূত। এই ভুল অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট অবিশ্বাস গঠন করে, যেমন কালো জাদুর অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

তাই ধর্মীয় জ্ঞানের বিকল্প উৎসের উপর নির্ভর করার প্রবণতার কারণে একজন মুসলিম অসাবধানতাবশত তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে। ফলস্বরূপ, নির্দেশনার দুটি প্রাথমিক উৎসের ভিত্তিহীন ধর্মীয় উদ্ভাবনে লিপ্ত হওয়া শয়তানের পথ অনুসরণ করার সমান। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১১২:

" আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু সৃষ্টি করেছি - মানুষ ও জিনের মধ্যে থেকে শয়তানদের, যারা একে অপরকে বিভ্রান্তির জন্য শোভাকর কথা বলতে উৎসাহিত করে..."

আল্লাহ্ তাআলা এরপর সতর্ক করে বলেন যে, যারা বিচার দিবসে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না, তারা অনিবার্যভাবে তাদের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং অনুকরণ করবে যারা ইসলামী শিক্ষা উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করতে পছন্দ করে। বাস্তবে, যারা বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে না, তারা এর জন্য প্রস্তুতি নিতে আগ্রহী হবে না। অতএব, তারা ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করবে। অন্যদিকে, যারা বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে, তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেবে। এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার একমাত্র উপায় হল ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা। অতএব, তারা ইসলামী শিক্ষা কতটা শেখে এবং তার উপর আমল করে তা পর্যবেক্ষণ করে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি তাদের বিশ্বাস কতটা দৃঢ় তা মূল্যায়ন করা যায়। তারা যত বেশি শেখে এবং তার উপর আমল করে, বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি তাদের বিশ্বাস তত শক্তিশালী। তারা ইসলামী শিক্ষার উপর আমল যত কম করবে, বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি তাদের বিশ্বাস তত দুর্বল হবে। অধ্যায় ৬ আল আন'আম, আয়াত ১১৩:

" আর [এটা] যাতে যারা পরকালে অবিশ্বাস করে তাদের অন্তর এর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এতে তারা সন্তুষ্ট হয় এবং তারা যা করছে তা করে।"

অতএব, বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে তারা ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখে এবং সেগুলি অনুসরণ করে কার্যত এর জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি তাদের মন এবং শরীরের একটি সুসংগত অবস্থা অর্জনে সহায়তা করবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে সহায়তা করবে, একই সাথে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য কার্যকরভাবে প্রস্তুত হবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রশান্তি বর্ধন করবে।

উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে, তখন ভারসাম্যের অনেক উদাহরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পৃথিবীকে ধরুন, যা সূর্য থেকে নিখুঁত দূরত্ব বজায় রাখে; যদি এটি আরও সামান্য কাছাকাছি বা দূরে থাকত, তবে এটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠত। একইভাবে, জলচক্র, যার মধ্যে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবন এবং পরবর্তীকালে বৃষ্টিতে ঘনীভূত হওয়া জড়িত, সূক্ষ্মভাবে সুরক্ষিত, যা পৃথিবীতে জীবনকে বিকাশের সুযোগ করে দেয়। মাটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে বীজের ভঙ্গুর শাখা এবং অঙ্কুরগুলি ভেঙে যায়, পুষ্টির জন্য ফসল উৎপাদন করে, একই সাথে ভারী ভবনগুলিকে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা কেবল একজন স্রষ্টার অস্তিত্বই নির্দেশ করে না বরং ভারসাম্যও চিত্রিত করে। তবে, এই পৃথিবীর একটি স্পষ্ট দিক হল এর ভারসাম্যহীনতা, বিশেষ করে মানুষের কর্মকাণ্ডে। প্রায়শই দেখা যায় যে নিপীড়ক এবং অত্যাচারী ব্যক্তিত্বরা এই জীবনে জবাবদিহিতা থেকে রেহাই পায়। বিপরীতে, অনেক ব্যক্তি নিপীড়ন সহ্য করে এবং তাদের অধ্যবসায়ের জন্য প্রাপ্য পুরষ্কার না পেয়ে বিভিন্ন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়। অনেক মুসলিম যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর আদেশ পালন করে,

তারা প্রায়শই এই পৃথিবীতে অসংখ্য পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং পুরস্কারের সামান্য অংশই পায়, অন্যদিকে যারা প্রকাশ্যে আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারা পার্থিব আনন্দ উপভোগ করে। ঠিক যেমন আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, তেমনি কর্মের জন্য পুরস্কার এবং শাস্তিও সেই ভারসাম্য প্রতিফলিত করা উচিত। তবে, এই পৃথিবীতে স্পষ্টতই এটি ঘটে না; তাই, এটি অবশ্যই অন্য সময়ে ঘটবে, বিশেষ করে বিচারের দিনে।

এই আলোচনার উপর চিন্তা করলে বিচার দিবসের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হবে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুশীলন অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে এর জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত হবে। এই প্রস্তুতি শেষ পর্যন্ত ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি এবং সাফল্য বয়ে আনবে। সূরা ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ২২:

"কারণ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রতিটি প্রাণী তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

যখন এটা স্পষ্ট যে বিচারের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার এবং এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি অর্জনের একমাত্র উপায় হল ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করা এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে নিজের জীবনের মধ্যে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে, কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব, তখন তাঁর অবাধ্যতা করা পাগলামি হবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১১৪:

" তাহলে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে খুঁজব, অথচ তিনিই তোমাদের উপর বিস্তারিতভাবে বর্ণিত কিতাব নাজিল করেছেন?"...

আর মক্কার অমুসলিমদের জন্য এবং তাদের পরবর্তীদের জন্য এটাই যথেষ্ট প্রমাণ ছিল যে পবিত্র কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, যে আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা এটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১১৪:

"...আর যাদেরকে আমরা পূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে যে এটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, অতএব তোমরা কখনও সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা ইসলামের সত্যতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন, তাদের পবিত্র লেখায় পাওয়া তাঁর বাণী বোঝার কারণে তারা মহান আল্লাহকে পবিত্র কুরআনের লেখক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। উপরন্তু, তাদের ঐশী গ্রন্থে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এবং পবিত্র কুরআন উভয়েরই উল্লেখ ছিল। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

মক্কার অমুসলিমরা, যারা আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিল, তারা বুঝতে পেরেছিল যে পবিত্র কুরআন কোনও মানুষের সৃষ্টি নয়। উপরন্তু, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়ত ঘোষণার আগে চল্লিশ বছর তাঁর সাথে কাটানোর পর, তারা জানতে পেরেছিল যে তিনি কোনও প্রতারক নন। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১৬:

"...কারণ আমি এর আগে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারবে না?"

অবশেষে, আহলে কিতাব এবং মক্কায় বসবাসকারী অমুসলিম উভয়ই বুঝতে পেরেছিল যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেননি, যার ফলে তাঁর পক্ষে পবিত্র কুরআন রচনা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৪৮:

"আর তুমি এর আগে কোন কিতাব পাঠ করোনি এবং তোমার ডান হাতে কোন কিতাব লিখে রাখোনি। তাহলে [অর্থাৎ, অন্যথায়] মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কারণ হত।"

আহলে কিতাবদের মনে ঈর্ষা জন্মেছিল যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভাই হযরত ইসহাকের বংশধর নন, বরং তাঁর বংশধর ছিলেন। যেহেতু তাদের সম্পূর্ণ ধর্মবিশ্বাস বংশের তাৎপর্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, যা তারা বিশ্বাস করত যে বংশধরদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি রয়েছে, তাই তাদের কাছে ভিন্ন বংশধরদের একজন নবী (সাঃ) গ্রহণ করা এবং অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতি অনিবার্যভাবে তাদের নির্মিত শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতাকে দুর্বল করে দেবে।

মক্কার বিশিষ্ট অমুসলিম নেতারা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা গ্রহণ ও অনুসরণ করতে সংগ্রাম করেছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন একজন বিনয়ী এতিম, তবুও তিনি ছিলেন সবচেয়ে সম্মানিত গোত্রের সদস্য। ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদের প্রতি তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের ঈর্ষাকে আরও তীব্র করে তোলে যখন মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত ঘোষণা করা হয় এবং তাঁকে সমস্ত সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব ও সম্মান প্রদান করা হয়।

মানুষ ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণ গ্রহণ করুক বা প্রত্যাখ্যান করুক, মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত ঐশ্বরিক আচরণবিধি প্রদত্ত হয়েছে। তারা এটিকে অনুমোদন করুক বা না করুক, এটি এই সত্যকে পরিবর্তন করবে না যে কেবলমাত্র এর মাধ্যমেই উভয় জগতে মানসিক শান্তি লাভ করা সম্ভব। ষষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ১১৫:

"আর তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের সাথে পূর্ণ হয়েছে। তাঁর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

পরিশেষে, যেহেতু সমস্ত সৃষ্টি মহান আল্লাহর মালিকানাধীন এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর কর্তৃত্ব ও এখতিয়ারের অধীনে, তাই ব্যক্তিদের তাঁর বিধিবিধান মেনে চলা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। যেমন একটি নির্দিষ্ট জাতির শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইন অনুসরণ না করার কারণে কেউ অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে, তেমনিভাবে, মহাবিশ্বের সার্বভৌম আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলে উভয় জগতেই তাদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। যদিও একজন ব্যক্তি যদি একটি জাতিকে তার আইনের সাথে একমত না হন তবে ত্যাগ করতে পারেন, তবে তারা এমন একটি রাজ্যে পালিয়ে যেতে পারবেন না যেখানে মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে না। যদিও ব্যক্তিরা তাদের সম্প্রদায়ের আইন পরিবর্তন করতে পারে, তারা কখনই মহান আল্লাহর আদেশ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখবে না। অধিকন্তু, একজন গৃহকর্তা যেভাবে তাদের বাসস্থানের নিয়ম নির্ধারণ করেন, অন্যদের কোনও আপত্তি সত্ত্বেও, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর মালিকানাধীন, যিনি জনমত নির্বিশেষে এটি পরিচালনাকারী নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলস্বরূপ, এই নিয়মগুলি মেনে চলা নিজের স্বার্থের জন্য অপরিহার্য। যারা এই বাস্তবতা উপলব্ধি করবে তারা মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুসারে তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো এমনভাবে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে যা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য। ব্যক্তিরা হয় আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে চেষ্টা করতে পারে, এই জ্ঞান অর্জন করতে পারে যে কীভাবে তারা তাদের নিজস্ব এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের স্বার্থ পূরণ করে, যা শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে এবং ইসলামের নীতিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তবে, যারা ইসলামী বিধি-নিষেধ অনুসরণ করতে অবহেলা করে তাদের উভয় জগতেই

তাদের সিদ্ধান্তের পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, কারণ কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাদের আশ্রয় দেবে না। অধ্যায় ১৮ আল-কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমি জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা ত্রাণ প্রার্থনা করে, তবে তাদের ত্রাণ ঘোলা তেলের মতো জল দিয়ে ত্রাণ করা হবে, যা [তাদের] মুখ পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট, আর বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

অতএব, যদি কেউ ইসলামী আচরণবিধি উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে অন্যান্য মানবসৃষ্ট আচরণবিধি অনুসরণ করে, তাহলে তারা অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্যের ঘাটতির সম্মুখীন হবে, যার ফলে তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে ফেলবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং কষ্টের সৃষ্টি হবে, এমনকি যদি তাদের কাছে বস্তুগত আরাম-আয়েশ থাকে। এই পরিণতি অনিবার্য কারণ সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি সর্বদা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার ঘাটতি থাকবে এবং তাদের মধ্যে সর্বদা পক্ষপাত থাকবে। ফলস্বরূপ, মানবসৃষ্ট আচরণবিধি অনুসরণ করে কেউ কখনও মানসিক শান্তি পাবে না। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 116:

"আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নাও, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে, আর তারা কেবল অনুমান করে।"

একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই জ্ঞান আছে যা একজন ব্যক্তিকে মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রেখে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনের মধ্যে স্থাপন করে মানসিক শান্তি অর্জনের দিকে পরিচালিত করে। তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে এই জ্ঞান দান করেছেন। সূরা ৬ আল-আন'আম, আয়াত ১১৭:

"নিশ্চয়ই, তোমার প্রতিপালকই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কারা [সঠিকভাবে] সৎপথপ্রাপ্ত।"

অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই ইসলামী নীতিগুলি তাদের নিজস্ব স্বার্থে গ্রহণ এবং প্রয়োগ করতে হবে, এমনকি যদি এই নীতিগুলি তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তার ডাক্তারের দেওয়া পরামর্শকে স্বীকৃতি দেন এবং মেনে চলেন, বুঝতে পারেন যে এটি তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করে, এমনকি যখন এতে অপ্রীতিকর ওষুধ খাওয়া এবং কঠোর ডায়েট অনুসরণ করা জড়িত থাকে। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী সর্বোত্তম মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সেগুলি অনুসরণ করে তারও সর্বোত্তম স্বাস্থ্য অর্জন হবে।

এরপর মহান আল্লাহ হালাল উপার্জন এবং ভোগের গুরুত্ব উল্লেখ করে এটা স্পষ্ট করে দেন যে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ আচরণবিধি যা মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক

এবং প্রতিটি পরিস্থিতির উপর প্রভাব ফেলে। অতএব, ইসলাম কয়েকটি ইবাদতের বাইরেও যায়। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১১৮:

"অতএব, যদি তোমরা তাঁর আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাসী হও, তাহলে যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে তা থেকে খাও।"

অতএব, ইসলামকে এমন একটি পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলা উচিত যেখানে তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী এটি পরিধান করে এবং খুলে ফেলে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল তাদের ইচ্ছার পূজা করছে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

অতএব, প্রত্যেককে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা যে কোনও পরিস্থিতিতে, পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, ইসলামী নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে, কারণ ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি। ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ১১৮-১১৯:

"সুতরাং তোমরা যদি তাঁর আয়াতগুলিতে বিশ্বাসী হও, তাহলে যে জিনিসের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে তা থেকে খাও। আর কেন তোমরা এমন জিনিস খাবে

না যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে, অথচ তিনি তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তবে যা তোমাদের বাধ্য করা হয় তা ছাড়া..."

এই ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তির সর্বদা হালাল উপার্জন এবং ভোগ করা উচিত কারণ এটি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি, ঠিক যেমন একজনের নিয়ত ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি। যদি ভিত্তিটি কলুষিত হয়, তাহলে এর থেকে উদ্ভূত সমস্ত কিছুই একইভাবে কলুষিত হবে এবং তাই আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, কর্ম নির্বিশেষে, তা প্রত্যাখ্যান করবেন। বিচারের দিনে যারা এইভাবে আচরণ করে তাদের পরিণতি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য পণ্ডিতদের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা ইসলামী আচরণবিধির পরিপন্থী নতুন নতুন উদ্ভাবন এড়িয়ে চলার গুরুত্ব তুলে ধরেন। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১১৯:

"...আর অনেকেই অজ্ঞতাবশত তাদের প্রবৃত্তির মাধ্যমে [অন্যদের] বিপথগামী করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, তাই প্রতিটি পরিস্থিতিতে ইসলামিক আচরণবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে, নির্দেশনার দুটি উৎস কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য। ধর্মীয় জ্ঞানের বিকল্প

উৎসের উপর একজন ব্যক্তি যত বেশি নির্ভরশীল হবেন, এমনকি যদি এই উৎসগুলি ইতিবাচক ফলাফলের দিকেও নিয়ে যায়, তবুও তারা নির্দেশনার দুটি প্রধান উৎসের উপর তত কম কাজ করবেন, যা শেষ পর্যন্ত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। অধিকন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরতা যত বেশি হবে, তত বেশি মানুষ এমন অভ্যাসে লিপ্ত হতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। এই ধীরে ধীরে বিচ্যুতিই শয়তান ধাপে ধাপে ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতে উৎসাহিত করা যেতে পারে যা ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। যদি এই ব্যক্তি অজ্ঞ থাকে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের বিকল্প উৎস অনুসরণ করতে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে তারা সহজেই এই প্রতারণার শিকার হতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষার সরাসরি বিরোধিতাকারী আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ শুরু করতে পারে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে যা ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করে, যেমন এই ধারণা যে ব্যক্তি বা অতিপ্রাকৃত সত্তা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের বোধগম্যতা নির্দেশনার দুটি প্রধান উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে উদ্ভূত। এই ভুল অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট অবিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন কালো জাদুর অনুশীলন। অধ্যায় ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

ধর্মীয় জ্ঞানের বিকল্প উৎসের উপর নির্ভর করার প্রবণতার ফলে একজন মুসলিম অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে। ফলস্বরূপ, নির্দেশনার দুটি প্রধান উৎসের উপর ভিত্তি করে নয় এমন ধর্মীয় উদ্ভাবনে অংশগ্রহণ করা শয়তানের পথ অনুসরণ করার সমতুল্য। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

প্রতিটি পরিস্থিতিতে ইসলামী আচরণবিধি মেনে চলার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করার পর, মহান আল্লাহ একটি সাধারণ বিবৃতির মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতির উপর পুনরায় জোর দেন। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১২০:

" আর তোমরা প্রকাশ্য পাপ এবং গোপন পাপ পরিত্যাগ করো..."

পাপ হলো ইসলামের আচরণবিধি মেনে না চলার সরাসরি ফলাফল। অতএব, এই আয়াত মুসলমানদেরকে ইসলামী শিক্ষার উপর দৃঢ়ভাবে আমল করার জন্য উৎসাহিত করে যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে পাপ এড়াতে পারে। এটি তাদের মন এবং শরীরের একটি সুসংগত অবস্থা অর্জনে সহায়তা করবে এবং নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে, একই সাথে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য

কার্যকরভাবে প্রস্তুত হবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতেই প্রশান্তি বয়ে আনবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১২০:

" আর তোমরা প্রকাশ্য পাপ এবং গোপন পাপ পরিত্যাগ করো..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পাপগুলিকে ছোট এবং বড় দুই প্রকারে ভাগ করা হয়। ইতিহাস জুড়ে, বড় পাপ কী তা স্পষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি সরল শ্রেণীবিভাগ ইঙ্গিত দেয় যে যে কোনও পাপ যার জন্য ইসলামী সরকারকে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা একটি বড় পাপ হিসাবে বিবেচিত হয়। উপরন্তু, যদি কোনও পাপ জাহান্নামের আগুন, মহান আল্লাহর ক্রোধ বা তাঁর অভিশাপের সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে এটি একটি বড় পাপ হিসাবেও বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে নিন্দা করার কারণে গীবতকে একটি বড় পাপ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সূরা ১০৪ আল হুমাযা, আয়াত ১:

" প্রত্যেক গীবতকারী, নিন্দুকের জন্য দুর্ভোগ।"

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে সহীহ বুখারী, ২৭৬৬ নম্বরে বর্ণিত একটি হাদিসে বর্ণিত মাত্র সাতটি কবীরা পাপ রয়েছে। তবে, তারা এই সত্যটি উপেক্ষা করেন যে যদিও এই সাতটি প্রকৃতপক্ষে কবীরা পাপ, এর অর্থ এই নয় যে এগুলিই একমাত্র। বাস্তবে, আরও কিছু হাদিস রয়েছে যা অন্যান্য কবীরা পাপকে চিহ্নিত করে, যেমন পিতামাতার অবাধ্যতা করা। এই বিশেষ হাদিসটি সহীহ বুখারী, ৬২৭৩ নম্বরে পাওয়া যাবে। পূর্বে উল্লিখিত হাদিসে বর্ণিত সাতটি কবীরা পাপ হল: শিরক, জাদু, একজন নিরপরাধ ব্যক্তির অন্যায়ভাবে হত্যা, আর্থিক স্বার্থে লিপ্ত হওয়া, এতিমের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে দখল করা, যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা এবং একজন নিরপরাধ মহিলার উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা।

এটা স্বীকার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন একজন ব্যক্তি ছোটখাটো অপরাধে লিপ্ত হতে থাকে, তখন ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো বড় পাপে পরিণত হতে পারে।

শুধুমাত্র প্রকৃত অনুতাপের মাধ্যমেই বড় পাপ ক্ষমা করা হয়, অন্যদিকে ছোট পাপগুলি বড় পাপ থেকে বিরত থেকে এবং সৎকর্মে লিপ্ত হয়ে ক্ষমা করা যেতে পারে। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৩১:

"যদি তোমরা সেইসব কবীরা পাপ থেকে বিরত থাকো যেগুলো তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেব..."

প্রকৃত অনুতাপের জন্য অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, সেইসাথে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন, তবে শর্ত থাকে যে এর ফলে অতিরিক্ত জটিলতা তৈরি না হয়। একই পাপ বা অনুরূপ পাপের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার এবং আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং অন্যান্যদের উপর লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার সংশোধন করার জন্য আন্তরিকভাবে শপথ করা অপরিহার্য। অধিকন্তু, ইসলামী নীতিমালা অনুসারে, মহান আল্লাহর প্রদত্ত অনুগ্রহ যথাযথভাবে ব্যবহার করে, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে অবিচল থাকতে হবে।

মুসলমানদের সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, কারণ শয়তানের একটি কৌশল হল মুসলমানদেরকে ছোটখাটো পাপ উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করা। এটা মনে রাখা অপরিহার্য যে পাহাড় ছোট পাথর দিয়ে তৈরি এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রতিটি পাপের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তার আকার যাই হোক না কেন। ষষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ১২০:

"...নিশ্চয়ই, যারা পাপ অর্জন করে, তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পাবে।"

এরপর আল্লাহ তাআলা একটি নির্দিষ্ট পার্থিব পাপের উদাহরণ দেন যা এড়িয়ে চলা উচিত, যাতে পার্থিব বা ধর্মীয় যেকোনো পরিস্থিতিতেই ইসলামী আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া যায়। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১২১:

"আর যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ করো না, কারণ তা গুরুতর অবাধ্যতা..."

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হলো হালাল অর্জন এবং তা কাজে লাগানো, ঠিক যেমন ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হলো নিয়ত। যদি ভিত্তিটি কলুষিত হয়, তাহলে এর ফলে সৃষ্ট প্রতিটি কাজই কলুষিত হবে এবং মহান আল্লাহর কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, এমনকি যদি তা একটি সৎকর্ম হিসেবেও মনে হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেন যে, মুসলিমরা সর্বদা ইসলামী আচরণবিধির উপর এমন লোকদের দ্বারা চ্যালেঞ্জ এবং সমালোচনার সম্মুখীন হবে যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করা। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১২১:

"...আর শয়তানরা তাদের বন্ধুদের [মানুষের মধ্যে] তোমাদের সাথে বিবাদ করার জন্য প্ররোচনা দেয়। আর যদি তোমরা তাদের কথা মান্য করো, তাহলে অবশ্যই তোমরা [তাঁর সাথে অন্যদের] অংশীদার হবে।"

যদি কেউ আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন কিছু মেনে চলে, তাহলে তা ছোটখাটো শিরক-পন্থার দিকে পরিচালিত করবে। এর ফলে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যের অভাব অনুভব করবে,

তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে না। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং সংগ্রামের সৃষ্টি হবে, তারা তাদের পার্থিব বিলাসিতা যাই উপভোগ করুক না কেন।

ইসলাম পার্থিব কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণকে উৎসাহিত করে, যা তাদের সমালোচনার দিকে ঠেলে দেয় যাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো এই কামনা-বাসনা পূরণ করা, কারণ এটি তাদেরকে পশুসুলভ করে তোলে। অধিকন্তু, যেসব ব্যবসা এবং শিল্প তাদের আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, তারা সক্রিয়ভাবে ইসলামের বিরোধিতা করবে, যা এর শিক্ষার প্রতি আনুগত্যকে উৎসাহিত করে। এই বিরোধিতার প্রতিক্রিয়ায়, মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে দৃঢ় থাকতে হবে, যিনি তাদেরকে প্রশান্তি দান করবেন এবং অন্যদের প্রতিকূল প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, এমনকি যদি এই সুরক্ষা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নাও হয়। বিপরীতে, যারা মহান আল্লাহর আদেশ উপেক্ষা করে সামাজিক অনুমোদন লাভের চেষ্টা করে, তারা তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না এবং তারা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে না, কারণ সামাজিক মতামত এবং পার্থিব প্রবণতা, যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি, সহজাতভাবে অস্থির। মহান আল্লাহর আনুগত্যকে দৃঢ়ভাবে মেনে চলা এবং ইসলামী নীতি অনুসারে তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে, ব্যক্তিরা তাদের জীবনের সকল দিককে কার্যকরভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি সুসংগত মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে। অধিকন্তু, মহান আল্লাহ তাদের নেতিবাচক সঙ্গীদের, যারা তাদের ভক্তির সমালোচনা করে, তাদের পরিবর্তে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবেন যা তাদেরকে তাদের আনুগত্যের উপর অটল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে, যার ফলে তাদের পার্থিব জীবনে মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধি পাবে। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৯:

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব।"

যেহেতু তাদের আচরণ তাদেরকে বিচারের দিনে জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত করে, তাই তিনি তাদেরকে অকল্পনীয় আশীর্বাদ দিয়ে পুরস্কৃত করবেন।

কিন্তু যারা সামাজিক অনুমোদন লাভ এবং তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সর্বদা মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা করে চলে, তারা শেষ পর্যন্ত তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা নিজেদেরকে মানসিক ও শারীরিক অস্থিরতার মধ্যে দেখতে পাবে, তাদের অগ্রাধিকার এবং সম্পর্কগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সংগ্রাম করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে না। এই পরিস্থিতি উভয় জগতেই চাপ এবং চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করবে, তাদের যতই বস্তুগত আরাম থাকুক না কেন। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তাঁর প্রতি ঈমান রাখার পাশাপাশি, তাদের ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 121:

"...আর শয়তানরা তাদের বন্ধুদের [মানুষের মধ্যে] তোমাদের সাথে বিবাদ করার জন্য প্ররোচনা দেয়। আর যদি তোমরা তাদের কথা মান্য করো, তাহলে অবশ্যই তোমরা [তাঁর সাথে অন্যদের] অংশীদার হবে।"

এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে বিশ্বাস এমন একটি উদ্ভিদের মতো যার উন্নতি ও টিকে থাকার জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে পুষ্টির প্রয়োজন হয়। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় না, সে ধ্বংস হয়ে যাবে, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও যদি আনুগত্যের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখা না হয় তবে তা হ্রাস পেতে পারে এবং মারা যেতে পারে। এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির প্রতিনিধিত্ব করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইসলামী আচরণবিধি মেনে চলা এবং না চলার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেন, যার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১২২:

"আর যে মৃত ছিল এবং আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারে আছে, আর কখনও সেখান থেকে বের হতে পারবে না?"...

মৃতদের জীবন দান করা ইসলাম গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। বাস্তবে, বিশ্বাস মানুষের অস্তিত্বে প্রাণ সঞ্চার করে কারণ এটিই তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের একমাত্র উপায়। অধ্যায় ৫১ আয ধরিয়াত, আয়াত ৫৬:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্যই সৃষ্টি করিনি।"

ঠিক যেমন একটি আবিষ্কারকে ব্যর্থ বলে গণ্য করা হয় যখন এটি সৃষ্টির মূল কাজটি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, ঠিক তেমনি, যে মানুষ সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য, মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে ব্যর্থ হয়, তাকেও ব্যর্থ বলে গণ্য করা হয়, জীবিত থাকা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হওয়ার সমতুল্য। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১২২:

"আর যে মৃত ছিল এবং আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারে আছে, আর কখনও সেখান থেকে বের হতে পারবে না?"...

এছাড়াও, ইসলামের শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে ইসলামের প্রতি তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে, কারণ এটিই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে তারা এই পৃথিবীতে আলো পাবে যাতে তারা ক্ষতিকর জিনিস থেকে উপকারী জিনিসের পার্থক্য করতে পারে এবং সঠিক পথের পার্থক্য করতে পারে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, ভুল পথ থেকে, যা উভয় জগতে চাপ এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে। এই আলো ছাড়া, কেউ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবে, যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি প্রান্তরে হারিয়ে যায়, উপকার পেতে বা ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্যের অভাবের মুখোমুখি হবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এই পরিস্থিতি উভয় জগতেই চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং কষ্টের কারণ হবে, এমনকি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 122:

"আর যে মৃত ছিল এবং আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারে আছে, আর কখনও সেখান থেকে বের হতে পারবে না?"...

কিন্তু যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করা, তারা এই সত্যটি গ্রহণ করবে না, কারণ ইসলামী আচরণবিধি তাদের পার্থিব কামনা-বাসনার বিরোধিতা করে। ফলস্বরূপ, তারা প্রদত্ত নিয়ামতগুলির অপব্যবহার করে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যাবে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১২২:

"... এভাবেই কাফেরদের কাছে তাদের কর্মকাণ্ড সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে।"

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে, প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করে, সে অনিবার্যভাবে আল্লাহ তাআলা এবং মানুষের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে। ফলস্বরূপ, তারা সমাজের মধ্যে অন্যায় ও দুর্নীতির বিস্তার ঘটায়। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১২৩:

"আর এভাবেই আমরা প্রতিটি জনপদে তার সবচেয়ে বড় অপরাধীদেরকে ষড়যন্ত্র করার জন্য নিযুক্ত করেছি..."

যদিও মহান আল্লাহ অপরাধীদেরকে নিজের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী করেন, কারণ তাঁর ইচ্ছা ছাড়া মহাবিশ্বে কিছুই ঘটে না, তবুও এটা স্পষ্ট যে প্রতিটি ব্যক্তিরই আল্লাহর আনুগত্য করা বা অবাধ্য হওয়া বেছে নেওয়ার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। যদি কেউ আল্লাহকে অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেয়, যার ফলে সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ও অবিচার ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাদের অস্তিত্বের প্রতিটি দিক, যার মধ্যে তাদের পরিবার, বন্ধুবান্ধব, কর্মজীবন এবং সম্পদ অন্তর্ভুক্ত, মানসিক চাপের উৎসে রূপান্তরিত হবে। যদি তারা আল্লাহর অবাধ্য হতে থাকে, তাহলে তারা তাদের মানসিক চাপের জন্য অনুপযুক্ত লক্ষ্যবস্তু, যেমন তাদের স্ত্রী, তাদের উপর দোষ চাপাবে। তাদের জীবনে এই ইতিবাচক প্রভাবগুলির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তারা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে, যার ফলে হতাশা, মাদকাসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাভাবনাও হতে পারে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 123:

"...কিন্তু তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।"

এই ফলাফল স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ এমন ব্যক্তিদের পরীক্ষা করে যারা পার্থিব আরাম-আয়েশ উপভোগ করার পরেও, ধনী এবং বিখ্যাতদের মতো প্রাপ্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে চলেছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১২৩:

"আর এভাবেই আমরা প্রতিটি জনপদে তার সবচেয়ে বড় অপরাধীদেরকে ষড়যন্ত্র করার জন্য নিযুক্ত করেছি..."

অধিকন্তু, যে অন্যের উপর অন্যায় করে, সে বিচারের দিনে ন্যায়বিচারের মুখোমুখি হবে। অপরাধীকে তাদের নেক আমলগুলো তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে সমর্পণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের পাপ বহন করতে হবে। এর ফলে অপরাধীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে, যেমনটি সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১২৩:

"...কিন্তু তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।"

অতএব, এই পরিণতি এড়াতে হবে, মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। উপরন্তু, এই আচরণ নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ তায়ালা এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে, যার ফলে সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রসার ঘটবে।

কিন্তু যারা তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক সুবিধাগুলি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, তারা সর্বদাই মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হবে এবং অন্যদেরকে

ইসলামী আচরণবিধি অনুসরণ করতে নিরুৎসাহিত করবে, কারণ তারা তাদের সামাজিক প্রভাব এবং নেতৃত্ব হারানোর ভয় পাবে। ফলস্বরূপ, তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য খারাপ অজুহাত তৈরি করবে, ঠিক যেমন মক্কার অমুসলিমদের নেতারা করেছিলেন। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১২৪:

"আর যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তখন তারা বলে, "আমরা কখনও বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমাদেরকে আল্লাহর রাসূলদের যা দেওয়া হয়েছিল, তার অনুরূপ দেওয়া হয়।"...

এটি ছিল একটি অযৌক্তিক অনুরোধ, কারণ ঐশ্বরিক ওহী এবং সহায়ক অলৌকিক ঘটনা কেবল পবিত্র নবীদেরই দেওয়া হয়, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ তারা ত্রুটিমুক্ত এবং ঐশ্বরিকভাবে পরিচালিত। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১২৪:

"... আল্লাহই তাঁর বাণী কোথায় রাখেন সে সম্পর্কে আরও জানেন..."

তাদের বোকামিপূর্ণ অনুরোধটি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তাদের ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশকেও প্রকাশ করে। মক্কার অভিজাত অমুসলিমরা তাঁর প্রতি ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। যদিও তিনি বিনয়ী পটভূমির এতিম ছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন সবচেয়ে সম্মানিত গোত্রের সদস্য। ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের ঈর্ষাকে আরও তীব্র করে তোলে যখন নবী

মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবুওয়াত ঘোষণা করেন এবং তাঁকে সমস্ত সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা সেইসব লোকদের সতর্ক করে দেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে এবং যারা অন্যদেরকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ ও তার উপর আমল করতে নিরুৎসাহিত করে, কারণ তারা তাদের সামাজিক প্রভাব ও নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে ভীত। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১২৪:

"... যারা অপরাধ করেছে, তাদের উপর আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রের জন্য কঠোর শাস্তি নেমে আসবে।"

এই শাস্তির একটি দিক হলো যখন তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে থাকে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্যের অভাব অনুভব করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার ক্ষমতাকে ব্যাহত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং সংগ্রামের সৃষ্টি হবে, এমনকি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও। এবং যেহেতু এই লোকেরা অনিবার্যভাবে মানুষের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে, যার ফলে সমাজে অন্যায় ও দুর্নীতির বিস্তার ঘটবে, তাই পরকালের শাস্তি আরও ভয়াবহ হবে।

মহান আল্লাহ আবারও নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১২৫:

"অতএব আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন..."

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর হেদায়েত অর্জন করে, সে হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলামী শিক্ষা শিখে এবং তার উপর আমল করে এর জন্য সংগ্রাম করে যাতে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। এটি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের প্রসার নিশ্চিত করবে যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে।

কিন্তু যারা সঠিক নির্দেশনা চান না এবং তাই ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেন অথবা কর্মের মাধ্যমে ইসলামে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণা সমর্থন করতে ব্যর্থ হন, তাদের সঠিক নির্দেশনা দেওয়া হবে না। ষষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১২৫:

"...আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান, তার বক্ষকে এমনভাবে সংকুচিত ও শক্ত করে দেন যেন সে আকাশে আরোহণ করছে..."

ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক এবং শারীরিক উভয় ভারসাম্যের ঘাটতির সম্মুখীন হবে, যার ফলে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষমতা ব্যাহত হবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং কষ্টের সৃষ্টি হবে, এমনকি তারা পার্থিব জিনিস উপভোগ করলেও। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১২৫:

"...এমনিভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের উপর অপবিত্রতা আরোপ করেন।"

এছাড়াও, এই আয়াতটি সতর্ক করে যে, যারা ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়, তাদের ঈমান হারানোর বিরাট ঝুঁকি রয়েছে। এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈমান এমন একটি উদ্ভিদের মতো যার বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ থেকে পুষ্টি প্রয়োজন। সূর্যালোকের মতো অপরিহার্য উপাদান থেকে বঞ্চিত একটি উদ্ভিদ যেমন মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও যদি আনুগত্যের কাজ দ্বারা সমর্থিত না হয়, তাহলে মারা যেতে পারে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১২৫:

"...আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান, তার বক্ষকে এমনভাবে সংকুচিত ও শক্ত করে দেন যেন সে আকাশে আরোহণ করছে..."

এটা লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা উল্লেখ করেছেন যা বহু বছর পরে প্রমাণিত হয়েছে। যতই উপরে উঠা যায়, ততই অক্সিজেনের ঘনত্ব কমতে থাকে এবং ফলস্বরূপ, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, ঠিক যেমনটি এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

যারা সঠিক পথের জন্য প্রচেষ্টা করে এবং যারা করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য করার পর, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দেন যে উভয় জগতে মানসিক প্রশান্তির দিকে পরিচালিত করে এমন একটি সরল পথ আছে: ইসলামের পথ। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১২৬:

"আর এটিই তোমার প্রতিপালকের সরল পথ..."

কিন্তু এই সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য এবং এর থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষার মধ্যে স্পষ্ট প্রমাণগুলি খোলা এবং নিরপেক্ষ মন দিয়ে চিন্তা করা উচিত। ষষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ১২৬:

"... আমরা আয়াতগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি তাদের জন্য যারা চিন্তা করে।"

যারা তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তারা উপলব্ধি করে যে উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য এটি একটি সামান্য মূল্য। এটি তাদের মন এবং শরীরের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করবে, যা তাদের জীবনের সকল দিককে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতে শান্তি বৃদ্ধি করবে। সূরা 6 আল আন'আম, আয়াত 127:

"তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে শান্তির আবাস থাকবে। এবং তিনি তাদের অভিভাবক হবেন তাদের কৃতকর্মের কারণে।"

যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে, মহান আল্লাহ উভয় জগতেই তাদের সুরক্ষা প্রদান করবেন। এই পৃথিবীতে, তারা সমাজের নেতিবাচক প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে, যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়, এবং তিনি তাদেরকে বিচার দিনের কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করবেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১২৮:

"আর যেদিন তিনি তাদেরকে একত্রিত করবেন [এবং বলবেন], "হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা অনেক মানুষকে [বিপথগামী করেছ]।"..."

এই বিভ্রান্তি কেবল অজ্ঞতার কারণেই ঘটে। যখন কেউ এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয় যে মহাবিশ্বের সবকিছুই কেবল মহান আল্লাহ তায়ালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তখন তারা

ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মতো ঐশ্বরিক শক্তিগুলিকে অন্যদের, যেমন অতিপ্রাকৃত প্রাণীদের উপর আরোপ করতে শুরু করবে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অধ্যয়ন এবং তার উপর আমল করে এই পরিণতি এড়াতে হবে, যাতে তারা আল্লাহ তায়ালা এবং সৃষ্টির প্রতি সঠিক বিশ্বাস গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যদি কেউ এটি করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভুল বিশ্বাস গ্রহণ করবে এবং ফলস্বরূপ, তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাঁর অবাধ্য হবে। ফলস্বরূপ, বিচারের দিন তাদের কোন অজুহাত থাকবে না। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১২৮:

"...আর মানুষের মধ্যে তাদের সহযোগীরা বলবে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কেউ কেউ অন্যদের ব্যবহার করেছিল, এবং আমরা [এখন] আমাদের সেই সময়সীমায় পৌঁছে গেছি, যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলে।" তিনি বলবেন, "তোমাদের আবাসস্থল হল আগুন, যেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত।" নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময় এবং জ্ঞানী।"

যেহেতু মুসলমানরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না, তাই এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে এই বিভ্রান্তিকর মনোভাব গ্রহণ করে তাদের ভাগ্য ভাগাভাগি করা থেকে সতর্ক করে, যার ফলে তারা আল্লাহ এবং সৃষ্টির প্রতি সঠিক বিশ্বাস গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যায়।

অধিকন্তু, যারা আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে, তারা অনিবার্যভাবে এই পৃথিবীতে ভুল সঙ্গীদের গ্রহণ করবে যারা তাদেরকে আরও বেশি করে আল্লাহর অবাধ্য হতে উৎসাহিত করবে। এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে একই ধরণের আচরণের

লোকেরা প্রায়শই একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব করে। অতএব, তাদের সঙ্গীদের মূল্যায়ন করে বিচার করা যেতে পারে যে তারা কতটা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলে। যদি তাদের সঙ্গীরা আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে, তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারাও তাই করবে। সুনানে আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যাকে তারা অনুকরণ করে, তাই, যারা পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা পরকালে তাদের সাথে একত্রিত হবে। ৬ষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ১২৯:

"আর এভাবেই আমি কিছু জালেমকে তাদের কৃতকর্মের কারণে অন্যদের বন্ধু বানাবো।"

অতএব, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার জন্য একজন ব্যক্তির অবশ্যই প্রচেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি তাদেরকে এমন ভালো সঙ্গী পেতে সাহায্য করবে যারা তাদেরকে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে আরও উৎসাহিত করবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৯:

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব।"

ফলস্বরূপ, তারা পরকালে সৎকর্মশীলদের সাথে একত্রিত হবে। ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ৬৯:

"আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবী, সত্যবাদী, শহীদ এবং সৎকর্মশীল। আর সঙ্গী হিসেবে তারাই উত্তম।"

অতএব, মুসলমানদের তাদের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে যে তারা পরকালে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে একত্রিত হতে চায়, যেমনটি তারা করেছিল, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলার মাধ্যমে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। কিন্তু যারা মৌখিকভাবে সৎকর্মশীলদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ঘোষণা করে এবং তাদের অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে মুনাফিক ও পাপীদের মধ্যে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলি অনুকরণ করে, তাদের তাদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং বিচার করা হবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৩০:

"হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করতেন এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতের বিষয়ে সতর্ক করতেন?"...

যেহেতু শিক্ষা এবং সতর্কীকরণ প্রদান করা হয়েছে, তাই এই পৃথিবীতে সঠিক মনোভাব এবং পথ গ্রহণে ব্যর্থ হলে কোন অজুহাত গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের দ্বিতীয় সুযোগও দেওয়া হবে না। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৩০:

"... তারা বলবে, "আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি'..."

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক করে বলেন যে, দুনিয়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে এই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে, মনের শান্তি নিহিত আছে সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণের মধ্যে অথবা এটি নিহিত আছে পার্থিব সাফল্য, যেমন সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনের মধ্যে। আর তাদের এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করেও বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ অধিকাংশের মতামত সর্বদা সঠিক নয়। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৩০:

"... তারা বলবে, "আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি' এবং পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত করেছিল..."

সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো জগতের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানোর একমাত্র উপায় হল দৃঢ় ঈমান গ্রহণ করা। দৃঢ় ঈমান গড়ে তোলা অপরিহার্য, কারণ এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, স্বাচ্ছন্দ্য বা কষ্টের সময়েই হোক না কেন, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যে অবিচল থাকে। জ্ঞান অর্জন এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত স্পষ্ট

প্রমাণ ও প্রমাণ প্রয়োগের মাধ্যমে দৃঢ় ঈমান গড়ে ওঠে। এই সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করে যে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য কীভাবে ইহকাল ও পরকালে প্রশান্তি এনে দেয়। বিপরীতভাবে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তার ঈমান দুর্বল হবে। এই ধরনের ব্যক্তির ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা যখনই তাঁর আনুগত্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখনই তিনি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, কারণ তারা বুঝতে পারে না যে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি বয়ে আনে। অতএব, জ্ঞান অর্জন এবং ইসলামী নীতিমালা অনুশীলনের মাধ্যমে ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন করা অপরিহার্য, যাতে তারা সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকে। এই প্রচেষ্টার জন্য ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলির যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। এর মাধ্যমে, তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করবে, তাদের জীবনের সকল দিককে যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার সাথে সাথে একটি সুসংগত মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেসব মুসলিম ইসলামী শিক্ষা উপেক্ষা করে এবং ইসলামের প্রতি তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়, তারা এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে তাদের দুর্বল ঈমান হারানোর বিরাট ঝুঁকিতে থাকে, কারণ তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যাবে। এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে ঈমান এমন একটি উদ্ভিদের মতো যার বেড়ে ওঠা এবং টিকে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ থেকে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজন হয়। ঠিক যেমন সূর্যালোকের মতো গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের অভাবযুক্ত একটি উদ্ভিদ ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে যদি তা বাধ্য আচরণ দ্বারা শক্তিশালী না হয়। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 130:

"...তারা বলবে, "আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি'; আর পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল, আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে তারা কাফের ছিল।"

এটা স্বীকার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এই পৃথিবীতে ব্যক্তিদের বাহ্যিক চেহারার ভিত্তিতে বিচার করা হয়, এমনকি যখন তা তাদের অভ্যন্তরীণ সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, তাহলে সমাজ তাকে মুসলিম হিসেবে গ্রহণ করবে যদি না তারা স্পষ্টভাবে অবিশ্বাসের কাজ করে। তবে, পরকালে, মহান আল্লাহ ব্যক্তিদের তাদের প্রকৃত অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং তাদের বাহ্যিক কর্মের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন। অতএব, ভণ্ডামি করা থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এই ধরনের আচরণ ইহকালে অন্যদের প্রতারিত করতে পারে, কিন্তু পরকালে, তারাই প্রতারিত হবে, কারণ তাদের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা অনুসারে তাদের মূল্যায়ন করা হবে, যা অবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হতে পারে। অধ্যায় ৫৭ আল হাদিদ, আয়াত ১৩-১৫:

"[একই] দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদের বলবে, "আমাদের জন্য অপেক্ষা করো, যাতে আমরা তোমাদের আলো থেকে কিছু লাভ করতে পারি।" বলা হবে, "তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান করো।" আর তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে যার একটি দরজা থাকবে, যার ভেতরে রহমত থাকবে, কিন্তু বাইরে থাকবে আযাব। তারা [অর্থাৎ, মুনাফিকরা] তাদেরকে [অর্থাৎ, মুনাফিকদের] ডাকবে, "আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?" তারা বলবে, "হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে কষ্ট দিয়েছিলে এবং [আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের] অপেক্ষা করেছিলে এবং সন্দেহ করেছিলে, এবং কামনা-বাসনা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ এসেছিল। আর প্রতারক [অর্থাৎ, শয়তান] তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত করেছিল। তাই আজ তোমাদের কাছ থেকে বা যারা কাফের তাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ নেওয়া হবে না।

তোমাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। এটি তোমাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, এবং নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।"

এবং ৬ষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৩০:

"...তারা বলবে, "আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি"; আর পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল, আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে তারা কাফের ছিল।"

যেহেতু মহান আল্লাহ কারো প্রতি অন্যায় করেন না, তাই তিনি মানুষকে শাস্তি দেন না যতক্ষণ না তাদের কাছে ঐশী শিক্ষা স্পষ্ট হয়ে যায়। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৩১:

"এটা এজন্য যে, তোমার প্রতিপালক জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন না যখন তার অধিবাসীরা অজ্ঞ থাকে।"

অতএব, এর ফলে, যদি মানুষ আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে তার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তাহলে উভয় জগতের শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য কোন অজুহাত থাকে না। এই পৃথিবীতে, ব্যক্তিরা ভারসাম্যহীন মানসিক ও

শারীরিক অবস্থার সম্মুখীন হবে, যার ফলে তাদের সম্পর্ক এবং জীবনের দায়িত্বগুলি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। ফলস্বরূপ, পার্থিব আরাম-আয়েশ থাকা সত্ত্বেও, এর ফলে চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং কষ্টের সৃষ্টি হবে। এবং যেহেতু এই মনোভাব তাদেরকে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে বাধা দেয়, তাই পরকালে তাদের শাস্তি তাদের অবাধ্যতার স্তর অনুসারে আরও খারাপ হবে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৩২:

"আর প্রত্যেকের জন্যই তাদের কৃতকর্মের উপর মর্যাদা রয়েছে। আর তোমার প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।"

কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যারা তাঁর আনুগত্য করতে পছন্দ করে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তারা কেবল নিজেদেরই উপকার করছে, কারণ মহান আল্লাহ তাআলা স্বাধীন এবং মানুষের আনুগত্য থেকে তিনি উপকৃত হন না এবং তাদের অবাধ্যতা থেকেও তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হন না। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৩৩:

"আর তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, করুণার অধিকারী..."

যারা এই অপরিহার্য সত্যটি বোঝে না, তাদের মধ্যে অহংকারবোধ তৈরি হতে পারে, তারা ভুল করে ভাবে যে ইসলামী নীতিমালা মেনে চলার মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহর সেবা করছে। এই ধরনের অহংকার তাদের মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক

আত্মসমর্পণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, বিশেষ করে যখন তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা তাঁর নির্দেশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে। বিপরীতে, যারা বোঝে যে তাদের বিশ্বাস এবং আনুগত্য চূড়ান্তভাবে তাদের নিজস্ব কল্যাণের জন্য উপকারী, তারা মহান আল্লাহর সামনে নম্রতা লালন করবে এবং পরীক্ষা এবং স্বস্তি উভয় সময়েই তাদের আনুগত্যে দৃঢ় থাকবে। প্রতিকূলতার সময়ে, তারা ধৈর্য প্রদর্শন করবে এবং স্বস্তির মুহূর্তে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা বোঝায়, অন্যদিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে ভালো কথা বা নীরবতার মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। অধিকন্তু, কর্মে কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা অনুসারে তাদের উপর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা বোঝায়। ধৈর্যের অর্থ হলো কথা ও কাজে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকা, একই সাথে সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে যে তিনি সর্বদা তাদের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর জিনিসটি বেছে নেন, এমনকি যখন তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট হয় না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

ফলস্বরূপ, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে যথাযথ আচরণ অনুসরণ করে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে অবিচল সমর্থন এবং রহমত লাভ করবে। এটি ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনেই প্রশান্তি এনে দেয়, যেমনটি সহিহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু যারা বিনয় অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয় এবং এমন আচরণ করে যেন তারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করছে, তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে অন্যরা যারা সত্যকে স্বীকৃতি দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনয় প্রদর্শন করে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে। ৬ষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৩৩:

"... তিনি যদি চান, তাহলে তিনি তোমাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকারী দান করতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য জাতির বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

অতএব, তারা একটি সুসংগত মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে, তাদের জীবনের সকল দিক এবং ব্যক্তিদের যথাযথভাবে স্থান দেবে, একই সাথে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য নিজেদেরকে পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় – আল আন'আম, আয়াত ১৩৪-১, ১৬৫ এর ৬৫

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾

قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١٣٥﴾

وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا فَقَالُوا۟ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَٰدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا۟ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

وَقَالُوا۟ هَٰذِهِۦٓ أَنْعَٰمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَٰمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَٰمٌ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

وَقَالُوا۟ مَا فِى بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلْأَنْعَٰمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِنَا ۖ وَإِن
يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا۟ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا۟ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى
ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا۟ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ
وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ
ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۖ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ
ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّـُٔونِى بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٤٣﴾

وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا
ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَا ۚ
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ
ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٤﴾

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا
مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ
وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ
شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم
بِبَغۡيِهِمۡ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ١٤٦

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمۡ ذُو رَحۡمَةٖ وَٰسِعَةٖ وَلَا يُرَدُّ بَأۡسُهُۥ عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ
١٤٧

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ
كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأۡسَنَاۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآۖ إِن
تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَخۡرُصُونَ ١٤٨

قُلۡ فَلِلَّهِ ٱلۡحُجَّةُ ٱلۡبَٰلِغَةُۖ فَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ ١٤٩

قُلۡ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشۡهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَاۖ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشۡهَدۡ مَعَهُمۡۚ
وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمۡ
يَعۡدِلُونَ ١٥٠

۞ قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا
وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم
بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ
بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ
ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ
ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ
﴿١٥٦﴾

أَوْ تَقُولُوا۟ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ
عَنْ ءَايَٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ
ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟
إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا
كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
﴿١٦٠﴾

قُلْ إِنَّنِى هَدَىٰنِى رَبِّىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
﴿١٦١﴾

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾

لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ
ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“নিশ্চয়ই, তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা আসবেই, আর তোমরা [আল্লাহকে] ব্যর্থ করতে পারবে না।

বলুন, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের অবস্থান অনুযায়ী কাজ করো; আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে পরকালে উত্তরাধিকারী হবে। নিশ্চয়ই জালেমরা সফল হবে না।"

আর তারা [মুশরিকরা] আল্লাহর জন্য তাঁর সৃষ্টি ফসল ও পশুপাখির একটি অংশ নির্ধারণ করে এবং তাদের দাবি অনুসারে বলে, "এটি আল্লাহর জন্য", "এবং এটি আমাদের 'শরীকদের' জন্য"। কিন্তু যা তাদের "শরীকদের" জন্য তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, আর যা আল্লাহর জন্য তা তাদের "শরীকদের" কাছে পৌঁছায়। তারা যা শাসন করে তা কতই না নিকৃষ্ট।

আর একইভাবে, অনেক মুশরিকের কাছে তাদের শরীকরা তাদের সন্তানদের হত্যাকে আনন্দের করে তুলেছে যাতে তাদের ধ্বংস করা যায় এবং তাদের ধর্মে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া যায়। আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে তারা তা করত না। অতএব, তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলোকে ছেড়ে দাও।

আর তারা তাদের দাবী অনুসারে বলে, "এই পশু এবং ফসল নিষিদ্ধ; আমরা যাদের ইচ্ছা তাদের ছাড়া কেউ এগুলো খেতে পারবে না।" আর কিছু [উট] আছে যাদের পিঠ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কিছু উট যাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা

হয় না - [এগুলো] তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন। তারা যা উদ্ভাবন করছিল তার জন্য তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।

আর তারা বলে, "এই জন্তুগুলোর পেটে যা আছে তা কেবল আমাদের পুরুষদের জন্য এবং আমাদের নারীদের জন্য হারাম। কিন্তু যদি তা মৃত হয়, তবে তাদের সকলেরই তাতে অংশ আছে।" তিনি তাদের এই বর্ণনার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী।

যারা তাদের সন্তানদেরকে নির্বোধতার বশবর্তী হয়ে অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক হারাম করেছে, আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সঠিক পথে আসেনি।

আর তিনিই সেইজন যিনি বাগান সৃষ্টি করেন, [উভয়] [উভয়] [উভয়] [উভয়] [উভয়] [উভয়] [উভয়] [উভয়] [উভয়] [উভয়] খাদ্যের খেজুর গাছ এবং বিভিন্ন ধরণের খাদ্য শস্য এবং জলপাই এবং ডালিম, একই রকম এবং বিচিত্র। যখন ফল আসে তখন তার ফল খাও এবং তার ফসল কাটার দিনে তার হক[যাকাত] প্রদান করো। এবং অতিরিক্ত ব্যবহার করো না। নিশ্চয়ই তিনি অতিরিক্ত ব্যবহারকারীদের পছন্দ করেন না।

আর চরা গবাদি পশুর মধ্যে রয়েছে বোঝা বহনকারী এবং [অত্যন্ত ছোট]। আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আটটি জোড়া, ভেড়ার মধ্যে দুটি এবং ছাগলের মধ্যে দুটি। বলুন, "তিনি কি দুটি নর নিষিদ্ধ করেছেন, না দুটি মাদী, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে আমাকে জ্ঞানের সাথে বলো।"

আর উটের মধ্যে দুটি এবং গবাদি পশুর মধ্যে দুটি। বলো, "তিনি কি দুটি নর নিষিদ্ধ করেছেন, না দুটি মাদী, না যা দুটি মাদীর পেটে আছে? নাকি তোমরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলে যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন? তাহলে তার চেয়ে বড় অন্যায়কারী কে যে জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"

"বল, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে আমি এমন কিছু পাই না যা কোন ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ, যদি না তা মৃত প্রাণী, ঝরে পড়া রক্ত অথবা শূকরের মাংস হয়। কারণ তা অবশ্যই অপবিত্র, অথবা অবাধ্যতার সাথে জবাই করা হয়, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি বাধ্য হয়, সে ইচ্ছা করে না এবং সীমা লঙ্ঘন করে না, তবে তোমার পালনকর্তা অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

আর যারা ইহুদী, তাদের জন্য আমি নিষিদ্ধ করেছি খুরবিহীন সকল পশু ; আর গরু ও ভেড়ার চর্বি তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছি, কিন্তু যা তাদের পিঠে, অন্ত্রে অথবা হাড়ের সাথে লেগে থাকে। [এভাবেই] আমরা তাদের পাপের প্রতিফল দিয়েছি। আর অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।

অতএব, যদি তারা তোমাকে অস্বীকার করে, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], তাহলে বলো, "তোমাদের পালনকর্তা প্রশস্ত করুণার অধিকারী; কিন্তু অপরাধীদের উপর থেকে তাঁর শাস্তি প্রতিহত করা যাবে না।"

যারা আল্লাহর সাথে শিরক করেছিল তারা বলবে, "যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরাও [কিছু] শরীক করতাম না, আমাদের পূর্বপুরুষরাও করত না এবং আমরাও কিছু নিষিদ্ধ করতাম না।" পূর্ববর্তীরা একইভাবে অস্বীকার করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করল। বলুন, "তোমাদের কাছে কি এমন কোন জ্ঞান আছে যা তোমরা আমাদের জন্য উপস্থাপন করতে পারো? তোমরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করো এবং তোমরা কেবল ভুল সিদ্ধান্তে আচ্ছন্ন।"

বলো, "আল্লাহর কাছেই সুদূরপ্রসারী যুক্তি আছে। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।"

বলুন, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমাদের সাক্ষীদের নিয়ে এসো যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এটি নিষিদ্ধ করেছেন।" আর যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদের সাথে সাক্ষ্য দিও না। আর যারা আমার নিদর্শনগুলিকে অস্বীকার করে এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, অথচ তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে [অন্যদের] সমতুল্য করে।

"বল, এসো, আমি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা পাঠ করে শোনাই। [তিনি আদেশ করেন] যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তোমাদের এবং তাদের জীবিকা প্রদান করব। আর অশ্লীল কাজের কাছেও যেও না, যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন। আর আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন, তাকে হত্যা করো না [আইনী] বৈধ কারণ ছাড়া। তিনি তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা বুদ্ধি ব্যবহার করো।"

আর এতিমের সম্পত্তির কাছে যেও না, বরং উত্তম পন্থা ব্যতীত, যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে পৌঁছায়। আর ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ মাপ ও ওজন দাও। আমরা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে অন্য কিছুর জন্য দায়ী করি না। আর যখন তোমরা কথা বলো, তখন ন্যায়বিচার করো, যদিও তা নিকটাত্মীয়ের ক্ষেত্রে হয়। আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো। তিনি তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা মনোযোগ দাও।

আর, [তাছাড়া], এটাই আমার সরল পথ, তাই তোমরা এটি অনুসরণ করো; এবং [অন্যান্য] পথ অনুসরণ করো না, নাহলে তোমরা তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তিনি তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পারো।"

অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যা সৎকর্মশীলদের উপর [আমাদের অনুগ্রহ] পূর্ণ করে এবং সবকিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা, পথনির্দেশনা ও রহমতস্বরূপ, যাতে তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

আর এই [কুরআন] এমন একটি কিতাব যা আমি অবতীর্ণ করেছি [যা] বরকতময়, সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।

[আমরা পবিত্র কুরআন নাযিল করেছি] যাতে তোমরা না বলো যে, "আমাদের পূর্বে কেবল দুটি দলের উপরই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম।"

অথবা তোমরা যেন না বলো, "যদি আমাদের উপর কিতাব নাযিল হত, তাহলে আমরা তাদের চেয়ে বেশি সৎপথপ্রাপ্ত হতাম।" অতএব, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশনা ও করুণা এসেছে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বেশি যালিম আর কে? যারা আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের আমরা তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে আরও খারাপ শাস্তি দেব।

তারা কি কেবল এই অপেক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে অথবা তোমার প্রতিপালক আসবে অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন কোন ব্যক্তির ঈমান লাভের কোন সুযোগ থাকবে না, যতক্ষণ না সে পূর্বে ঈমান এনেছে অথবা ঈমানের মাধ্যমে কোন কল্যাণ অর্জন করেছে। বলো, "অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করছি।"

নিশ্চয়ই যারা তাদের ধর্মকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তুমি [নবী মুহাম্মদ, সা.] তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখো না। তাদের ব্যাপার কেবল আল্লাহর উপর নির্ভরশীল; তারপর তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

যে ব্যক্তি [কিয়ামতের দিন] একটি সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তার দশগুণ পাবে, আর যে ব্যক্তি মন্দকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে তার সমান প্রতিদান ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হবে না এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

তুমি বলো, "নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছেন - একটি সঠিক ধর্ম - ইব্রাহিমের পথ, যিনি সত্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এবং তিনি আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"

"বল, আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু, সবই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রথম মুসলিম।"

বলুন, "আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসেবে খুঁজব, অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক? প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের উপর দোষ চাপিয়ে দেয় না, এবং কোন ভার বহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন তিনি তোমাদেরকে সেই বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।"

আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কাউকে কাউকে অন্যের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা শাস্তিদানে দ্রুত; কিন্তু তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

যখন কেউ ইসলামী শিক্ষার আলোকে তাদের চারপাশের জগৎ এবং ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে যে, মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৩৪:

"নিশ্চয়ই, তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে..."

যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে, আল্লাহ তাদেরকে উভয় জগতে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে মানসিক শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা অব্যাহত রেখে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্যহীনতা এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেকের স্থানচ্যুতির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধা দেখা দেবে, এমনকি তারা পার্থিব জিনিস উপভোগ করলেও। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় কেন উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে মনের শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

এবং ৬ষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৩৪:

"... *এবং তোমরা [আল্লাহকে] ব্যর্থ করবে না।"*

অতএব, যারা তাঁর আনুগত্য করে তাদের জন্য মানসিক শান্তির প্রতিশ্রুতি এবং যারা তাঁর অবাধ্য হয় তাদের জন্য চাপের প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ অতীতের এবং তাদের চারপাশের লোকদের কর্মকাণ্ড ইসলামী শিক্ষার আলোকে পর্যবেক্ষণ করে। ষষ্ঠ সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৩৪:

"নিশ্চয়ই, তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা আসবেই, আর তোমরা [আল্লাহকে] ব্যর্থ করতে পারবে না।"

এই আয়াতটি বিচার দিবসের প্রতিশ্রুতির কথাও নির্দেশ করে যখন মানুষকে তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আবার, বিচার দিবসের অনিবার্য আগমন এবং তাদের জবাবদিহিতা নির্ধারণ করার জন্য কেবল একটু চিন্তা করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করার সময়, ভারসাম্যের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে একটি আদর্শ দূরত্বে অবস্থিত। যদি এটি আরও সামান্য কাছাকাছি বা দূরে থাকত, তবে এটি বসবাসের অযোগ্য হত। একইভাবে, জলচক্র, যার মধ্যে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবন এবং বৃষ্টিপাতের জন্য এর পরবর্তী ঘনীভবন অন্তর্ভুক্ত, পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ, যা পৃথিবীতে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে দেয়। ভূমি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতিতে ডিজাইন করা হয়েছে, যা সূক্ষ্ম শাখা এবং বীজের অঙ্কুর ভেঙে ফসল সরবরাহ করতে সক্ষম করে, পাশাপাশি ভারী ভবনগুলিকে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এর মতো অসংখ্য উদাহরণ কেবল একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয় না বরং ভারসাম্যও তুলে ধরে। যাইহোক, এই পৃথিবীর একটি উল্লেখযোগ্য দিক স্পষ্টতই ভারসাম্যহীন: মানবতার কর্মকাণ্ড। এই জীবনে শাস্তি এড়াতে নিপীড়ক এবং অত্যাচারী ব্যক্তিদের দেখা সাধারণ। বিপরীতে, অনেক মানুষ তাদের ধৈর্যের পূর্ণ প্রতিদান না পেয়েই জুলুম ও অন্যান্য কষ্ট ভোগ করে। অনেক মুসলিম যারা বিশ্বস্তভাবে আল্লাহকে মেনে চলেন, তারা প্রায়শই এই পৃথিবীতে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন এবং তাদের প্রতিদানের খুব সামান্য অংশ পান, অন্যদিকে যারা প্রকাশ্যে আল্লাহকে

অমান্য করেন, তারা পার্থিব বিলাসিতা ভোগ করেন। ঠিক যেমন আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, তেমনি কর্মের জন্য পুরস্কার এবং শাস্তিও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিত। তবে, এই পৃথিবীতে এটি স্পষ্ট নয়, যা ইঙ্গিত দেয় যে এটি অন্য সময়ে ঘটতে হবে, বিশেষ করে বিচারের দিনে।

মহান আল্লাহ, এই জীবনে সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত এবং শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা রাখেন। তবে, এখানে তিনি সম্পূর্ণরূপে শাস্তি না দেওয়ার একটি কারণ হল মানুষকে সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের কর্মের উন্নতি করার জন্য অনেক সুযোগ দেওয়া। তিনি এই জীবনে মুসলমানদের পূর্ণ পুরষ্কারও দেন না কারণ এই পৃথিবী জান্নাত নয়। তাছাড়া, ঈমানের মধ্যে রয়েছে অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস রাখা, বিশেষ করে পরকালে মুসলমানদের জন্য অপেক্ষা করা সম্পূর্ণ পুরষ্কার। প্রকৃতপক্ষে, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসই ঈমানকে অনন্য করে তোলে। যদি কেউ কেবল যা দেখতে পায় তাতে বিশ্বাস করে, যেমন এই জীবনে পূর্ণ পুরষ্কার পাওয়া, তাহলে ঈমান এত বিশেষ হত না।

এছাড়াও, পূর্ণ শাস্তির ভয় এবং পরকালে পূর্ণ প্রতিদানের আশা একজন ব্যক্তিকে পাপ এড়িয়ে ভালো কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রতিফল দিবস শুরু হওয়ার জন্য, এই ভৌত জগতের অবসান অবশ্যই হতে হবে। এটি প্রয়োজনীয় কারণ শাস্তি এবং পুরষ্কার কেবল প্রত্যেকের কর্ম বন্ধ হওয়ার পরেই দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং, প্রতিফল দিবসটি মানুষের কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘটতে পারে না। এর অর্থ হল বস্তুগত জগতকে অবশেষে শেষ করতে হবে।

এই আলোচনা সম্পর্কে চিন্তা করলে বিচার দিবসের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পারে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে প্রাপ্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এর জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত হতে পারে। এইভাবে, তারা এই জীবন এবং পরবর্তী জীবনে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পেতে পারে। সূরা ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ২২:

"কারণ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রতিটি প্রাণী তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ১৩৪-১৩৫:

" নিশ্চয়ই, তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই আসবে এবং তোমরা [আল্লাহকে] ব্যর্থ করতে পারবে না। বলো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের অবস্থান অনুযায়ী কাজ করো; [কারণ, আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কারা পরকালে উত্তরাধিকারী হবে..""

কিন্তু যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করা, তারা বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার সত্যতা উপেক্ষা করবে এবং ফলস্বরূপ, তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে থাকবে। ফলস্বরূপ, তারা একটি অস্থির

মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার সাথে শেষ হবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত থাকবে না। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হবে, এমনকি তাদের কিছু বস্তুগত আরাম থাকলেও। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৩৫:

"... আর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কে এই পরিবারে উত্তরাধিকারী হবে। নিশ্চয়ই জালেমরা সফল হবে না।"

এরপর আল্লাহ তাআলা বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার বাস্তবতা উপেক্ষাকারীদের মনোভাবের একটি উদাহরণ দেন এবং এটি কীভাবে পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৩৬:

"আর তারা আল্লাহর জন্য তাঁর সৃষ্টি ফসল ও পশুপাখির একটি অংশ নির্ধারণ করে এবং তাদের দাবি অনুসারে বলে, "এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের [তাঁর সাথে যুক্ত] অংশীদারদের জন্য।"..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে যারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেয় না তারা অনিবার্যভাবে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যকে সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো অন্যান্য জিনিসের প্রতি তাদের আনুগত্যের সাথে মিশিয়ে দেবে।

ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি তাদের বিশ্বাসকে একটি আবরণের মতো বিবেচনা করবে যা তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে পরতে এবং খুলতে পারে। বাস্তবে, যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনার উপাসনা করছে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

এই মনোভাব পরিহার করা উচিত এবং এর পরিবর্তে বুঝতে হবে যে ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি যা পার্থিব বা ধর্মীয় যে কোনও পরিস্থিতিতেই মেনে চলতে হবে। কেবলমাত্র এই মনোভাবের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারবেন, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার মাধ্যমে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকার মাধ্যমে।

কিন্তু যারা সঠিক আচরণ করতে ব্যর্থ হয় তারা অনিবার্যভাবে তাদের নিজস্ব আচরণবিধি গ্রহণ করবে যা তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে পরিবর্তন করবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৩৬:

"...এবং বলে, "এটা আল্লাহর জন্য," তাদের দাবি অনুসারে, "এবং এটা আমাদের [তাঁর সাথে যুক্ত] অংশীদারদের জন্য।" কিন্তু যা তাদের "শরীকদের" জন্য তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, আর যা আল্লাহর জন্য - তা তাদের "শরীকদের" কাছে পৌঁছায়। তারা যা শাসন করে তা কতই না মন্দ।"

মানুষের তৈরি আচরণবিধিকে তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এই মনোভাব সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এমনকি ধর্মকেও মানুষ তাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজেদেরকে অস্থির অবস্থায় দেখতে পাবে, তারা তাদের চারপাশের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তারা তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং বাধার সৃষ্টি হবে, এমনকি তারা পার্থিব জিনিস উপভোগ করলেও।

অধিকন্তু, যখন কেউ তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর তাদের আচরণবিধি ভিত্তি করে, তখন তারা অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদেরকে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেবে। ফলস্বরূপ, তারা মানুষের উপর অন্যায় করবে এবং সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ও অবিচার ছড়িয়ে দেবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৩৭:

"আর একইভাবে, অনেক মুশরিকের কাছে তাদের অংশীদাররা তাদের সন্তানদের হত্যাকে আনন্দদায়ক করে তুলেছে যাতে তাদের ধ্বংস হয় এবং তাদের ধর্মে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া যায়..."

আরবের অমুসলিমরা প্রায়শই দারিদ্র্যের ভয়ে তাদের সন্তানদের হত্যা করত, কারণ তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল যে, তাদের নয়, বরং আল্লাহই রিজিকদাতা। প্রকৃতপক্ষে,

আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি আগে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রিজিক বরাদ্দ করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অতএব, নিজেদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য বৈধ রিজিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য পালন করা উচিত এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের নির্ধারিত রিজিক তাদের কাছে পৌঁছাবে, এমনকি যদি তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে কীভাবে।

তাছাড়া, আরবের অমুসলিমরা প্রায়ই তাদের নবজাতক কন্যাদের হত্যা করত কারণ তারা ভুল করে ভেবেছিল যে কন্যা সন্তান জন্মদান তাদের পরিবারের জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। কন্যা সন্তানের প্রতি এই অপছন্দ একটি ভুল মানসিকতার প্রতিফলন ঘটায় যা ইসলামের নীতির পরিপন্থী। বাস্তবে, কন্যা সন্তান জন্মদানের প্রতি বিতৃষ্ণা মুশরিকদের একটি বৈশিষ্ট্য, এবং সর্বদা এই ধরনের মনোভাব থেকে দূরে থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৫৮-৫৯:

" আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের খবর দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃখ চেপে রাখে। তাকে যে মন্দ সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার কারণে সে নিজেকে লোকদের থেকে লুকিয়ে রাখে। সে কি তাকে অপমানিত অবস্থায় রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে দেবে? নিঃসন্দেহে, তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা খুবই মন্দ।"

এটা অবাক করার মতো যে, অনেক মুসলিম, বিশেষ করে এশীয়রা প্রায়শই ছেলেদের পছন্দ করে এবং এই ভুল ধারণা পোষণ করে যে কন্যা হলে তাদের কম খুশি হওয়া উচিত। তবে, ইসলামী শিক্ষায়, পুত্রদের জন্য কন্যা সন্তান হওয়ার সুসংবাদ একইভাবে উল্লেখ করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদের ৭৮ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুটি কন্যা সন্তানকে

সঠিকভাবে লালন-পালনকারী পিতামাতাদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যদিও আজকের পৃথিবীতে বাবা-মায়েরা ছেলের চেয়ে কন্যা সন্তানকে নিয়ে বেশি চিন্তিত হতে পারেন, তার অর্থ এই নয় যে, ছেলের পরিবর্তে কন্যা সন্তান হলে মুসলিম পিতামাতাদের কম আনন্দ বোধ করা উচিত। তাদের মনে রাখা উচিত যে তাদের দায়িত্ব হল ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করা এবং তাদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা নয়, কারণ এটি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের উপর সঠিক নির্দেশনা জোর করে চাপিয়ে দেন না, কারণ এটি এই পৃথিবীর জীবনের পরীক্ষাকে বাতিল করে দেবে, তাই তিনি মানুষকে এই পৃথিবীতে তাদের আচরণবিধি অনুসরণ করার অনুমতি দেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৩৭:

"... আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে তারা তা করত না..."

কিন্তু তিনি মুসলমানদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, এই ধরণের লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলুন, এই পৃথিবীতে তাদের নিজস্ব আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করুন, নির্দেশনার দুটি উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করার পরিবর্তে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৩৭:

"... তাহলে তাদেরকে এবং তারা যা কিছু বানায় তা ছেড়ে দাও।"

ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি নির্ভর করা হয়, এমনকি যদি তা ভালো কাজের ফলাফলও দেয়, তবুও তারা হেদায়েতের দুটি প্রধান উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর ভিত্তি করে না এমন যেকোনো কিছু আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। অধিকন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎস যত বেশি অনুসরণ করবেন, তত বেশি তারা এমন অভ্যাসে লিপ্ত হতে শুরু করবেন যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। এভাবেই শয়তান ধীরে ধীরে ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যায় পড়া একজন ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। যদি সেই ব্যক্তি অজ্ঞ থাকে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎস অনুসরণ করার প্রবণতা রাখে, তাহলে তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দিতে পারে এবং এমন আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করতে পারে যা সরাসরি ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করে। তারা এমনকি আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন বিশ্বাস পোষণ করতে শুরু করতে পারে যা ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করে, যেমন মনে করা যে মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের বোধগম্যতা নির্দেশনার দুটি প্রধান উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে আসে। এই বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস এবং অনুশীলনগুলির মধ্যে কিছু সম্পূর্ণ অবিশ্বাস, যেমন কালো জাদুতে জড়িত হওয়া। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

ফলস্বরূপ, একজন মুসলিম তাদের অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তারা ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে। এই কারণেই এমন ধর্মীয় উদ্ভাবন অনুসরণ করা যা নির্দেশনার দুটি প্রধান উৎসের উপর ভিত্তি করে নয়, শয়তানকে অনুসরণ করার মতো। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ আচার-আচরণ যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক, তা সে পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, তাই মহান আল্লাহ, যারা নিজেদের আচরণবিধি তৈরি করে তাদের উভয় জগতের শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করে দেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৩৮:

“ আর তারা বলে, “এই পশুপাখি এবং ফসল নিষিদ্ধ; আমরা যাদের ইচ্ছা তাদের ছাড়া কেউ এগুলো খেতে পারবে না,” তাদের দাবি অনুসারে। আর কিছু [প্রাণী] আছে যাদের পিঠ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কিছু যাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি - [এগুলো] তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন। তারা যা উদ্ভাবন করছিল তার জন্য তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।”

তাদের শাস্তি হবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহারের সরাসরি ফলাফল। ফলস্বরূপ, তারা নিজেদেরকে এক অনিশ্চিত মানসিক ও শারীরিক অবস্থার মধ্যে দেখতে পাবে, তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় ফেলে দেবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং বাধার সৃষ্টি হবে, এমনকি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যখন কেউ তাদের নিজস্ব আচরণবিধি অনুসারে কাজ করে, তখন তারা মানুষের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ অন্যদের প্রতি অন্যায় করে, যার ফলে সমাজে দুর্নীতি ও অবিচার ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, এই মনোভাব সমাজের মধ্যে নারীর মতো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিপীড়নের উৎস ছিল এবং এখনও আছে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৩৯:

" আর তারা বলে, "এই পশুদের পেটে যা আছে তা কেবল আমাদের পুরুষদের জন্য এবং আমাদের নারীদের জন্য হারাম। কিন্তু যদি তা মৃত অবস্থায় জন্মায়, তাহলে তাদের সকলেরই তাতে অংশ আছে।" তিনি তাদের বর্ণনার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেবেন..."

দুঃখের বিষয় হলো, যদিও ঐশী শিক্ষা সর্বদা মানুষকে সমাজের মধ্যে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর, যেমন নারীদের, উপর নিপীড়ন দূর করে মানুষের অধিকার পূরণে উৎসাহিত করেছে, তবুও আধুনিক যুগে মানুষ ইসলামকে অবিচারের জন্য দায়ী করে। যেহেতু একমাত্র আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, সবকিছু জানেন, তাই তিনিই একমাত্র নিখুঁত এবং নিরপেক্ষ আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা নিশ্চিত করে যে সকলের অধিকার

পূরণ হচ্ছে এবং সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রসার ঘটছে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৩৯:

"... নিশ্চয়ই, তিনি প্রজ্ঞাময় এবং জ্ঞানী।"

এই সত্য উপেক্ষা করা এবং অন্যান্য আচরণবিধি অনুসরণ করা সমাজে নিপীড়নের মূল।

সাধারণভাবে, ইসলামের উত্থানের আগে এবং আজকের কিছু অঞ্চলে, নারীদের প্রায়শই গাড়ির মতো সম্পত্তির মতো বিবেচনা করা হত। তাদের পশুপালের মতো কেনা-বেচা করা যেত। বিবাহ সহ জীবনের কোনও অংশে একজন মহিলার কোনও অধিকার ছিল না। মহিলারা কোনও উত্তরাধিকার পেতেন না এবং পরিবর্তে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হতেন। তাদের পুরুষদের মালিকানাধীন হিসাবে দেখা হত, যদিও তারা নিজেরাই কোনও কিছুর মালিক হতে পারত না। যদি একজন মহিলার কোনও সম্পত্তি থাকত, তবে তিনি কেবল তার পুরুষ আত্মীয়দের ইচ্ছামতো সেগুলি ব্যবহার করতে পারতেন। বিপরীতে, তার পুরুষ আত্মীয়রা তাদের ইচ্ছামতো তার সম্পদ ব্যয় করতে পারত। এই জীবনধারাকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি বা অধিকার তার ছিল না। ইউরোপের কিছু গোষ্ঠী এমনকি নারীদের মানুষের চেয়ে কম মনে করত, তাদের পশুর সমান করত। ধর্মে নারীদের কোনও ভূমিকা ছিল না, কারণ তাদের উপাসনার অযোগ্য বলে মনে করা হত। এমনকি কেউ কেউ মনে করত নারীরা আত্মাহীন প্রাণী। একজন পিতার পক্ষে তার নবজাতক বা ছোট মেয়েকে জীবন্ত কবর দেওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, কারণ তাদের পরিবারের জন্য লজ্জার উৎস হিসেবে দেখা হত এবং অকেজো এবং বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা হত। কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন যে একজন মহিলাকে হত্যা করলে

সমাজে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। কিছু প্রথার ফলে বিধবাদের মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হত, কারণ তাদের মৃত স্বামী ছাড়া বেঁচে থাকার অযোগ্য মনে করা হত। কিছু লোক বিশ্বাস করত যে, নারীর একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষদের সেবা করা।

কিন্তু মহান আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সকল মানুষকে সম্মান করা উচিত এবং ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচার আইনের অপরিহার্য অংশ। পুরুষরা নারীদের অধিকার রক্ষার জন্য দায়ী, ঠিক যেমন নারীরা পুরুষদের অধিকারের জন্য দায়ী। নারীদের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। তাদেরও পুরুষদের সমানভাবে তাদের জীবন, সম্পত্তির মালিকানা এবং নিজস্ব পছন্দ করার অধিকার রয়েছে। কেউই নারীকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারে না। যদি কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তার ইচ্ছা করলে বিবাহ বাতিল করার অধিকার রয়েছে। একজন পুরুষ একজন নারীর সম্মতি ছাড়া তার সম্পদ ব্যবহার করতে পারে না। একজন নারী বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর, কেউ তাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না যা সে করতে চায় না। পুরুষদের মতো সকল নারীরই উত্তরাধিকার লাভের অধিকার রয়েছে। তবে, তারা যে পরিমাণ উত্তরাধিকার লাভ করে তা পরিবারের মধ্যে তাদের দায়িত্বের উপর ভিত্তি করে। তাই এটি পুরুষদের সমান অংশ নয়, কারণ এটি অন্যায় হবে। নারীদের উপর ব্যয় করা এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করাকে আল্লাহ, মহিমান্বিত, ইবাদতের একটি কাজ বলে মনে করেন। এই সকল অধিকার এবং আরও অনেক কিছু নারীদেরকে আল্লাহ তাআলা ঐশী শিক্ষার মাধ্যমে প্রদান করেছেন। এটা পরিহাসের বিষয় যে, আজ যারা নারীর অধিকারের পক্ষে কথা বলেন তারা প্রায়শই ইসলামের সমালোচনা করেন, যা তাদের জন্মের অনেক আগে থেকেই নারীর অধিকারকে সমর্থন করে আসছে।

নতুন নতুন জিনিস তৈরির গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের আচরণবিধি তৈরি করে, মহান আল্লাহ এই মনোভাবকে নিরপরাধ মানুষ হত্যার

পাশে রেখেছেন, কারণ মানুষের তৈরি আচরণবিধি অনুসরণ করলে মানুষের উপর অন্যায় হয়। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪০:

" যারা তাদের সন্তানদেরকে নির্বোধতার সাথে অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক হারাম করেছে, আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে..."

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি ঐশী আচরণবিধি উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে মানুষের তৈরি আচরণবিধি অনুসরণ করে, সে অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানুষের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হবে এবং পরিবর্তে তাদের উপর অন্যায় করবে। এর ফলে সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ও অবিচার ছড়িয়ে পড়বে। এই সত্যটি উপলব্ধি করার জন্য কেবল সেই সমাজগুলি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন যারা মানুষের তৈরি আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করেছিল। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৪০:

"... তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং [সঠিকভাবে] সৎপথপ্রাপ্ত হয়নি।"

সুতরাং, একজন ব্যক্তির উচিত তাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং অনুসরণ করা, এমনকি যদি তা তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হয়। তাদের একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ অনুসরণ করেন, বুঝতে পারেন যে এটি তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে, এমনকি

যখন অপ্রীতিকর ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাসের মুখোমুখি হন। ঠিক যেমন এই জ্ঞানী রোগী ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং অনুসরণ করবেন তিনিও ভাল হবেন। কারণ একমাত্র মহান আল্লাহই একজন ব্যক্তিকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী। এবং সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং শান্তি ছড়িয়ে পড়ার জন্য সমাজের সকলের অধিকার সঠিকভাবে পূরণ করা নিশ্চিত করার জন্য একমাত্র তাঁরই জ্ঞান রয়েছে। ব্যাপক গবেষণা সত্ত্বেও, মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার বোধগম্যতা এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট হবে না, কারণ তারা জীবনে একজন ব্যক্তির সম্মুখীন হওয়া প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না। তাদের নির্দেশনা সকল ধরণের মানসিক এবং শারীরিক চাপ প্রতিরোধ করতে পারে না, এবং সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে অবস্থান করতে সহায়তা করতে পারে না। এই জ্ঞান কেবল মহান আল্লাহ তাআলারই আছে, যা তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতিকে প্রদান করেছেন। যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না তাদের পর্যবেক্ষণ করলে এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বুঝতে পারে না এবং এভাবে অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারকে প্রশ্নবিদ্ধভাবে বিশ্বাস করে, তবুও আল্লাহ তাআলা ব্যক্তিদের ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করেন যাতে তারা তাদের জীবনে এর উপকারী প্রভাবগুলি বুঝতে পারে। তিনি মানুষকে অন্ধভাবে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেন না; বরং তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে এর সত্যতা স্বীকার করুক। তবে, এর জন্য একজন ব্যক্তির খোলামেলা এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের একমাত্র শাসক, মনের শান্তির আবাসস্থল, তাই তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নির্ধারণ করেন কে তা গ্রহণ করবে এবং কে করবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরই মানসিক প্রশান্তি প্রদান করবেন যারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করেন।

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা প্রমাণ পেশ করেন যে, কেন একজন ব্যক্তিকে তাঁর দেওয়া আচরণবিধি অনুসরণ করা উচিত, যা তিনি মানবজাতিকে একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে দিয়েছেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪১:

" আর তিনিই সেইজন যিনি বাগান সৃষ্টি করেন, [উভয়] মাচাযুক্ত এবং মাচাবিহীন, এবং খেজুর গাছ এবং বিভিন্ন ধরণের খাদ্যের ফসল, এবং জলপাই এবং ডালিম, যা একই রকম এবং বিসদৃশ..."

যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই একজন ব্যক্তির প্রতিটি আশীর্বাদ সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন, তাই তাঁর আদেশ অনুসারে এই আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করাই সঠিক। একমাত্র তিনিই জানেন কিভাবে এগুলি ব্যবহার করা উচিত যাতে একজন ব্যক্তি মানসিক ও শারীরিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার মাধ্যমে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করতে পারে, সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনে স্থান দিতে পারে এবং মানুষের অধিকার পূরণ করতে পারে যাতে সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৪১:

"... যখন ফল আসে তখন তার ফল খাও এবং ফসল কাটার দিনে তার হক [যাকাত] দাও..."

কিন্তু যে ব্যক্তি এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয়, সে অবশ্যই প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪১:

"... আর বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই তিনি বাড়াবাড়িকারীদের পছন্দ করেন না।"

ফলস্বরূপ, তারা একটি দুর্বল মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার মধ্যে শেষ হবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং বাধার সৃষ্টি হবে, যদিও তারা বস্তুগত আরাম উপভোগ করতে পারে। এবং তারা অনিবার্যভাবে মানুষের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে এবং

পরিবর্তে তাদের উপর অন্যায় করবে। ফলস্বরূপ, সমাজের মধ্যে অবিচার এবং দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে।

মহান আল্লাহ তাঁর কিছু অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে চলেছেন যা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়, যেমন নিজের রিযিক অনুসন্ধানের উপায়। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪২:

" আর চরানো গবাদি পশুদের মধ্যে রয়েছে [বোঝা বহনকারী] এবং [খুব] ছোট..."

যেহেতু মহান আল্লাহ এই পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনিই একমাত্র জানেন কোনটি তাদের জন্য ভালো ও পবিত্র এবং কোনটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪২:

"... আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না..."

কিন্তু যেহেতু শয়তান মানবজাতির শত্রু, তাই সে চায় যেন মানুষ আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঐশ্বরিক আচরণবিধি উপেক্ষা করে, যা নিশ্চিত করে যে তারা এই পৃথিবীর ভালো ও পবিত্র জিনিসগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং ক্ষতিকারক

জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে। পরিবর্তে শয়তান চায় যে মানুষ আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি আচরণবিধি অনুসরণ করুক যাতে তারা ক্ষতিকারক জিনিসগুলি অর্জন করে এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের জন্য সৃষ্ট ভালো ও পবিত্র জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৪২:

"...এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।"

অতএব, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত ঐশ্বরিক আচরণবিধি মেনে চলতে হবে, পার্থিব, যেমন খাওয়া, অথবা ধর্মীয়, সকল পরিস্থিতিতেই। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করছে। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে সহায়তা করবে, যা তাদেরকে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম করবে। ফলস্বরূপ, এই পদ্ধতি উভয় জগতেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মানবসৃষ্ট আচরণবিধি অনুসরণ করে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সে অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক এবং শারীরিকভাবে অস্থিরতা অনুভব করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবাইকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তারা তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকবে না। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, বাধা এবং চ্যালেঞ্জ দেখা দেবে, যদিও তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে।

এরপর মহান আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে মানুষের তৈরি আচরণবিধি অনুসরণ না করে, কারণ এগুলো ভিত্তিহীন এবং

ইসলামী আচরণবিধির মতো জ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪৩-১৪৪:

“[তারা] আটটি জোড়া- ভেড়ার দুটি এবং ছাগলের দুটি। বলুন, "তিনি কি দুটি নর নিষিদ্ধ করেছেন, না দুটি মাদী, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" এবং উটের দুটি এবং গরুর দুটি। বলুন, "তিনি কি দুটি নর নিষিদ্ধ করেছেন, না দুটি মাদী, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? নাকি তোমরা সাক্ষী ছিলে যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন? তাহলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে?..."

মহান আল্লাহ জোর দিয়ে বলেন যে, যেহেতু মানুষের তৈরি আচরণবিধি পার্থিব কামনা-বাসনার উপর ভিত্তি করে তৈরি, তাই এগুলি অনিবার্যভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে কারণ এগুলি মানুষকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪৪:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"

এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। যেহেতু ইসলাম যুক্তি এবং স্পষ্ট প্রমাণের উপর ভিত্তি করে

তৈরি, তাই তাদের নিজেদের স্বার্থে এগুলি বোঝার এবং সেগুলি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতেই মনের গতির দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, অন্যদের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে, পার্থিব বা ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, এমনকি যদি তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত সর্বদা সঠিক হয় না। পরিবর্তে, তাদের জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যুক্তি এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম ধর্মীয় বিষয়েও অবিবেচক অনুকরণের কাজকে দৃঢ়ভাবে নিন্দা করে, বরং ইসলামী জ্ঞানের সাধনা এবং স্পষ্ট বোধগম্যতার সাথে এর প্রয়োগকে উৎসাহিত করে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এরপর মহান আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট উদাহরণের মাধ্যমে জ্ঞান এবং প্রমাণের উপর আমল করার গুরুত্বের উপর জোর দেন। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪৫:

"বলুন, "আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে আমি এমন কিছু পাই না যা কারো জন্য নিষিদ্ধ, যদি না তা মৃত প্রাণী, ঝরে পড়া রক্ত অথবা শুকরের মাংস হয় - কারণ তা অবশ্যই অপবিত্র - অথবা অবাধ্যতার সাথে জবাই করা হয়, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়..."

সমসাময়িক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে পচনশীল দেহ, রক্ত এবং শুয়োরের মাংস খাওয়া অস্বাস্থ্যকর। আল্লাহ ব্যতীত অন্য সত্তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা প্রাণী খাওয়া আধ্যাত্মিক ক্ষতির কারণ হতে পারে যা একজন ব্যক্তির ঈমানকে দুর্বল করে দিতে পারে। এই ক্রিয়াকলাপগুলি এমন বিশ্বাস তৈরি করতে পারে যে এই অন্যান্য সত্তাগুলি ইহকাল এবং পরকালে সুবিধা প্রদান করতে পারে। এই ধরণের চিন্তাভাবনা ঐতিহাসিকভাবে বহুঈশ্বরবাদের দিকে পরিচালিত করেছে এবং একজন মুসলিমকে নীরবে অনুরূপ ধারণার দিকে পরিচালিত করতে পারে, এমনকি যদি এই প্রবণতাগুলি তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 39 আয যুমার, আয়াত 3:

"নিঃসন্দেহে, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ধর্ম। আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে [বলে], "আমরা কেবল তাদের উপাসনা করি এজন্য যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।"..."

অন্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার ফলে ইহকাল ও পরকালে সাহায্য ও মুক্তির জন্য তাদের উপর নির্ভরতা তৈরি হতে পারে, যা অনিচ্ছাকৃতভাবে অলস ও ভুল চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করতে পারে। এই ধরণের চিন্তাভাবনা মানুষকে এই ভুল ধারণার আওতায় ক্রমাগত আল্লাহকে অমান্য করতে বাধ্য করে যে অন্য কেউ তাদের উভয় জীবনেই রক্ষা করবে। এই মানসিকতা শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই সমস্যা ও দুঃখকষ্টের দিকে পরিচালিত করে। অতএব, আলোচিত মূল আয়াতগুলিতে তুলে ধরা হয়েছে যে মুসলমানদের উচিত অন্যদের অনুমোদনের পরিবর্তে তাঁকে খুশি করার জন্য কাজ করে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আন্তরিকতা গড়ে তোলা। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুশি করার জন্য কাজ করে, তারা তাঁর কাছ থেকে কোনও প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযীতে ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই সতর্কীকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের সীমা এবং জীবনে তারা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে তা জানেন। ফলস্বরূপ, তিনি সর্বদা এই পরিস্থিতিতে ছাড় প্রদান করেন। এটি ইসলামী আচরণবিধির নিখুঁত প্রকৃতিকে আরও তুলে ধরে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪৫:

"...কিন্তু যে ব্যক্তি [প্রয়োজনে] বাধ্য হয়, [তাকে] কামনা করে না এবং [তার সীমা লঙ্ঘন করে না], তাহলে নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এরপর আল্লাহ তাআলা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই বিদআত পরিহার এবং নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করার গুরুত্ব নির্দেশ করেন। তিনি বনী ইসরাঈলের উদাহরণ তুলে ধরেন, যারা এই ধরণের আচরণ করেছিল এবং ফলস্বরূপ বিপথগামী হয়ে পড়েছিল, কারণ এই মনোভাব অবশেষে তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনের সকল দিককে সংক্রামিত করেছিল। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪৬:

"আর যারা ইহুদী তাদের জন্য আমি নিষিদ্ধ করেছিলাম খুরবিহীন সকল পশু; এবং গরু ও ভেড়ার চর্বি তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম, তবে যা তাদের পিঠে, অন্ত্রে অথবা হাড়ের সাথে লেগে থাকে তা ছাড়া।"

বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত ছিল, তখন তিনি তাদের জন্য কিছু ভালো জিনিস নিষিদ্ধ করেছিলেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং

তাদের ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু না করে বরং তিনি তাদের যে ঐশ্বরিক আচরণবিধি দিয়েছিলেন তা মেনে চলে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪৬:

"...[এইভাবে] আমরা তাদের অন্যায়ের প্রতিফল দিয়েছি। এবং অবশ্যই, আমরা সত্যবাদী।"

যদিও মুসলিমরা যখন আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখবে, তখনও চূড়ান্ত ইসলামী আচরণবিধি পরিবর্তিত হবে না, তবুও তাদের এই ধরণের আচরণের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হবে কারণ এটি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক এবং শারীরিক উভয় অবস্থাতেই অস্থিরতার সম্মুখীন হবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। এর ফলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলা তৈরি হবে, এমনকি তারা কিছু পার্থিব আরাম উপভোগ করলেও। অতএব, তাদের নিজেদের স্বার্থে, সর্বদা এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে ইসলামী আচরণবিধি বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে, অন্যথায়, তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি পাবে না। সূরা 6 আল আন'আম, আয়াত 147:

"অতএব যদি তারা তোমাকে অস্বীকার করে, তাহলে বলো, "তোমাদের পালনকর্তা প্রশস্ত করুণার অধিকারী; কিন্তু অপরাধীদের উপর থেকে তাঁর শাস্তি প্রতিহত করা যাবে না।"

এরপর আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, প্রতিটি প্রজন্মের মানুষ যে ভিত্তিহীন যুক্তি দিয়ে এসেছেন, তা মিথ্যা প্রমাণ করে, যাতে তারা আল্লাহর দেওয়া ঐশ্বরিক আচরণবিধি অনুসরণ না করে মানবসৃষ্ট আচরণবিধি অনুসরণ করে তাদের আচরণকে ন্যায্যতা দান করতে পারে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪৮:

"যারা আল্লাহর সাথে শিরক করেছিল তারা বলবে, "যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরাও [কিছু] শরীক করতাম না, আমাদের পিতৃপুরুষরাও করত না, এবং আমরাও কিছু নিষিদ্ধ করতাম না।" পূর্ববর্তীরা একইভাবে মিথ্যারোপ করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছিল..."

এটা উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু ভাগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে গোপন থাকে, তাই এটি পাপ করার জন্য যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪৮:

"... বলুন, "তোমাদের কাছে কি এমন কোন জ্ঞান আছে যা তোমরা আমাদের জন্য উপস্থাপন করতে পারো? তোমরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করো এবং তোমরা কেবল অনুমান করছো।"

অধিকন্তু, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন মানুষকে ভাগ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না; বরং তিনি তাদের উদ্দেশ্য এবং কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, যা তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সূরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াত ২৩:

"তিনি যা করেন (অর্থাৎ ভাগ্য) সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, বরং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

যেহেতু একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং কর্মকাণ্ড একজন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে, তাই তাদের অনুভূতি নির্বিশেষে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে, একজন পুলিশ অফিসার যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের প্রশিক্ষণ এবং পুলিশ বাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত সরঞ্জামের অপব্যবহার করেন, তিনি তাদের কর্মের জন্য পুলিশ বাহিনীকে জবাবদিহি করতে পারবেন না। একইভাবে, একজন ব্যক্তি যখন আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতগুলির ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যবহার করে, বিশেষ করে যখন তিনি তাদেরকে সেই নিয়ামতগুলির সঠিক ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা দেন, তখন তাকে দোষারোপ করতে পারেন না।

তাছাড়া, এটা অদ্ভুত যে কেউ পাপ করার এবং দায়িত্ব এড়ানোর জন্য ভাগ্যকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে, অথচ যখন তারা অন্যদের কাছ থেকে অন্যায়ের মুখোমুখি হয়, তখন তারা ন্যায়বিচার খোঁজে এবং এই অবিচারটিও ভাগ্যের দ্বারা নির্ধারিত ছিল তা স্বীকার করতে অস্বীকার করে। সুতরাং, তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে, তারা তাদের অত্যাচারীকে জবাবদিহি করতে পারে না।

পরিশেষে, পাপ করার ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য ভাগ্যকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না কারণ ভাগ্য বলতে এই নয় যে, মহান আল্লাহ মানুষকে নির্দিষ্টভাবে কাজ করতে বাধ্য করেন। ভাগ্যের অর্থ কেবল এই যে, যেহেতু মহান আল্লাহ

মানুষের পছন্দ এবং কর্মকাণ্ড আগে থেকেই জানেন, তাই তিনি তাদের কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাদের উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড সম্পাদনের অনুমতি দিয়েছেন, কারণ তিনি মানুষের উপর সঠিক নির্দেশনা জোর করে চাপিয়ে দেন না, কারণ এতে এই পৃথিবীতে জীবনের লক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪৯:

"বলুন, "আল্লাহর কাছেই সুদূরপ্রসারী যুক্তি রয়েছে। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি তোমাদের সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতেন।"

অতএব, নিয়তি মানুষকে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করতে বাধ্য করে না, বরং, মানুষের তাদের কর্ম বেছে নেওয়ার স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং তাই উভয় জগতেই এর জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

মানুষের তৈরি আচরণবিধি অনুসরণ করে ভাগ্যকে আল্লাহর অবাধ্যতার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, তা স্পষ্ট করার পর, আল্লাহ, মহিমান্বিত, যারা তাদের মিথ্যা স্বভাব তুলে ধরার জন্য ভিত্তিহীন মানব তৈরি আচরণবিধি অনুসরণ করে তাদের কাছ থেকে যুক্তি এবং স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণ দাবি করেন। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫০:

"বলুন, তোমাদের সাক্ষীদের নিয়ে এসো যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এটা হারাম করেছেন।"...

মহান আল্লাহ মুসলিমদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন ভিত্তিহীন মানব রচিত আচরণবিধি অনুসরণ না করে, কারণ এটি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহারের মাধ্যমে কেবল পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫০:

"... আর যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদের সাথে সাক্ষ্য দিও না..."

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মানুষের তৈরি সকল আচরণবিধি কেবল পার্থিব আকাঙ্ক্ষার উপর নিহিত, জ্ঞান বা যুক্তির উপর নয় এবং ফলস্বরূপ, তারা পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সঠিক নির্দেশনার দিকে পরিচালিত করতে পারে না। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫০:

"... আর তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না..."

এরপর আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে কামনা-বাসনার মূল কারণ চিহ্নিত করেন। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫০:

"... আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না..."

যারা বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার উপর সঠিকভাবে বিশ্বাস করে না, তারা সর্বদা এমন জীবনযাপন করবে যার মূলে রয়েছে তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণ। এই নীতিটি বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার উপর কতটা বিশ্বাস করে তা মূল্যায়ন করার একটি ভাল উপায়। তাদের বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, তারা তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটবে এবং পূরণ করবে। বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার উপর তাদের বিশ্বাস যত দুর্বল হবে, তত বেশি তারা তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটবে এবং পূরণ করবে। ফলস্বরূপ, তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যাবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৫০:

"... আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, অথচ তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে অন্যদের সমতুল্য করে।"

অতএব, বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি তাদের বিশ্বাস মূল্যায়ন করা উচিত এবং প্রয়োজনে, খুব দেরি হওয়ার আগেই তাদের মনোভাব পরিবর্তন করা উচিত। সঠিক মনোভাব গ্রহণ করার জন্য, দৃঢ় ঈমান অর্জন করা আবশ্যক। দৃঢ় ঈমান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ব্যক্তিদের সকল পরিস্থিতিতে, তা অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক না কেন, মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ থাকতে সক্ষম করে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং শিক্ষাগুলি বোঝার এবং মেনে চলার মাধ্যমে এই দৃঢ়

ঈমান গড়ে তোলা হয়। এই শিক্ষাগুলি দেখায় যে, মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রশান্তি বর্ধন করে। বিপরীতে, যারা ইসলামী নীতিগুলিকে অবজ্ঞা করে তাদের ঈমান দুর্বল থাকে। এই ধরনের ব্যক্তিরা যখন তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা তাঁর আদেশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন তাদের পক্ষে আল্লাহর প্রতি অবাধ্য হওয়া সহজ হতে পারে, কারণ তারা স্বীকার করতে ব্যর্থ হয় যে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পক্ষে তাদের আকাঙ্ক্ষা সমর্পণ করা শেষ পর্যন্ত উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে ঈমানকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা মহান আল্লাহর প্রতি ধারাবাহিক আনুগত্যকে সক্ষম করে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো। এর মাধ্যমে, ব্যক্তিরা মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ রেখে এবং তাদের জীবনের সকল দিককে যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে।

মানুষের তৈরি আচরণবিধি এড়িয়ে চলার জন্য মানুষকে সতর্ক করার পর, মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামী আচরণবিধি অনুসরণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং ফলস্বরূপ উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫১:

"বলুন, "এসো, আমি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পাঠ করে শোনাই। [তিনি আদেশ করেন] যে তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না..""

মহান আল্লাহর সাথে শরীক করার মধ্যে রয়েছে বড় শিরক, যার মাধ্যমে কেউ কোন কিছুকে বা অন্য কাউকে তাদের উপাস্য হিসেবে আল্লাহর সাথে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে ছোট শিরক, যার মাধ্যমে কেউ আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার যেকোনো কিছু মেনে চলে, যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। অতএব, পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, প্রতিটি পরিস্থিতিতেই, মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থেকে উভয় প্রকারের কাজ এড়িয়ে চলতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি তাদের একটি সুসংগত মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে সহায়তা করবে, যা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে কার্যকরভাবে এবং সঠিকভাবে স্থান দিতে সক্ষম করবে, যখন তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হবে। ফলস্বরূপ, এই পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৫১:

"...এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার..."

তাদের লালন-পালনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাদের পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। ৩১ সূরা লুকমান, আয়াত ১৪:

"... আমার প্রতি এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো; আমারই দিকে [চূড়ান্ত] গন্তব্য।"

যদিও আল্লাহ তাআলা সকল আশীর্বাদের উৎস, তবুও তিনি প্রায়শই অন্যদের, যেমন পিতামাতাকে এই আশীর্বাদ প্রদানের জন্য ব্যবহার করেন। অতএব, অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার একটি উপায়। এই কারণেই জামে আত তিরমিযী, ১৯৫৪ নম্বরের একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অকৃতজ্ঞ সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না। পিতামাতার ক্ষেত্রে, একজনের উচিত সর্বদা তাদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের সাথে এমন আচরণ করা যেমন তারা তাদের সন্তানদের কাছ থেকে চায়। এর অর্থ হল আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সাহায্য সহ বিভিন্ন উপায়ে তাদের সহায়তা প্রদান করা। শিশুরা তাদের পিতামাতার সাথে মতবিরোধ করতে পারে, তবে এটি সর্বদা সম্মানের সাথে করা উচিত। ইসলামে, পিতামাতা বা অন্য কারও প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কোন ধারণা নেই। যদি এর অর্থ আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা হয় তবে তাদের পিতামাতার আনুগত্য করা উচিত নয় এবং এই ধরনের অবাধ্যতা এড়াতে তাদের বিনীতভাবে উৎসাহিত করা উচিত। একজন শিশুর জন্য ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের পিতামাতার অধিকার পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, এবং সংস্কৃতি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সামাজিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে নয়, যা প্রায়শই আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাংঘর্ষিক। যতক্ষণ না তারা তাদের পিতামাতার অধিকার পূরণে ইসলামী নির্দেশিকা অনুসরণ করে, ততক্ষণ তাদের অন্যদের, এমনকি তাদের পিতামাতাদের সমালোচনার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। একজন মুসলিমকে সর্বদা তাদের পিতামাতার আনুগত্য করতে হবে না, এমনকি আইনত পরিস্থিতিতেও, যেমন তাদের পিতামাতাকে খুশি করার জন্য তাদের নিজস্ব সুখ ত্যাগ করা, যতক্ষণ না তারা তাদের প্রতি সদাচরণ এবং শ্রদ্ধা বজায় রাখে। ক্রমাগত অন্যের সুখকে নিজের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তিক্ততা এবং দুঃখের অনুভূতি হতে পারে, বিশেষ করে যখন অন্য পক্ষ তাদের ত্যাগ স্বীকার বা প্রশংসা করতে ব্যর্থ হয়। একটি শিশুর উচিত তাদের পিতামাতা বা অন্যদের কাছ থেকে তাদের কর্মের জন্য পুরষ্কার চাওয়া নয় বরং আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার চাওয়া। এই পদ্ধতি তাদের ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই পুরষ্কার অর্জনে সহায়তা করবে, কারণ আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, কেবল তাদেরই

পুরস্কৃত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। জামে আত তিরমিযীর ৩১৫৪ নম্বর হাদিসে এই সতর্কীকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা কেবল তাদের পিতামাতার জন্য কাজ করে তারা দেখতে পারে যে লোকেরা প্রায়শই অকৃতজ্ঞ হয়, তাই তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি এবং প্রশংসা নাও পেতে পারে। এর ফলে তিক্ততা দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে যদি তারা তাদের পিতামাতার আনন্দের জন্য নিজেদের সুখ বিসর্জন দিয়ে থাকে। তিক্ততা অন্যের অধিকার পূরণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করতে পারে।

ঠিক যেমন একজন শিশুর তার পিতামাতার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং যত্ন প্রদর্শন করা উচিত, তেমনি একজন পিতামাতারও তার সন্তানের অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, যেমন পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই তাদের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৫১:

"... আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না; আমি তোমাদের এবং তাদের রিযিক দেব..."

ধর্মীয় বিষয়ে, একজন পিতামাতার অবশ্যই তাদের সন্তানকে উদাহরণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের গুরুত্ব শেখানো উচিত যাতে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয়। পার্থিব বিষয়ে, একজন পিতামাতার অবশ্যই তাদের সন্তানকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগাতে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাদের পার্থিব সাফল্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে যাতে এটি উভয় জগতে তাদের জন্য শান্তির উৎস হয়ে ওঠে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৫১:

"... আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না; আমি তোমাদের এবং তাদের রিযিক দেব..."

আরবের অমুসলিমরা প্রায়শই দারিদ্র্যের ভয়ে তাদের সন্তানদের হত্যা করত, তারা বুঝতে পারত না যে, মহান আল্লাহই প্রকৃত রিজিকদাতা, নিজেদের নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি আগে সমস্ত সৃষ্টির জন্য রিজিক নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, নিজেদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য বৈধ রিজিক অনুসন্ধানের দায়িত্ব পালন করা উচিত, এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের নির্ধারিত রিজিক তাদের কাছে আসবে, এমনকি তারা বুঝতে না পারলেও।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৫১:

"...এবং অনৈতিক কাজের কাছে যেও না..."

প্রথমত, লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা কেবল অনৈতিক কাজ না করে বরং অনৈতিক কাজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। অতএব, তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্য এবং পাপ থেকে দূরে থাকার মধ্যে রয়েছে কিছু জায়েজ জিনিস থেকে বিরত থাকা, কারণ এই ভয়ে যে, সেগুলো নিষিদ্ধের দিকে পরিচালিত করতে পারে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৭:

"...এগুলো আল্লাহর [নির্ধারিত] সীমা, তাই এর কাছে যেও না..."

আল্লাহ তাআলা তাঁর সীমা লঙ্ঘন করতে বলেননি; বরং তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে মানুষ যেন তাদের কাছেও না যায়। পবিত্র কুরআনে এই নির্দেশনা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে জান্নাতের একটি গাছের ফল না খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাকে গাছের কাছেও না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদিও এর কাছে যাওয়া জায়েজ ছিল। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৯:

"আর "হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না, অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা দেখায় যে কেবল কোনও কিছু বৈধ বলেই তা করা উচিত নয়। মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার কাছাকাছি যাওয়া অবৈধ নয়; কেবল সেই সীমা লঙ্ঘন করাই অবৈধ। কিছু বৈধ কাজ, যেমন অনর্থক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া, এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অবৈধ আচরণের দিকে পরিচালিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অনর্থক কথাবার্তা, যদিও নিজে পাপ নয়, তবুও গীবত এবং মিথ্যা বলার মতো পাপের দিকে পরিচালিত করতে পারে। একইভাবে, সম্পদের অপচয় পাপপূর্ণ ব্যয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ২৭:

"নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।"

বেশিরভাগ মানুষ যারা বিপথগামী হয় তারা ধীরে ধীরে তা করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা প্রথমে অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত হতে পারে, কিন্তু তাতে অংশগ্রহণ না করেই, এবং সময়ের সাথে সাথে তারা এতে যোগ দিতে প্রলুব্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ, এমন একজনের কথা ধরুন যিনি মদ্যপানকারী লোকদের সাথে সময় কাটান; যারা মদ্যপানকারী অন্যদের সাথে মেলামেশা করেন না তাদের তুলনায় তারা নিজেরাও মদ্যপান শুরু করার সম্ভাবনা বেশি। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫১ নম্বরের একটি হাদিসে উল্লেখিত কিছু বৈধ জিনিস, বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় জিনিস এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন মহানবী (সা.)। তিনি বলেছেন যে, একজন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে ধার্মিক হতে পারে না, অর্থাৎ তারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের আশীর্বাদ ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না, যতক্ষণ না তারা কিছু বৈধ জিনিস ত্যাগ করে এই আশঙ্কায় যে এটি তাদের অবৈধ কাজের দিকে পরিচালিত করতে পারে। অতএব, কেবল অবৈধ জিনিস থেকে দূরে থাকাই নয়, কিছু বৈধ জিনিস, বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় জিনিস এড়িয়ে চলাও গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা অবৈধ কাজের দিকে

পরিচালিত না হয়। এই পদ্ধতিটি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার বজায় রাখতে সাহায্য করবে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুসারে, নিজের আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এটিই ধার্মিকতার মূলনীতি এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক শান্তি বয়ে আনে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৭:

"... এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।"

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

যারা মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলার তাৎপর্য উপলব্ধি করে না, তারা জায়েজ জিনিসগুলিতে, বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে অতিরিক্ত লিপ্ত হয়। এই আচরণ নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায় এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে। ফলস্বরূপ, তারা একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচার দিবসে তাদের

জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই চাপ, অসুবিধা এবং সমস্যা দেখা দেবে, যদিও মাঝে মাঝে আনন্দের মুহূর্ত থাকে। এই ফলাফল স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় এমন ব্যক্তিদের জীবনে যারা এইভাবে কাজ করে, যেমন ধনীদের। সূরা তওবার ৯, আয়াত ৮২:

"তাহলে তারা যেন অল্প হেসে ফেলে এবং [তারপর] অনেক কাঁদে, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ।" তারা আগে আয় করত।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার পালনকর্তা, আমি যখন দেখতে পাচ্ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৫১:

"... আর অশ্লীলতার কাছে যেও না, যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অনৈতিকতা যেকোনো পাপকে বোঝাতে পারে, তা সে বড় হোক বা ছোট। পাপকে ছোট এবং বড় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ইতিহাস জুড়ে, বড় পাপের জন্য বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি সহজ শ্রেণীবিভাগ হল যে কোনও পাপ যাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ইসলামী সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা একটি বড় পাপ হিসাবে বিবেচিত হবে। বড় পাপকে শ্রেণীবদ্ধ করার আরেকটি উপায় হল যদি এটি জাহান্নামের আগুন, মহান আল্লাহর ক্রোধ বা তাঁর অভিশাপের সাথে সম্পর্কিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, গীবতকে একটি বড় পাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এটি পবিত্র কুরআনে অভিশপ্ত। অধ্যায় ১০৪ আল হুমাযাহ, আয়াত ১:

"প্রত্যেক গীবতকারী, নিন্দুকের জন্য দুর্ভোগ।"

কিছু লোক ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে সহীহ বুখারী, ২৭৬৬ নম্বর হাদিসে মাত্র সাতটি বড় পাপের তালিকা রয়েছে। তবে, তারা এই সত্যটি উপেক্ষা করে যে যদিও এই সাতটি বড় পাপ, এর অর্থ এই নয় যে এগুলিই একমাত্র। বাস্তবে, অন্যান্য হাদিসে পিতামাতার অবাধ্যতার মতো অতিরিক্ত বড় পাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ বুখারী, ৬২৭৩ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী হাদিসে উল্লেখিত সাতটি বড় পাপ হল: শিরক, জাদু, একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা, আর্থিক স্বার্থে লিপ্ত হওয়া, এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা এবং একজন নিরপরাধ মহিলার উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা।

এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন কেউ ছোট ছোট পাপ করতে থাকে, তখন ইসলামের দৃষ্টিতে তা বড় পাপে পরিণত হতে পারে।

বড় পাপগুলো কেবল প্রকৃত তওবার মাধ্যমেই ক্ষমা করা সম্ভব, অন্যদিকে ছোট পাপগুলো বড় পাপ থেকে দূরে থেকে সৎকর্ম করে মুছে ফেলা যায়। ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, আয়াত ৩১:

"যদি তোমরা সেইসব কবীরা পাপ থেকে বিরত থাকো যেগুলো তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেব..."

প্রকৃত অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে এবং যার ক্ষতি হয়েছে তার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া, যদি তা আরও সমস্যার সৃষ্টি না করে। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একই বা অনুরূপ পাপের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার এবং আল্লাহ তায়ালা এবং অন্যদের উপর লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার সংশোধন করার জন্য সত্যিকার অর্থে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তাদের ইসলামী নীতিমালা অনুসারে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত অনুগ্রহ সঠিকভাবে ব্যবহার করে ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা উচিত।

মুসলমানদের অবশ্যই সকল পাপ থেকে দূরে থাকতে হবে, তা সে যত ছোটই হোক না কেন, কারণ শয়তানের একটি কৌশল হল তাদের ছোট পাপ উপেক্ষা করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পাহাড়গুলি ছোট ছোট পাথর দিয়ে তৈরি।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৫১:

"... আর অশ্লীলতার কাছে যেও না, যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন..."

অনৈতিকতা বিশেষভাবে ব্যভিচারকেও নির্দেশ করতে পারে। অতএব, এই আয়াতে এমন যেকোনো আচরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে যা একজনকে ব্যভিচারের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

অবৈধ সম্পর্কে জড়িত হওয়া রোধ করার জন্য মুসলমানদের সতর্ক থাকা উচিত। প্রথমত, তাদের দৃষ্টি নিচু করার অভ্যাস করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের জুতার দিকে ক্রমাগত তাকানো উচিত, বরং তাদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে চারপাশে তাকানো থেকে বিরত থাকা উচিত, বিশেষ করে জনসাধারণের স্থানে। তাদের অন্যদের দিকে তাকানো উচিত নয় এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। ঠিক যেমন একজন মুসলিম তার বোন বা মেয়ের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকলে তাকে পছন্দ করে না, তেমনি তাদের অন্যের বোন বা মেয়ের দিকে তাকানো উচিত নয়। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ৩০:

"মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা সংকুচিত করে রাখে এবং তাদের গোপনাঙ্গের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য অধিক পবিত্র..."

মুসলিমদের উচিত বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে একা থাকা এড়িয়ে চলা, যদি না তারা অবিবাহিত আত্মীয় হয়, যেমনটি সহিহ বুখারী, ১৮৬২ নম্বরের একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরামর্শ অনুসারে করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য পোশাক পরিধান এবং শালীন আচরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। শালীন পোশাক পরিধান অপরিচিতদের অবাঞ্ছিত মনোযোগ এড়াতে সাহায্য করে এবং শালীন আচরণ এমন কাজ এড়াতে সাহায্য করে যা অবৈধ সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যেমন বিপরীত লিঙ্গের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথোপকথন।

অবৈধ সম্পর্ক থেকে দূরে থাকার উপকারিতা উপলব্ধি করা হল এগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করার একটি উপায়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাদের কথা এবং সতীত্ব রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, ২৪০৮ নম্বর হাদিস দ্বারা এটি সমর্থিত।

অবৈধ সম্পর্কে জড়ানোর পরিণতি সম্পর্কে ভীত থাকাও একজন মুসলিমকে এগুলো এড়িয়ে চলতে সাহায্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তির ঈমান যখন সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে তার ঈমান ছেড়ে চলে যায়। সুনানে আবু

দাউদের ৪৬৯০ নম্বর হাদিসে এটি বর্ণিত হয়েছে। অতএব, একজনকে ভয় করা উচিত যে যদি সে ব্যভিচার করে তবে তার ঈমান তার কাছে ফিরে নাও আসতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলিমের জন্য অবৈধ সম্পর্ক প্রয়োজন হয় না কারণ ইসলাম বিবাহকে বাধ্যতামূলক করে। যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে না তাদের ঘন ঘন রোজা রাখা উচিত, কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এই নির্দেশনা সহিহ মুসলিমের ৩৩৯৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহ বিবাহকে উৎসাহিত করেন এবং অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেন। যখন কোন দম্পতি একে অপরের প্রতি সত্যিকার অর্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হয়, যেমন বিবাহিত দম্পতি, তখন তাদের মুখোমুখি হওয়া যেকোনো বাস্তব চ্যালেঞ্জ আরও মানসিক চাপের সৃষ্টি করবে, কারণ তারা একে অপরকে সঠিকভাবে সমর্থন করবে না। সারা জীবন বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে আসা-যাওয়া মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এটা অবাক করার মতো নয় যে যারা তাদের সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা প্রায়শই পরামর্শের খোঁজ করে। যারা এই ধরনের সম্পর্ক এড়িয়ে চলে তাদের তুলনায় তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন বিষণ্নতা বেশি অনুভব করে। অধিকন্তু, সমাজে একাধিক সঙ্গী থাকার জন্য পরিচিত ব্যক্তিরা তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে এমন উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এর কারণ হল একাধিক সঙ্গীর ইতিহাস থাকা ব্যক্তিরা শিথিল এবং অবাঞ্ছিত চরিত্র গড়ে তুলতে পারে, যা বিবাহের মতো গুরুতর প্রতিশ্রুতি খুঁজছেন তাদের কাছে আকর্ষণীয় নয়। এই পরিস্থিতি কেবল তাদের জন্য মানসিক চাপ বাড়িয়ে তোলে যাদের অনেক সঙ্গী রয়েছে। নৈমিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সঙ্গীদের প্রায়শই মানসিক সাদৃশ্যের অভাব থাকে। একজন ব্যক্তি সাধারণত সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নেয়, স্থায়ী হতে চায়, অন্যজন ভবিষ্যতের জন্য একই দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে না। যখন দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন এটি

সেই ব্যক্তির জন্য দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে যিনি বেশি বিনিয়োগ করেছিলেন। বিপরীতে, বিবাহিত দম্পতিরা শুরু থেকেই একে অপরের প্রতি তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে একমত থাকে। বিবাহিত দম্পতি পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত, সন্তান ধারণের মতো সকল পরিস্থিতিতেই একে অপরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। সাধারণ দম্পতিদের মধ্যে এই স্তরের নিষ্ঠা খুব কমই দেখা যায়। সম্পর্কে থাকা কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারে যে তারা তাদের সঙ্গীকে পুরোপুরি বোঝে, যার ফলে বিয়ের পরে পরিবর্তন সম্পর্কে অভিযোগ দেখা দেয়। বাস্তবে, অংশীদাররা প্রায়শই পরিবর্তিত হয় না; বরং, সম্পর্কের দায়িত্ব এবং চাপগুলি পরিবর্তিত হয়। এই ভুল বোঝাবুঝি বিয়ের আগে একসাথে থাকা দম্পতিদের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। এমনকি বিয়ের আগে সহবাস করাও এই সমস্যাগুলি রোধ করে না। তাছাড়া, এটি সুপরিচিত যে একজন সঙ্গীর সাথে সমস্যা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক তরুণ-তরুণী কেবল তাদের প্রাক্তন সঙ্গীকে প্রতিদিন দেখতে না পারার কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। যেহেতু বিবাহ দুটি ব্যক্তির মধ্যে একটি গভীর বন্ধন এবং প্রতিশ্রুতির প্রতিনিধিত্ব করে, তাই দম্পতিরা তুচ্ছ বিষয়গুলির জন্য আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে যা প্রায়শই নিয়মিত দম্পতিদের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ হয়।

অধিকন্তু, অবৈধ সম্পর্কের বাহ্যিক রূপ দেখে একজন ব্যক্তির বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, এই ভেবে যে এটি নিজের বা সমাজের জন্য কোনও বিপদ ডেকে আনে না। সীমিত বোধগম্যতা, অদূরদর্শিতা এবং মানসিক নিয়ন্ত্রণের কারণে, ব্যক্তিরা ভুল করে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে ক্ষতিকারক বলে মনে করতে পারে, অন্তর্নিহিত বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে যা তাদের এবং অন্যদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। অবৈধ সম্পর্কে জড়িত একজন মুসলিম সময়ের সাথে সাথে তাদের সঙ্গীর সাথে আরও পদক্ষেপ নিতে এবং পাপ করতে উৎসাহিত হতে পারে। যেহেতু আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এবং ব্যভিচারের মতো পাপ অনেক সমাজে সাধারণ হয়ে উঠেছে, তাই বিবাহিত নয় এমন দম্পতি সহজেই এই অন্যায়ের শিকার হতে পারে। এর ফলে তাদের এবং সমাজের জন্য আরও অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ এবং ইসলামে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পাপকে তুচ্ছ

করা। অধিকন্তু, কেউ যদি তাদের অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে অন্যান্য বড় পাপে, যেমন ব্যভিচারে জড়িত না হয়, তবুও তাদের আবেগ তাদের বিচারকে অন্ধকার করে দিতে পারে, যার ফলে তারা তাদের সঙ্গীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়, যদিও তারা বুঝতে পারে না যে তারা উপযুক্ত সঙ্গী হতে পারে না, যদিও তারা একজন ভালো সঙ্গী বলে মনে হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ হল বিবাহের চাপ এবং দায়িত্ব, যেমন স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার পূরণ, সম্পর্কের গতিশীলতা পরিবর্তন করে, যার ফলে প্রায়শই বৈবাহিক সমস্যা দেখা দেয়। এই কারণেই বিবাহিত দম্পতিরা যারা বিয়ের আগে একসাথে ছিলেন তারা প্রায়শই দাবি করেন যে বিয়ের পরে তাদের আচরণ পরিবর্তিত হয়। তাছাড়া, কেউ তাদের সঙ্গীর সাথে যতই সময় কাটান না কেন, তারা কখনই তাদের চরিত্রকে ততটা গভীরভাবে বুঝতে পারবে না যতটা একজন বিবাহিত দম্পতি একে অপরকে চেনে। বিয়ের পরে উভয় সঙ্গীর মধ্যে লুকানো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি বেরিয়ে আসবে, যার ফলে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও সমস্যা দেখা দেবে।

অবৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যারা প্রায়ই উপেক্ষা করে, তারা হল, একজন ভালো সঙ্গী হওয়া মানেই ভালো স্বামী/স্ত্রী বা বাবা-মা হওয়ার কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া নয়। কারণ, ভালো সঙ্গী হওয়ার তুলনায় ভালো স্বামী/স্ত্রী এবং বাবা-মা হওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর প্রয়োজন। সঙ্গীর প্রতি অনুভূতির কারণে, একজন ব্যক্তি ধার্মিক কাউকে বিয়ে করার গুরুত্ব উপেক্ষা করতে পারেন, কারণ একমাত্র তারাই তাদের স্ত্রী/স্ত্রী/সন্তানদের অধিকার রক্ষা করবে এবং রাগের সময়ও ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। বিপরীতে, ধার্মিকতার অভাব থাকা ব্যক্তি তার স্ত্রী/স্ত্রী/সন্তানদের অধিকার পূরণ করবে না এবং তাদের উপর অন্যায় করতে পারে, বিশেষ করে যখন তারা বিরক্ত হয়। যাদের সঙ্গী আছে তারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মিস করতে পারে এবং অনুভূতির উপর ভিত্তি করে তাদের সঙ্গীকে বিয়ে করতে পারে, এমনকি যদি সেই ব্যক্তির ধার্মিকতার অভাব থাকে। ভালোবাসার মতো আবেগ একজন ব্যক্তিকে তার প্রিয়জনের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের প্রতি অন্ধ করে দিতে পারে। এই সতর্কীকরণ সুনানে আবু দাউদের ৫১৩০ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকন্তু, যারা অনৈতিক জীবনযাপন গ্রহণ করে এবং একাধিক সঙ্গী রাখে তারা ক্রমাগত অন্যান্য অনৈতিক ব্যক্তিদের আকর্ষণ করে। এই ব্যক্তিরা তাদের শোষণ করার চেষ্টা করবে, কেবল তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার উপর মনোযোগ দেবে এবং তাদের সঙ্গীর অধিকারকে উপেক্ষা করবে, এমনকি বিবাহের ক্ষেত্রেও। যখন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন তারা মৌখিকভাবে গালিগালাজ করতে পারে, তাদের পূর্ববর্তী অনুপযুক্ত কাজের জন্য তাদের সঙ্গীকে পতিতার সাথে তুলনা করতে পারে। ক্ষমা চাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এই ধরনের অপমান দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ক্ষত রেখে যায় যা শারীরিক সহিংসতার চেয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। যারা তাদের নিজস্ব অনৈতিকতার কারণে অনৈতিক ব্যক্তিদের তাদের জীবনে আমন্ত্রণ জানায়, তারা তাদের সঙ্গী বা স্ত্রীর কাছ থেকে শারীরিক নির্যাতনের ঝুঁকিতেও বেশি থাকে। যখন তাদের সঙ্গীকে প্রাথমিকভাবে আকর্ষণকারী বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, যেমন সৌন্দর্য, ম্লান হয়ে যায়, তখন অনৈতিক সঙ্গী নতুন কাউকে খুঁজবে। এই প্রবণতা অনৈতিক ব্যক্তিদের প্রায়শই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তারা তাদের সঙ্গীকে একটি অস্থায়ী সম্পত্তি হিসেবে দেখতে পারে, অনেকটা একটি গাড়ির মতো যা কিছুক্ষণ পরে প্রতিস্থাপন করা হয়। এই আচরণের মানসিক ক্ষতি গভীর। অধিকন্তু, যদি দম্পতির সন্তান থাকে, তাহলে সেই সন্তানরা তাদের বাবা-মায়ের, বিশেষ করে মায়ের, উপর মৌখিকভাবে আক্রমণ করতে পারে এবং বাবা-মায়ের অতীত আচরণের উপর ভিত্তি করে একজন পতিতার সাথে অবমাননাকর তুলনা করতে পারে। একটি সন্তানের বাবা-মায়ের সাথে দুর্ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট মানসিক ক্ষতগুলি নিরাময় করা কঠিন। বিপরীতে, একজন ভালো চরিত্রের ব্যক্তি তাদের জীবনে সদয় এবং ভদ্র ব্যক্তিদের আকর্ষণ করবেন। এই ব্যক্তিরা, একজন সঙ্গী বা স্ত্রীর মতো, তাদের অধিকারকে সম্মান করবেন এবং তাদের মুখোমুখি হওয়া যেকোনো মৌখিক দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করা হবে, কারণ সকল পক্ষই বোঝে যে অপমান মিথ্যা। যদি এই দম্পতির সন্তান থাকে, তাহলে তাদের ভালো এবং সম্মানজনক স্বভাবের কারণে সেই সন্তানরা বাবা-মা উভয়কেই সম্মান করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

তাছাড়া, অবৈধ সম্পর্ক থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে জন্ম নেওয়া যেকোনো শিশু আরও বেশি চাপ তৈরি করতে পারে, যা প্রায়শই বিচ্ছেদের দিকে ঠেলে দেয়, কারণ বাবা-মা সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে নাও চাইতে পারেন। এর ফলে সন্তানের সংসার ভেঙে যায়, বাবা-মা উভয়েরই সমর্থন এবং নির্দেশনার অভাব থাকে, যা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই সমস্যার কারণ হতে পারে। এটা সুপরিচিত যে বেশিরভাগ তরুণ যারা অপরাধে জড়িত, গ্যাং-এ যোগদান করে, অথবা যৌন শিকারী এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয় তারা ভাঙা পরিবার থেকে আসে। সন্তান কামনা করলে সঠিকভাবে সন্তান লালন-পালন করা খুবই চ্যালেঞ্জিং; তাই, যখন বাবা-মা সন্তান নিতে চান না তখন সন্তান লালন-পালনের মানসিক বোঝা কতটা তা কল্পনা করা যায়। এটি শিশুর লালন-পালনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং প্রায়শই পূর্বে উল্লেখিত সমস্যাগুলির সৃষ্টি করে। এই চাপ একক অভিভাবককে লালন-পালন বা দত্তক নেওয়ার জন্য সন্তানকে ছেড়ে দিতে পারে, যা সাধারণত সন্তানের উপর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, যার কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি শিশুর বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তোলে।

বেআইনি সম্পর্কের এই সমস্ত নেতিবাচক দিকগুলি আবেগপ্রবণ বা অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, এমনকি যদি এই সম্পর্কগুলি ক্ষতিকারক বলে মনে হয়। বেআইনি সম্পর্কে জড়িত হওয়া এমন খাবার খাওয়ার মতো যা দেখতে ক্ষুধার্ত কিন্তু আসলে বিষাক্ত। যেহেতু এই বিষটি গোপন থাকে, তাই একজনকে অবশ্যই এর সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তির উপর নির্ভর করতে হবে এবং আপাতদৃষ্টিতে সুস্বাদু খাবার খাওয়া এড়াতে তাদের নির্দেশনার উপর নির্ভর করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যায়। মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, বিশেষ করে কর্ম এবং সম্পর্কের লুকানো বিপদ, তাই তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করা উচিত, এমনকি যদি তা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এটি একজন জ্ঞানী রোগীর মতো যিনি তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ অনুসরণ করেন, এটি বুঝতে পারেন যে এটি তাদের উপকারের জন্য, এমনকি যখন এতে অপ্রীতিকর চিকিৎসা এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস

জড়িত থাকে। ঠিক যেমন এই জ্ঞানী রোগী ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং অনুসরণ করেন তিনিও হবেন। কারণ একমাত্র মহান আল্লাহই একজন ব্যক্তিকে ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করতে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখেন। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার উপলব্ধি এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও ব্যাপক গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে না, এবং তাদের পরামর্শও তাদের সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ প্রতিরোধ করতে পারে না। মহান আল্লাহ, একমাত্র, এই জ্ঞানের অধিকারী, যা তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতিকে প্রদান করেছেন। এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ লক্ষ্য করে যে ইসলামী শিক্ষাগুলি যারা তাদের প্রাপ্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না।

মহান আল্লাহ তায়ালা এই বিভিন্ন শাখাগত সমস্যাগুলির সমাধান করেছেন মূল সমস্যাটির উপর আলোকপাত করে, যা হল অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা এবং বিবাহকে উৎসাহিত করা। এটি একটি দম্পতিকে একে অপরের এবং তাদের সন্তানদের প্রতি সত্যিকার অর্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে সাহায্য করে।

পবিত্র কুরআনে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবা এবং সন্তানদের আলোচনা করে, মহান আল্লাহ একটি সমৃদ্ধ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। পরিবারের সদস্যরা, একসাথে বসবাস করুক বা পৃথক থাকুক, যখন একে অপরের অধিকার পূরণ করে এবং তাদের সন্তানদের জন্য একটি স্থিতিশীল এবং আনন্দময় ঘর তৈরি করে, তখন এটি সমাজে একটি ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করে। অন্যদিকে, যখন একটি পরিবার অসুখী

থাকে এবং একে অপরের অধিকারকে অবহেলা করে, তখন এটি একটি নেতিবাচক প্রভাবের দিকে পরিচালিত করে যা সমগ্র সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সময়ের সাথে সাথে অসংখ্য চিন্তাবিদ আবির্ভূত হয়েছেন, যারা ব্যক্তি ও সমাজের মুখোমুখি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে, যেহেতু তাদের সমাধানগুলি প্রায়শই শাখাগত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীভূত হয়, তাই এর সুবিধাগুলি সীমিত। বিপরীতে, মহান আল্লাহ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই প্রভাবিত করে এমন মৌলিক বিষয়গুলির সমাধান করেন, যা ইহকাল ও পরকালে সাফল্য অর্জনের জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৮৯:

"...এবং আমরা আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশনা ও রহমতস্বরূপ..."

কিন্তু যারা তাদের প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে, কেবল তারাই মহান আল্লাহর আয়াতে প্রাপ্ত গভীর জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৪২:

"এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারো।"

যেহেতু ব্যভিচারকে আধ্যাত্মিক মৃত্যু হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাই পবিত্র কুরআনে প্রায়শই শারীরিক মৃত্যুর সাথে এটিকে যুক্ত করা হয়েছে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৫১:

"... আর তোমরা অশ্লীল কাজের কাছেও যেও না, যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন। আর আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না [আইনী] বৈধ কারণ ছাড়া..."

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকৃত মুসলমানরা সকল জীবকে সম্মান করে। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানদের তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর রহমত অর্জনে সাহায্য করবে। এই নির্দেশনাটি সুনান আবু দাউদের ৪৯৪১ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। ২৮ তম সূরা আল কাসাস, আয়াত ৭৭:

"... আর তুমিও ভালো কাজ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি ভালো করেছেন..."

সকল প্রাণীর সাথে, এমনকি প্রাণীদের সাথেও এই ধরনের সদয় আচরণ করা উচিত। সুনান আবু দাউদের ২৫৫০ নম্বর হাদিসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের মতো অন্য কোনও ধর্ম মানবজীবনকে এতটা মূল্যবান বলে মনে করে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ বলেছেন যে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যাকে সমগ্র মানবজাতির হত্যার মতো গণ্য করা হবে। ৫ম সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত ৩২:

" ...একটি আত্মাকে হত্যা করে, যদি না একটি আত্মার জন্য অথবা পৃথিবীতে দুর্নীতির জন্য [করা] হয়- যেন সে সম্পূর্ণ মানবজাতিকে হত্যা করেছে। আর যে কেউ একজনকে রক্ষা করবে- যেন তিনি সম্পূর্ণ মানবজাতিকে রক্ষা করেছেন..."

সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে মুসলিম ও মুমিনের সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ইসলাম মানুষকে অন্যদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতে শিক্ষা দেয়। এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, একজন মুসলিম ও মুমিন হলো তারা যারা অন্যদের এবং তাদের জিনিসপত্রের উপর মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধের সময় পুরুষ সৈনিকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ছাড়া কখনও কাউকে বা কোনও প্রাণীর ক্ষতি করেননি। তিনি নারী, বৃদ্ধ, শিশু বা অ-সৈনিকদের ক্ষতি করেননি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি কখনও ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে চাননি এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করেছেন যারা আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করেছেন এবং অনস্বীকার্য প্রমাণের মাধ্যমে দোষী প্রমাণিত হয়েছেন। সহীহ মুসলিমের ৬০৫০ নম্বর হাদিস দ্বারা এটি সমর্থিত। মুসলিমরা যদি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনুসরণ করার দাবি করে তবে তাদের সকল পরিস্থিতিতে এই আচরণই মেনে চলা উচিত।

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং বাস্তবসম্মত ধর্ম এবং জীবনধারা। অতএব, একজন মুসলিমকে নিজেকে, তাদের পরিবার এবং তাদের জিনিসপত্র রক্ষা করার

অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে, এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতে হবে। মুসলমানদের আক্রমণ শুরু করা বা নিরপরাধ ব্যক্তিদের ক্ষতি করার অনুমতি নেই। অতএব, মুসলমানদের অন্যদের সাথে তাদের আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করা উচিত, যা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে তারা অন্যদের সাথে যেভাবে আচরণ করতে চায় সেভাবে আচরণ করা।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৫১:

"... আর আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না [আইনি] বৈধ কারণ ছাড়া..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৭৮:

"... *তোমাদের উপর নিহতদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে - স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারীর] কাছ থেকে কিছু উপেক্ষা করে, তার জন্য উপযুক্ত অনুসরণ এবং তাকে [মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধিকে] সৎ আচরণের সাথে পরিশোধ করা উচিত। এটি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি লাঘব এবং একটি রহমত। কিন্তু যে এর পরে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।*"

আল্লাহ, পরাক্রমশালী, খুনের উত্তরাধিকারীকে আইনি শাস্তির বিকল্প দিয়েছেন, যা কেবল সরকার এবং কঠোর নিয়ম অনুসারে কার্যকর করতে পারে, অথবা খুনির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ ফি সহ বা ছাড়াই ক্ষমা করার বিকল্প। এই পছন্দটি ছিল মহান আল্লাহর রহমত, কারণ একটি বিকল্পকে অন্যটির উপর জোর করা মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করত, কারণ সকলেই আলাদা। যারা স্বাভাবিকভাবেই করুণাময় তারা ক্ষমার দিকে ঝুঁকতে পারে এবং ইসলাম যদি এই পছন্দটি বাধ্যতামূলক করে তবে খুনির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিতে লড়াই করতে পারে। বিপরীতে, অন্যদের তাদের প্রিয়জনের হত্যাকারীকে ক্ষমা করা খুব কঠিন হতে পারে এবং তাদের প্রিয়জনের জীবন কেড়ে নেওয়ার সময় খুনি সমাজে স্বাধীনভাবে বসবাস করার ধারণাটি মেনে নিতে পারে না, বিশেষ করে যদি খুনের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি থাকে যারা তাদের উপর নির্ভর করে। এই ধরণের ব্যক্তিদের জন্য খুনিকে ক্ষমা করা এবং ক্ষমা করা কঠিন হবে যদি ইসলাম তাদের উপর এই পছন্দ চাপিয়ে দেয়। সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য, মহান আল্লাহ, খুনের উত্তরাধিকারীকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এটি আজকের বেশিরভাগ আইনি ব্যবস্থা থেকে আলাদা, যেখানে খুনির ভাগ্য আদালতের বিচারক বা অপরিচিতদের জুরির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা উত্তরাধিকারীকে মানসিক শান্তি খুঁজে পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, যা খুনির ভাগ্য বেছে নেওয়ার এবং অবশেষে তাদের জীবন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে আসে। এই ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার কারণেই খুনের শিকারের পরিবার, অথবা ধর্ষণের মতো ক্ষেত্রে, ভুক্তভোগী এবং তাদের পরিবার প্রায়শই মনে করে যে ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি। এমনকি যখন অপরাধীকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়, তখনও সাজা প্রায়শই অপরাধের তীব্রতার সাথে মেলে না। এর অর্থ হল অপরাধী মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মুক্তি পেতে পারে এবং সরকারি সুবিধা পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে, অন্যদিকে ভুক্তভোগী এবং তাদের পরিবার স্থায়ী মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এই মানসিক আঘাত কিছুটা কমানোর একমাত্র উপায় হল পরিবারকে নির্দিষ্ট কিছু অপরাধে অপরাধীর ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া।

উদ্‌ধৃত আয়াতে আলোচিত অন্যায় কাজটি মৃত ব্যক্তির পরিবারের সরাসরি প্রতিশোধ নেওয়ার সাথে সম্পর্কিত, কারণ কেবলমাত্র রাষ্ট্রেরই আইনি শাস্তি কার্যকর করার, অথবা ক্ষতিপূরণ বা ক্ষমার জন্য একটি মীমাংসা হওয়ার পরে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। এটি সেই পরিস্থিতিও অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে খুনি প্রাথমিকভাবে ক্ষমা পাওয়ার পরে আরেকটি হত্যা করে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় শিকারের উত্তরাধিকারী ক্ষমা করতে সম্মত হন কিনা তা নির্বিশেষে, আইনি বিচারক তাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেবেন। এটি কার্যকরভাবে ন্যায়বিচার এড়াতে কোনও অপরাধী যে কোনও ফাঁকফোকর ব্যবহার করতে পারে তা দূর করে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৭৯:

" *...আর তোমাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ [জীবন রক্ষা] আছে, হে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ..."*

আইনি শাস্তির মধ্যে জীবন আছে, কারণ অনেক খুনি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনও শাস্তি দিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড থেকে নিরুৎসাহিত হন না। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে একজন খুনি তাদের অপরাধের জন্য কিছু সময় কারাগারে কাটিয়েছেন, কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর আবার হত্যা করেছেন। সুতরাং, একজন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা অন্যদের জীবন বাঁচাতে পারে।

তদুপরি, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এই আইনি শাস্তি ভুক্তভোগীর আত্মীয়দের মানসিক সুস্থতাকেও সমর্থন করে। খুনি তাদের জীবনের বিনিময়ে তাদের অপরাধের মূল্য পরিশোধ করেছে তা জেনে, ভুক্তভোগীর পরিবারকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। যাইহোক, যখন খুনিকে কেবল কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং প্রায়শই পরে মুক্তি দেওয়া হয়, তখন খুনির হাতে তাদের প্রিয়জনের যে আঘাত সহ্য করা হয়েছিল তা স্মরণ করার যন্ত্রণা ভুক্তভোগীর আত্মীয়দের শান্তি খুঁজে পেতে বাধা দিতে পারে। এই মানসিক যন্ত্রণা রোধ করা তাদের জীবন দেওয়ার একটি উপায়। একইভাবে, যখন সরকার কোনও অপরাধীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ভুক্তভোগীর পরিবার প্রায়শই মনে করে যে ন্যায়বিচার অর্জিত হয়নি। এটি একটি কারণ যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে, ভুক্তভোগীর আত্মীয়দের হয় খুনিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অথবা আর্থিক ক্ষতিপূরণ সহ বা ছাড়াই ক্ষমা করার বিকল্প দেওয়া হয়। ভুক্তভোগীর পরিবারকে এই সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়ার ফলে সরকার ফলাফল নির্ধারণ করলে যে মানসিক চাপ তৈরি হত তা হ্রাস পায়। এটি আবার ভুক্তভোগীর আত্মীয়দের ক্ষোভে ভোগার পরিবর্তে তাদের জীবন চালিয়ে যেতে সক্ষম করে, যা সত্যিকার অর্থে জীবন্ত নয়। এই বিরক্তি এতটাই তীব্র হতে পারে যে এটি ভুক্তভোগীর পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যখন সদস্যদের কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকে। এর ফলে প্রায়শই পরিবার ভেঙে যায়, যেমন মৃত ব্যক্তির বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। অতএব, পরিবারকে খুনির ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান ভুক্তভোগীর পরিবারের ভাঙন রোধ করতে সাহায্য করে, এবং খুনির ফলাফল তাদের উপর ছেড়ে দিলে তাদের জীবন এগিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে আইনি শাস্তি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকা প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে জীবন রক্ষা করতে পারে। সুতরাং, একজন খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলে অসংখ্য হত্যাকাণ্ড রোধ করা সম্ভব। তাছাড়া, যখন প্রতিশোধের কারণে নির্ভরশীল ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তখন এটি তাদের নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই ক্ষতি এড়ানো সম্ভব যদি ভুক্তভোগীর পরিবারকে খুনির ভাগ্য নির্ধারণের অনুমতি দেওয়া হয়, কারণ এটি প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড এবং সমস্ত ভুক্তভোগীর উপর

নির্ভরশীলদের উপর যে ক্ষতি করে তা বন্ধ করে। অতএব, আইনি শাস্তি অনেক ব্যক্তির জীবন বাঁচায়।

এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন ইসলামী আইন আইনি ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন এটি সত্য। কাউকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, এমন শক্তিশালী এবং প্রকৃত প্রমাণ থাকতে হবে যা সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে। ইসলামে, মামলার যেকোনো অনিশ্চয়তা মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠোর আইনি শাস্তি বাতিলের দিকে পরিচালিত করে। অধিকন্তু, সিসিটিভি ফুটেজ, ডিএনএ পরীক্ষা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মতো অগ্রগতির মাধ্যমে আজ অনস্বীকার্য প্রমাণ পাওয়া আরও সম্ভব, যা উচ্চ নিশ্চিততার সাথে অপরাধীদের সঠিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। এটি একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত করার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। এমনকি যদি অ-ইসলামিক দেশগুলি এই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে আইনি শাস্তি প্রয়োগ করে, তবে এটি অপরাধের হার অনেক কমিয়ে দেবে। এই ক্ষেত্রে, একজন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার উদ্বেগ প্রযোজ্য নয়, কারণ নিশ্চিতভাবে বলা হয় যে সঠিক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

উদ্ধৃত আয়াতটি যেমন ইঙ্গিত করে, কেবল তারাই আইনি শাস্তির বিস্তৃত সুবিধাগুলি বুঝতে পারবে যারা সঠিকভাবে চিন্তা করে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি বুঝতে পারে না সে তার জীবন বাঁচানোর জন্য একটি অঙ্গ কেটে ফেলতে অস্বীকার করতে পারে, কেবল শরীরের একটি অংশ হারানোর ধারণার উপর মনোনিবেশ করে। তারা বৃহত্তর চিত্রটি দেখতে ব্যর্থ হয়, যা তাদের জীবন রক্ষা করে, যার ফলে তারা অঙ্গচ্ছেদ প্রত্যাখ্যান করে। বিপরীতে, একজন স্পষ্ট চিন্তাবিদ স্বীকার করেন যে একটি অঙ্গ কেটে ফেলা গুরুতর হলেও, তা না করলে মৃত্যু হতে পারে। তারা বৃহত্তর চিত্রটি বিবেচনা করে এবং তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য অঙ্গচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই যুক্তি আলোচিত আয়াতগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হত্যার জন্য

কাউকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা গুরুতর মনে হলেও, যদি এটি সমাজের জন্য, যার মধ্যে ভুক্তভোগীর পরিবারও রয়েছে, তবে এটি ন্যায্য। একটি সরকারকে অবশ্যই একজন দোষী সাব্যস্ত খুনির জীবনের চেয়ে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যে তার কর্মের মাধ্যমে তার অধিকার হারাচ্ছে, অথবা খুব বিরল ক্ষেত্রে, অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবনের চেয়ে। ভুল দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, তাদের চূড়ান্ত প্রতিদান মহান আল্লাহর কাছে, যতক্ষণ না তারা ধৈর্য ধরে থাকে। ধৈর্যের সাথে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা না করলে তারা যে কোনও সুবিধা পেতে পারত, এই পুরস্কার তার চেয়েও বেশি হবে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৭৯:

" *আর তোমাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধের মধ্যে রয়েছে [জীবন রক্ষার] ব্যবস্থা, হে জ্ঞানী ব্যক্তিরা, যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পারো।*"

এই আয়াতের শেষ অংশে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা জনসাধারণের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। যখন মানুষ খুনিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে দেখে, তখন এটি তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে যারা তাদের ক্ষতি করতে বা হত্যা করতে চায়, কারণ তারা তাদের নিজের জীবনের জন্য ভয় পায়। এটি কেবল তাদেরই নয়, অন্যদেরও রক্ষা করে। এই নীতি সকল ধরণের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধর্ষণের মতো অপরাধের শাস্তি যদি আরও কঠোর করা হত, তাহলে অনেক সম্ভাব্য অপরাধীকে কাজ করা থেকে বিরত রাখা যেত। আইনের নমনীয়তা সমাজে অপরাধের হার বেশি থাকার একটি প্রধান কারণ।

আইনি শাস্তির আরেকটি দিক হল খুনিকে ক্ষমা করে দেওয়া। এই দয়া খুনিকে তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত হতে সাহায্য করতে পারে, যা তাদের জীবন এবং সম্ভাব্যভাবে অন্যদের জীবন বাঁচাতে পারে যাদের তারা তাদের অন্যায় কাজ চালিয়ে গেলে ক্ষতি করতে পারত। উপরন্তু, এটি অন্যান্য ভুক্তভোগী এবং তাদের পরিবারকে তাদের আক্রমণকারীদের ক্ষমা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে, যা আবার অনেক জীবন বাঁচাতে পারে এবং সমাজে শান্তি ও সহানুভূতি বৃদ্ধি করতে পারে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৭৯:

" *আর তোমাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধের মধ্যে রয়েছে [জীবন রক্ষার] ব্যবস্থা, হে জ্ঞানী ব্যক্তিরা, যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পারো।*"

সাধারণভাবে, একটি সমাজ অপরাধ কমাতে পারে যখন তার জনগণ দুটি মূল নীতি গ্রহণ করে। প্রথম নীতি হল আইনি শাস্তি, যার অর্থ হল কঠোর আইন থাকা যা সম্ভাব্য অপরাধীদের দমন করার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেয়। এমনকি একটি শিশুও বুঝতে পারে যে আইনি শাস্তি কঠোর হলে একজন সম্ভাব্য অপরাধীর অপরাধ করার সম্ভাবনা কম। আইন যত বেশি নমনীয় হবে, একজন সম্ভাব্য অপরাধীর অপরাধমূলক আচরণে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

দ্বিতীয় নীতি হলো মহান আল্লাহর প্রতি ভয়, যার মধ্যে রয়েছে পরকালে নিজের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকা। মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে তাদের কারাদণ্ডের মতো কোনও প্রতিফলের মুখোমুখি হতে হবে না, অথবা মনে করে যে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে এ থেকে বাঁচতে পারবে, উদাহরণস্বরূপ, অপরাধ ও পাপ করার প্রবণতা রাখে তখন তারা অপরাধ ও পাপ করে। যাইহোক, যে কেউ সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তাদের সমস্ত কর্মের জন্য, প্রকাশ্য হোক বা ব্যক্তিগত, বড় হোক বা ছোট, সে অপরাধ বা পাপ করার আগে দ্বিধা করবে। যদি এই বিশ্বাস ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়, তবে এটি অপরাধ ও পাপ প্রতিরোধে সহায়তা করবে। যদি সমাজের সদস্যরা এইভাবে আচরণ করত, তাহলে শান্তি ও ন্যায়বিচার বিকশিত হত, যার ফলে অপরাধের হার হ্রাস পেত, সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয় যখন ইসলামী আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হত। এটি ঈমানের তাৎপর্য এবং সমাজের মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে এটিকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯০:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার এবং আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অসৎ আচরণ এবং অত্যাচার থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।"

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৫১:

“বল, এসো, আমি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা পাঠ করে শোনাই। [তিনি আদেশ করেন] যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক

করো না, এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তোমাদের এবং তাদের রিযিক দেব। আর অশ্লীল কাজের কাছেও যেও না, যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন। আর আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না [আইনী] বৈধ কারণ ছাড়া...”

যেমনটি আগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যখন কেউ এই আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলি মেনে চলে, যার ভিত্তি হল প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তখন এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে তাকে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। উপরন্তু, এই আচরণ নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করছে। এটি সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং শান্তির বিস্তার নিশ্চিত করবে। অন্য কোনও আচরণবিধি ব্যক্তি বা সামাজিক স্তরে এত ব্যাপক সুবিধা নিয়ে যেতে পারে না। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 151:

"...তিনি তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা যুক্তি ব্যবহার করতে পার।"

এরপর মহান আল্লাহ সমাজের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে পড়ার জন্য আরও নির্দেশ দেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫২:

"আর এতিমের সম্পত্তির কাছে যেও না, সর্বোত্তম পন্থা ব্যতীত, যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে পৌঁছায়..."

একজন এতিমের অভিভাবককে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা এতিমের সম্পদের সঠিক ব্যবহার করছে যাতে এতিম সর্বোচ্চ সুবিধা লাভ করতে পারে। তাদের উচিত এতিমের সম্পদের প্রতি যেমন যত্নবান, ঠিক তেমনই তাদের নিজের সম্পদের প্রতিও যত্নবান হওয়া। সহীহ বুখারির ১৩ নম্বর হাদিস অনুসারে, অন্যদের জন্য যা নিজের জন্য পছন্দ করে তা ভালোবাসাই ঈমানের মূল কথা। অভিভাবক এতিমের যত্ন নেওয়ার জন্য সামান্য এবং যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক নেওয়ার অধিকারী, তবে পারিশ্রমিক নেওয়া থেকে বিরত থাকা অনেক ভালো এবং বেশি ফলপ্রসূ। এতিম যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন অভিভাবককে অবশ্যই এতিমের সম্পদ সঠিকভাবে তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। অধ্যায় ৪ আন-নিসা, আয়াত ৬:

"আর এতিমদের পরীক্ষা করো [তাদের যোগ্যতার দিক থেকে] যতক্ষণ না তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছায়। তারপর যদি তাদের মধ্যে সঠিক বিচারবুদ্ধি দেখতে পাও, তাহলে তাদের সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দাও। এবং তা অতিরঞ্জিতভাবে এবং দ্রুত গ্রাস করো না, [এই আশায়] যে তারা বড় হবে। আর যে, [অভিভাবক হিসেবে কাজ করার সময়] স্বাবলম্বী, সে যেন[ফি নেওয়া থেকে] বিরত থাকে; আর যে দরিদ্র, সে যেন যা ইচ্ছা তা গ্রহণ করে। তারপর যখন তুমি তাদের সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দাও, তখন তাদের উপর সাক্ষী নিয়া আসো। হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

সাধারণত, ইসলামী শিক্ষায় এতিমদের কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয় কারণ তাদের দুর্বল সামাজিক অবস্থানের কারণে তাদের অধিকার প্রায়ই অবহেলা করা হয়।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত, যেমন এতিম এবং বিধবাদের, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা। আজকাল, এতিম এবং বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা খুবই সহজ, কারণ এটি মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে অনলাইনে করা যেতে পারে। পৃষ্ঠপোষকতার খরচ সাধারণত একটি মাসিক ফোন বিলের চেয়েও কম। অতএব, মুসলমানদের ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়, কারণ এটি ইহকাল এবং পরকালে মহান আল্লাহর কাছ থেকে অব্যাহত সমর্থন নিয়ে আসে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিস দ্বারা এটি সমর্থিত। অধিকন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে যে কেউ এতিমের যত্ন নেবে সে জান্নাতে তার নিকটবর্তী হবে। সহীহ বুখারীর ৬০০৫ নম্বর হাদিসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে, যারা বিধবাদের মতো অভাবীদের সাহায্য করবে তারা সেই ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে যে সারা রাত নামাজ পড়ে এবং প্রতিদিন রোজা রাখে। সহীহ বুখারী শরীফের ৬০০৬ নম্বর হাদিসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, যারা রাতের নামাজ এবং নফল রোজার মতো নফল কাজ করতে কষ্ট পান, তাদের উচিত এই হাদিসের উপর আমল করে অল্প পরিশ্রমে এই সওয়াব অর্জন করা।

এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের কাছে থাকা যেকোনো সম্পদ, যেমন সম্পদ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উপহার হিসেবে নয় বরং ঋণ হিসেবে দিয়েছেন। ঋণদাতাকে ঋণ ফেরত দিতে হবে। আল্লাহর ঋণ পরিশোধের উপায় হলো সেই সম্পদগুলো এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে তিনি খুশি হন। অতএব, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা কেবল আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা। যখন কেউ এটি উপলব্ধি করে, তখন এটি তাদেরকে এমন আচরণ করা থেকে বিরত রাখবে যেন তারা আল্লাহ তাআলার প্রতি অথবা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করছে। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পার্থিব আশীর্বাদ প্রদান করে এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করে বিপুল পুরষ্কার অর্জনের সুযোগ দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাছাড়া, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করে দাতার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যদি প্রতিটি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে ঐশী শিক্ষায় উল্লিখিত পুরষ্কার কীভাবে পাবে? এই বিষয়গুলো মনে রাখলে ভুল মানসিকতা অবলম্বন করে তাদের পুরষ্কার নষ্ট হওয়া এড়ানো যাবে।

পরিশেষে, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা মানে একজন ব্যক্তির যেকোনো চাহিদা পূরণ করা। এর মধ্যে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক চাহিদা অন্তর্ভুক্ত। অতএব, কোনও মুসলিম, তাদের যত কম সম্পদই থাকুক না কেন, এতিমদের মতো অভাবগ্রস্তদের সাহায্য না করার যুক্তি দিতে পারে না।

ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ আচরণবিধি, তাই এটি পার্থিব বা ধর্মীয় যেকোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫২:

"...এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ মাপ ও ওজন দাও..."

অতএব, ইসলামকে এমন একটি পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলা উচিত যা তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী খুলে ফেলতে বা পরতে পারে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনার পূজা করছে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

অতএব, প্রত্যেকেরই নিশ্চিত করা উচিত যে তারা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন করে, তা সে পার্থিব হোক বা ধর্মীয়। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৫২:

"...এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ মাপ ও ওজন দাও..."

সুনানে ইবনে মাজাহের ২১৪৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের অনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে উত্থিত করা হবে, তবে তারা ব্যতীত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, ন্যায়বিচার করে এবং সত্য কথা বলে।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের যোগাযোগে সত্যবাদী হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণ প্রকাশ করতে হবে। সহীহ বুখারীর ২০৭৯ নম্বর হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, আর্থিক লেনদেনে তথ্য গোপন করা, যেমন পণ্যের ত্রুটি লুকানো, আশীর্বাদ হারাতে পারে।

ধার্মিক হওয়ার অর্থ হলো জিনিসপত্রের জন্য অতিরিক্ত দাম নিয়ে অন্যদের সাথে প্রতারণা না করা। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেমন সে অন্যদের কাছ থেকে পেতে চায়, যার অর্থ সৎ এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হওয়া। ঠিক যেমন একজন মুসলিম আর্থিক লেনদেনে অন্যায় করতে চায় না, তেমনি তার অন্যদেরও অন্যায় করা উচিত নয়।

ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করার অর্থ হল ইসলামী আইন এবং তারা যে দেশে বাস করে সেই দেশের আইন অনুসারে অবৈধ কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা। যদি কেউ তাদের দেশের ব্যবসায়িক বিধিবিধানের সাথে অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে তাদের সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

অধিকন্তু, ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করার অর্থ হল নিজের ব্যবসায়িক সাফল্যকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি তাদের ব্যবসা এবং সম্পদকে তাদের জন্য ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনেই আরাম ও প্রশান্তি প্রদান করতে সাহায্য করবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

যারা তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের অপব্যবহার করে তারা আবিষ্কার করবে যে এটি মানসিক চাপ এবং অসুখের উৎসে পরিণত হবে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে অবহেলা করেছে, যিনি তাদের এই সাফল্য দিয়েছেন। তাদের আচরণ তাদের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার ভারসাম্যহীন করে তুলবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। উপরন্তু, আর্থিক বিষয়ে অন্যায় করা মানুষের অধিকার পূরণেও বাধা সৃষ্টি করে। এটি সর্বদা সমাজে অন্যায় এবং দুর্নীতির বিস্তার ঘটায়। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

ব্যবসায়ীদের সর্বদা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত কারণ এর ফলে পাপ হয় এবং পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায়। বাস্তবে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং তার উপর কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই সতর্কীকরণটি জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রধান আয়াতগুলিতে আদেশ ও নিষেধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাই মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন যে, যেহেতু তিনি এমন কিছুর আদেশ বা নিষেধ করেন না যা একজন ব্যক্তির সামর্থ্যের বাইরে, তাই যদি তারা তাঁর আনুগত্য না করে তবে তাদের কোন অজুহাত থাকে না। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫২:

"... আমরা কোন প্রাণীর উপর তার সামর্থ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপাই না..."

"যদিও তারা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে না, তবুও তারা তা করছে না, এই অলস মানসিকতা ত্যাগ করা উচিত। যদি তারা সত্যিই এমন হতো, তাহলে তারা অবশ্যই তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সমস্ত বাধ্যতামূলক দায়িত্ব সফলভাবে পালন করত।

অতএব, একজন ব্যক্তির সঠিক মনোভাব গ্রহণ করা প্রয়োজন কারণ তারা উভয় জগতেই দায়ী থাকবে এবং কোনও অজুহাত সহ্য করা হবে না।" দ্বিতীয় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

" আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সাধ্যের বাইরে অতিরিক্ত বোঝা দেন না। সে যা অর্জন করেছে তার ফল তার উপর বর্তাবে এবং সে যা অর্জন করেছে তার ফল তার উপর বর্তাবে..."

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি আনুগত্য ও আনুগত্যের চেয়ে মানুষের প্রতি আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫২:

"...আর যখন তুমি কথা বলো, ন্যায়পরায়ণ হও, যদিও তা নিকটাত্মীয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়..."

সাধারণভাবে, এই আয়াতটি পরামর্শ দেয় যে, কে কোন কাজ করছে তার উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়, বরং তাদের বিবেচনা করা উচিত যে ব্যক্তিটি কী করছে। যদি কাজটি ইতিবাচক হয়, তবে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা উচিত, তা আর্থিক বা শারীরিক সহায়তার মাধ্যমেই হোক। বিপরীতে, যদি কাজটি নেতিবাচক হয়, তবে তাদের এর বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়া উচিত এবং সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকা উচিত। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম একটি ভুল পথ

অবলম্বন করেছেন যেখানে তারা অন্ধ আনুগত্যের কারণে নিঃশর্তভাবে অন্যদের সমর্থন করেন। এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের প্রতি আনুগত্য স্থাপন করলে তিনি যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তার অপব্যবহার হতে পারে। ফলস্বরূপ, এর ফলে মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যহীনতা, তাদের জীবনের অগ্রাধিকার এবং মানুষের মধ্যে ভুল সমন্বয় এবং বিচারের দিনে জবাবদিহিতার জন্য অপ্রস্তুততা দেখা দেবে। এর ফলে ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনেই চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং কষ্টের সৃষ্টি হবে, ব্যক্তির যেকোনো বস্তুগত আরাম-আয়েশ থাকুক না কেন। অধিকন্তু, ব্যক্তিদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য মানুষের অধিকার পূরণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, সমাজে ন্যায়বিচার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়ে যে সকল মানুষকে খুশি করতে চায়, তারা তাদের জন্য মানসিক চাপ এবং অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তিরা তাদের উপর সন্তুষ্ট হবে না এবং মহান আল্লাহ তায়ালার উপরও সন্তুষ্ট হবে না। মানুষ অন্যদেরকে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু যারা তাঁর প্রতি অনুগত, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অন্যদের প্রতিকূল প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, যদিও এই সুরক্ষা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নাও হতে পারে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৫২:

"...আর যখন তুমি কথা বলো, ন্যায়পরায়ণ হও, যদিও তা নিকটাত্মীয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়..."

এটি মিথ্যা শপথ এড়াতে আদালতের মামলায় সত্য বলার বিষয়টিও বোঝাতে পারে। সহীহ বুখারী, ২৬৭৩ নম্বরের একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে কেউ অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করার জন্য মিথ্যা

শপথ করে, তাকে বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালার মুখোমুখি হতে হবে, এমন অবস্থায় যে তিনি তাদের উপর রাগান্বিত থাকবেন।

এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, বিশ্বাস যাই হোক না কেন, সকলের কাছ থেকে সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন ফরজ নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে, এমনকি যদি কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবুও এর পরিণতি একই থাকে। দুঃখের বিষয় হল, এটি সাধারণ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, যেখানে মুসলমানরা আদালতে মিথ্যা দাবি করে যা তাদের নয়, যেমন সম্পদ এবং সম্পত্তি, দখল করার জন্য। সহীহ বুখারীর ২৬৫৪ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে এটি সবচেয়ে বড় পাপগুলির মধ্যে একটি। এই হাদিসটি মিথ্যা শপথকে শিরক এবং পিতামাতার অবাধ্যতার পাশাপাশি স্থান দিয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একইভাবে এটিকে সম্বোধন করেছেন। ২২ সূরা আল হজ্জ, আয়াত ৩০:

"... তাই মূর্তির অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাক।"

সুনানে ইবনে মাজাহের ২৩৭৩ নম্বর হাদিসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে যারা সত্যিকার অর্থে তওবা করে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। যদি তারা তওবা না করে, তাহলে তারা কিয়ামতের দিন নড়তে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে পাঠান। প্রকৃতপক্ষে, যে কেউ এমন কিছু লাভের জন্য মিথ্যা শপথ করে যার অধিকার তাদের নেই, তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে, এমনকি তারা যা নিয়েছে তা যদি গাছের একটি ডালও হয়। সহিহ মুসলিমের ৩৫৩ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মিথ্যা সাক্ষী হওয়া একটি কবীরা পাপ কারণ এর মধ্যে মিথ্যা বলা সহ আরও অনেক গুরুতর পাপ অন্তর্ভুক্ত। মিথ্যা সাক্ষী যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় তার বিরুদ্ধে পাপ করে। আল্লাহ, পরাক্রমশালী, এই পাপ ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না ভুক্তভোগী প্রথমে তাদের ক্ষমা করে। যদি ভুক্তভোগী ক্ষমা না করে, তাহলে মিথ্যা সাক্ষীর নেক আমল ভুক্তভোগীর কাছে স্থানান্তরিত হবে এবং প্রয়োজনে বিচারের দিনে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য ভুক্তভোগীর পাপ মিথ্যা সাক্ষীর উপর চাপানো হবে। এর ফলে মিথ্যা সাক্ষীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অধিকন্তু, একজন মিথ্যা সাক্ষী যদি অন্য কাউকে এমন কিছু নিতে সাহায্য করে যা তাদের অধিকার নেই, তাহলে সে পাপ করে। এই আচরণ স্পষ্টতই পবিত্র কুরআনের আদেশের পরিপন্থী, যেখানে মুসলমানদের একে অপরকে অন্যায় কাজে সহায়তা না করার বরং একে অপরকে ভালো কাজে সহায়তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় ৫ আল মায়িদাহ, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

মিথ্যা সাক্ষী এমন কিছু ব্যবহার করে আরও পাপ করবে যা অর্জিত হওয়ার কারণে অবৈধ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ এইভাবে সম্পদ অর্জন করে এবং তারপর তা দান করে, তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং পাপ হিসেবে গণ্য হবে, কারণ মহান আল্লাহ কেবল যা বৈধ তা গ্রহণ করেন। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিস দ্বারা এটি সমর্থিত। প্রকৃতপক্ষে, তারা সেই সম্পদ দিয়ে যা কিছু করবে তাতে বরকতের অভাব থাকবে এবং পাপ হিসেবে বিবেচিত হবে কারণ এটি অবৈধভাবে অর্জিত হয়েছিল।

সকল মুসলমানের কর্তব্য হলো সর্বদা সত্য বলা, তা সে দৈনন্দিন কথোপকথনেই হোক বা আইনি আদালতে শপথ নেওয়ার সময়ই হোক। যেকোনো ধরণের মিথ্যা কথা বলা পাপের দিকে পরিচালিত করে, যার পরিণতি জাহান্নামে যেতে পারে। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলতে থাকে তাকে আল্লাহ তাআলা মহামিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করবেন। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মহামিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তির সাথে বিচারের দিনে কী ঘটতে পারে তা বোঝার জন্য একজন আলেমের প্রয়োজন নেই। এই সতর্কীকরণটি জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরের একটি হাদিসে পাওয়া যায়।

পরিশেষে, অন্যের জিনিসপত্র অবৈধভাবে গ্রহণ করা, তা সে আইনি মামলার মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনও পদ্ধতিতে হোক, এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলিম ও মুমিনের নীতির পরিপন্থী। একজন প্রকৃত মুসলিম ও মুমিন অন্যদের এবং তাদের জিনিসপত্রের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকেন। এই নির্দেশনা সুনানে আন নাসায়ী, ৪৯৯৮ নম্বরে একটি হাদিসে পাওয়া যায়। পরিবর্তে, অন্যদের এবং তাদের সম্পদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেমন তারা নিজেরা নিজেদের সাথে আচরণ করতে চায়।

এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রেখে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমেই তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারবে। এবং সমাজের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে পড়ার জন্য মানুষের অধিকার পূরণের একমাত্র উপায় হল, প্রতিটি পরিস্থিতিতে শারীরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে তাদের মৌখিকভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা পূরণ করা। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫২:

"... আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে তার মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কাজে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়, তার ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান এমন একটি গাছের মতো যাকে বেড়ে ওঠার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে খাওয়ানো প্রয়োজন। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় না, সে ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও যদি আনুগত্যের কাজ দিয়ে লালিত না হয় তবে মারা যেতে পারে। এটি সবচেয়ে বড় ক্ষতির প্রতিনিধিত্ব করে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 152:

"...তিনি তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা চিন্তা কর।"

ইসলামী আচরণবিধি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য যে ব্যাপক সুবিধাগুলি অর্জিত হয় তা নিয়ে চিন্তা করার পর এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানবসৃষ্ট সমস্ত আচরণবিধি অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা উচিত এবং পরিবর্তে ইসলামী আচরণবিধি মেনে চলা উচিত। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫৩:

"আর, [তাছাড়া], এটি আমার পথ, যা সরল, তাই এটি অনুসরণ করো; এবং [অন্যান্য] পথ অনুসরণ করো না, নাহলে তোমরা তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে..."

ইসলামী আচরণবিধি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানসিক শান্তি অর্জন করা সম্ভব, যার মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। এটিই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে মানুষ মানুষের অধিকার পূরণ করতে পারে, যা সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রসার ঘটায়। জ্ঞানের অভাব, দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা এবং পক্ষপাতের কারণে অন্য কোনও আচরণবিধি এই পরিণতি ডেকে আনতে পারে না। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫৩:

"...তিনি তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পারো।"

অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং অনুসরণ করা, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যায়। তাদের একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ অনুসরণ করেন, বুঝতে পারেন যে এটি তার সর্বোত্তম স্বার্থে, এমনকি যখন অপ্রীতিকর ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাসের মুখোমুখি হন। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে সেও ভাল থাকবে।

এরপর মহান আল্লাহ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি সর্বদা মানবজাতির জন্য প্রজন্মান্তরে নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করেছেন, এমনকি নবী মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে ইসরাঈলের সন্তানদের জন্যও। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫৪:

"অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে সৎকর্মশীলদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ হয়..."

হযরত মুসা আলাইহিস সালামও এই মর্যাদার যোগ্য ছিলেন, ঠিক যেমন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যোগ্য ছিলেন, যদিও অনেক লোক উভয়ের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করত। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, যেহেতু মক্কার অমুসলিমরা আরবি ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাই তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে পবিত্র কুরআন কোনও সৃষ্ট প্রাণীর কথা নয়। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুওয়াত ঘোষণা করার আগে তাঁর সাথে চল্লিশ বছর অতিবাহিত করার পর, তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১৬:

"... কারণ আমি এর আগে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারবে না?"

মক্কার অমুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে সংগ্রাম করেছিলেন, যিনি সবচেয়ে সম্মানিত গোত্রের সদস্য হওয়া

সত্ত্বেও একজন দরিদ্র এতিম ছিলেন। ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা ঈর্ষার জন্ম দেয় যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবুওয়াত ঘোষণা করেন এবং সমগ্র সৃষ্টির উপর নেতৃত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে পণ্ডিতরা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিলেন, কারণ তারা পবিত্র কুরআন এবং এর লেখক সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তারা মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এবং পবিত্র কুরআনকেও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যেমনটি তাদের পবিত্র গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

যেহেতু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি, যা তারা স্বীকার করে, তাই তিনি তাদের ঐশী গ্রন্থে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবগত

থাকতে পারতেন না যদি না আল্লাহ তাআলা ঐশী প্রেরণার মাধ্যমে সেগুলো তাঁর কাছে প্রকাশ করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৪:

"এটা অদৃশ্যের সংবাদ যা আমরা তোমার কাছে ওহী করি, [অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ, সা.]। আর তুমি তাদের সাথে ছিলে না যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল যে তাদের মধ্যে কে মরিয়মের দায়িত্ব নেবে। আর তুমি তাদের সাথে ছিলে না যখন তারা বিতর্ক করছিল।"

আহলে কিতাবরা ঈর্ষান্বিত ছিল যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভাই হযরত ইসহাকের বংশধর নন, বরং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর। যেহেতু তাদের সম্পূর্ণ ধর্মবিশ্বাস বংশের তাৎপর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত, যা তাদের বিশ্বাস ছিল যে, বংশধরদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে, তাই ভিন্ন বংশধরদের একজন নবীকে গ্রহণ করা তাদের জন্য কঠিন ছিল। এটি তাদের তৈরি শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতাকে দুর্বল করে দেবে।

পূর্বে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, ঐশ্বরিক আচরণবিধির উদ্দেশ্য ছিল তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। উপরন্তু, এই ঐশ্বরিক নির্দেশনা মহান আল্লাহর অধিকার নিশ্চিত করবে এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে যার ফলে সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তি ছড়িয়ে পড়বে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৫৪:

"অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যা সৎকর্মশীলদের উপর [আমাদের অনুগ্রহ] পূর্ণ করে এবং সবকিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা, পথনির্দেশনা ও রহমতস্বরূপ..."

ব্যক্তি ও সামাজিক স্তরে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় ঐশী নির্দেশনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সকল বিষয় ব্যাখ্যা করার অর্থ এমন বিষয়ের ব্যাখ্যা নয় যা এই ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে না কারণ ঐশী প্রকাশ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমন পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান বা গণিতের উপর কোন পাঠ্যপুস্তক নয়।

অধিকন্তু, ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে, প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, বিচারের দিনে জবাবদিহিতার জন্য একজন ব্যক্তিকে কার্যত প্রস্তুত করে তোলে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৫৪:

"...এবং সকল বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং পথনির্দেশনা ও রহমত হিসেবে, যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করে।"

এ থেকে, বিচার দিবসে তারা কতটা বিশ্বাস করে তা বিচার করে বোঝা যায় যে তারা ঐশী শিক্ষার উপর কতটা কাজ করে। যার বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা ঐশী শিক্ষার বাস্তবায়ন তত বেশি করবে। বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার উপর তাদের বিশ্বাস যত দুর্বল হবে, ঐশী শিক্ষার উপর তাদের কাজ তত কম হবে। অধিকন্তু, ঐশী শিক্ষা অধ্যয়ন এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে

চিন্তাভাবনা তাদের জবাবদিহিতার উপর বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং তাই এটি তাদেরকে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে এর জন্য ব্যবহারিকভাবে প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করবে।

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ, মহিমান্বিত, প্রাণহীন, অনুর্বর ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বৃষ্টি ব্যবহার করেন এবং সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটি মৃত বীজকে জীবিত করেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ, মাটিতে পুনরুত্থিত মৃত মানুষকে, পুনরুত্থিত করতে পারেন এবং করবেন, ঠিক যেমন মৃত বীজ নতুন করে জন্মায়। পরিবর্তিত ঋতুগুলি স্পষ্টভাবে পুনরুত্থানের চিত্র তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ, শীতকালে, গাছের পাতা মারা যায় এবং ঝরে পড়ে, যার ফলে গাছটি প্রাণহীন দেখায়। তবে, অন্যান্য ঋতুতে, পাতাগুলি ফিরে আসে এবং গাছটি আবার প্রাণবন্ত দেখায়। সমস্ত জীবের ঘুম-জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। ঘুম মৃত্যুর অনুরূপ, কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় থাকে। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মাকে পুনরুদ্ধার করেন যদি সেগুলি বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করা হয়, এইভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। অধ্যায় 39 আয-যুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

তাছাড়া, বিচার দিবস অনিবার্য। মহাবিশ্বের দিকে তাকালে ভারসাম্যের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে নিখুঁত দূরত্বে অবস্থিত; এই

দূরত্বের সামান্য পরিবর্তনও এটিকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে। একইভাবে, জলচক্র, যার মধ্যে সমুদ্রের জল বায়ুমণ্ডলে বাষ্পীভবন এবং পরে বৃষ্টিতে ঘনীভূত হয়, সূক্ষ্মভাবে সুরক্ষিত, যা এই গ্রহে জীবনকে বিকাশের সুযোগ করে দেয়। মাটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ভঙ্গুর শাখা এবং বীজ অঙ্কুর বের হতে পারে, যা জীবিকা নির্বাহ করে, পাশাপাশি ভারী কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা কেবল একজন স্রষ্টার অস্তিত্বকেই নির্দেশ করে না বরং ভারসাম্যের নীতিকেও তুলে ধরে। যাইহোক, এই পৃথিবীতে একটি স্পষ্ট ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান: মানুষের কর্মকাণ্ড। এই জীবনে পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিপীড়ক এবং অত্যাচারী ব্যক্তিত্বদের দেখা অস্বাভাবিক নয়। বিপরীতে, অনেক ব্যক্তি তাদের অধ্যবসায়ের জন্য তাদের প্রাপ্য পুরষ্কার না পেয়ে নিপীড়ন এবং বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করে। অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান যারা মহান আল্লাহর শিক্ষা মেনে চলেন, তারা প্রায়শই এই পৃথিবীতে অসংখ্য পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং তাদের প্রতিদানের খুব সামান্য অংশ পান, অন্যদিকে যারা প্রকাশ্যে আল্লাহকে অস্বীকার করেন তারা পার্থিব আনন্দ উপভোগ করেন। ঠিক যেমন মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনি কর্মের জন্য পুরস্কার এবং শাস্তিও এই ভারসাম্যকে প্রতিফলিত করা উচিত। তবুও, এটি এই পৃথিবীতে বাস্তবতা নয়, যে কারণে এটি অবশ্যই ভিন্ন সময়ে ঘটবে, বিশেষ করে বিচারের দিনে।

এই ভৌত জগতের অবসান না হওয়া পর্যন্ত প্রতিশোধের দিন শুরু হতে পারে না। কারণ শাস্তি এবং পুরস্কারের ধারণাগুলি কেবলমাত্র সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হওয়ার পরেই বাস্তবায়িত হতে পারে। অতএব, প্রতিশোধের দিনটি মানুষের কর্মের সমাপ্তির উপর নির্ভরশীল, যার ফলে বস্তুগত জগতের শেষ পরিণতি অপরিহার্য।

এই আলোচনাটি চিন্তা করলে একজন ব্যক্তির বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হতে পারে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এর ফলে

ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রশান্তি এবং সাফল্য আসবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২২:

"কারণ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রতিটি প্রাণী তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

মহান আল্লাহ এখন চূড়ান্ত ঐশ্বরিক ওহী নাজিল করেছেন যা ব্যক্তি ও সামাজিক স্তরে মানুষকে মানসিক প্রশান্তির দিকে পরিচালিত করে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫৫:

" আর এই[কুরআন] এমন একটি কিতাব যা আমরা অবতীর্ণ করেছি[যা] বরকতময়, সুতরাং এর অনুসরণ করো..."

কিন্তু এই আয়াতে যেমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, মানুষ পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলো সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করলেই কেবল উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে। কেবল এমন ভাষায় এটি পাঠ করা যথেষ্ট নয় যা তারা বোঝে না। ঠিক যেমন একটি মানচিত্র কেবল তখনই কাউকে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে যদি তারা পদক্ষেপ নেয়, তেমনি পবিত্র কুরআন উভয় জগতেই মানসিক শান্তি বয়ে আনবে যখন এর শিক্ষাগুলো বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম যারা নিয়মিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন তারা অভ্যন্তরীণ শান্তি

থেকে বঞ্চিত হন কারণ তারা এর শিক্ষাগুলো বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হন। এর নির্দেশনা অনুসরণ করে, তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে সাহায্য করবে, যা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে অবস্থান করতে সাহায্য করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। অধ্যায় ৬ আল আন'আম, আয়াত ১৫৫:

"... আর আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।"

অন্যদিকে, যারা এর শিক্ষা উপেক্ষা করে, তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, যার ফলে তাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই চাপ ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৮২:

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

যেহেতু ব্যক্তি ও সামাজিক স্তরে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে এমন চূড়ান্ত ঐশ্বরিক আচরণবিধি প্রকাশিত হয়েছে, তাই লোকেরা যদি এটি উপেক্ষা করতে চায় তবে তাদের কাছে আর কোন অজুহাত নেই। ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ১৫৬-১৫৭:

"[আমরা এটি অবতীর্ণ করেছি] যাতে তোমরা না বলো, "আমাদের পূর্বে কেবল দুটি দলের উপরই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু আমরা তাদের পাঠ সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। অথবা তোমরা না বলো, "যদি আমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হত, তবে আমরা তাদের চেয়ে বেশি সৎপথে থাকতাম।" সুতরাং [এখন] তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশনা এবং করুণা এসেছে..."

এখন যেহেতু চূড়ান্ত প্রমাণ এবং নির্দেশনা পৌঁছে গেছে, মানুষ যদি সেগুলো উপেক্ষা করতে চায় তবে তাদের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এই পৃথিবীতে, ইসলামী আচরণবিধি উপেক্ষা করার ফলে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক এবং শারীরিকভাবে অস্থিরতা অনুভব করবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তারা তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, বাধা এবং চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে, যদিও তাদের কিছু বস্তুগত আরাম থাকতে পারে। উপরন্তু, তাদের আচরণ তাদেরকে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার পূরণে বাধা দেবে, যা সমাজের মধ্যে অন্যায় এবং দুর্নীতির বিস্তার ঘটাবে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫৭:

"... তাহলে তার চেয়ে বেশি জালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে এবং সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? যারা আমার আয়াতগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমরা তাদেরকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে নিকৃষ্টতম শাস্তি দেব।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ তাআলা কেবল যারা ইসলামী শিক্ষাকে অস্বীকার করে তাদের জন্যই শাস্তির নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অতএব, এই পরিণতি এড়াতে মুসলমানদের অবশ্যই তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, যে মুসলিম এইভাবে আচরণ করে তার ঈমান হারানোর বড় ঝুঁকি থাকে। বিশ্বাস যে একটি উদ্ভিদের মতো তা উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এর বিকাশের জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে পুষ্টি প্রয়োজন। ঠিক যেমন সূর্যের আলোর মতো অপরিহার্য উপাদান থেকে বঞ্চিত একটি উদ্ভিদ মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও আনুগত্যের ভরণপোষণ ছাড়াই ম্লান হয়ে যেতে পারে।

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা এমন এক অলসতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিচ্ছেন যেখানে কেউ মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে তারা পরবর্তী সময়ে বাস্তবিকভাবে ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করবে। যেহেতু একজন ব্যক্তির পৃথিবীতে থাকার সময় অনিশ্চিত, তাই প্রতিটি মুসলিমের জন্য তাদের প্রদত্ত প্রতিটি সুযোগ এবং সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা অপরিহার্য, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। তাদের শেখা, বোঝা এবং প্রয়োগ করা পরবর্তী সময়ের জন্য স্থগিত করা উচিত নয়, কারণ তারা ভবিষ্যৎ দেখার জন্য বেঁচে থাকতে পারে না। এই ধরনের বিলম্ব কেবল তাদের আশীর্বাদের অপব্যবহারের দিকে পরিচালিত করবে, যার ফলে উভয় জীবনেই চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যা দেখা দেবে। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 158:

"তারা কি [তাহলে] আর কিছুর অপেক্ষা করে, কেবল এই যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে, অথবা তোমার প্রতিপালক আসবে, অথবা তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন আসবে?"

যদি কেউ তাদের প্রদত্ত সময় এবং সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা যখন মৃত্যুর মতো আর ফিরে আসার সুযোগ পাবে না, তখন তাদের হাতে ভালো কিছু থাকবে না এবং অনুশোচনা থাকবে না। এবং এই পৃথিবীর মতো, তাদের দ্বিতীয় কোন সুযোগও দেওয়া হবে না। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৫৮:

"...যেদিন তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন আসবে, সেদিন কোন ব্যক্তি তার ঈমান থেকে কোন উপকার পাবে না, যতক্ষণ না সে পূর্বে ঈমান এনেছে অথবা তার ঈমানের মাধ্যমে কোন কল্যাণ অর্জন করেছে। বলো, "অপেক্ষা করো। আমরাও অপেক্ষা করছি।"

মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিচার দিবসের পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে নির্দেশ করে, যেমন খ্রীষ্ট-শত্রুদের আগমন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের। যেহেতু এগুলো ইসলামের অনস্বীকার্য প্রমাণ, তাই যে ব্যক্তি এগুলো প্রত্যক্ষ করবে সে সেই সময় ঈমান গ্রহণ করে লাভবান হবে না এবং যদি তারা এই প্রধান নিদর্শনাবলী আসার আগে ইসলামী শিক্ষার উপর আমল না করে থাকে, তাহলে ঈমান থেকেও লাভবান হবে না। কারণ কিছু প্রধান অদৃশ্য বিষয় তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস, যার মধ্যে রয়েছে অনুভূতির বাইরের বিষয়, ঈমানের একটি অপরিহার্য দিক। পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায় এমন জিনিসের উপর বিশ্বাসের গুরুত্ব অস্পষ্ট, এমনকি যদি এমন কিছু লক্ষণ থাকে যা দেখায় যে এর অস্তিত্ব আছে। এই কারণেই আল্লাহ, যারা বিচার দিবসে তাঁর একত্ববাদের কথা স্বীকার করে, তাদের ঈমান গ্রহণ করবেন না, যেমন তারা অদৃশ্য দেখেছে, যেমন জাহান্নাম, জান্নাত এবং ফেরেশতারা।

ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে গড়িমসি করার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করার পর, মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্তির আরেকটি উৎস সম্পর্কে সতর্ক করেন: অনৈক্যের মধ্যে পতিত হওয়া। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫৯:

"নিশ্চয়ই, যারা তাদের ধর্মকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে - তুমি, [অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ, সা.], তাদের সাথে কোনভাবেই [সম্পর্কিত] নও..."

ধর্মের মধ্যে অনৈক্য তখনই দেখা দেয় যখন মানুষ নেতৃত্ব এবং এর সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলি, যেমন সম্পদ এবং সামাজিক প্রভাব কামনা করে। ফলস্বরূপ, পণ্ডিতরা ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করবেন যাতে তারা তাদের নিজস্ব দল তৈরি করতে পারেন, যা তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। এই অনৈক্য অজ্ঞ অনুসারীদের একে অপরকে ঘৃণা এবং ঘৃণা করে যার ফলে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত একে অপরের অধিকার পূরণ করতে বাধাগ্রস্ত হয়। ফলস্বরূপ, সমাজের মধ্যে দুর্নীতি এবং অবিচার ছড়িয়ে পড়ে। উপরন্তু, বিপথগামী পণ্ডিতদের দ্বারা ঐশ্বরিক শিক্ষার ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করার ফলে, তাদের অন্ধ অনুসারীরা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক এবং শারীরিক উভয় অবস্থাতেই অস্থিরতার মুখোমুখি হবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধা দেখা দেবে, এমনকি তারা কিছু পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও।

এই পদ্ধতিতে কাজ করা পণ্ডিতরা আবিষ্কার করবেন যে এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে অর্জিত যেকোনো সম্পদ অবশেষে ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনেই চাপ, অসুবিধা এবং দুঃখের দিকে পরিচালিত করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। উপরন্তু, যারা ইসলামী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে অন্যদের বিভ্রান্ত করে, তারা তাদের ভুল ব্যাখ্যার প্রতিটি অনুসারীর সাথে তাদের পাপ বৃদ্ধি পাবে, যেমনটি জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বরে একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ আল আন'আম, আয়াত ১৫৯:

"...তাদের ব্যাপার কেবল আল্লাহর উপর নির্ভরশীল; তারপর তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন।"

একজন মুসলিমের উচিত নিজেকে বিভ্রান্ত করা থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা। অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা, এমনকি ইসলামেও, সমালোচনা করা হয়েছে কারণ ব্যক্তিদের ভেড়ার মতো আচরণ করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি ব্যবহার করে অন্যদের পরামর্শ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মূল্যায়ন করা উচিত। পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই, জ্ঞান অন্বেষণ করা উচিত এবং অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ করার পরিবর্তে সেই জ্ঞান এবং প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। ইসলামের ক্ষেত্রে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য শেখা এবং প্রয়োগ করার চেষ্টা করা উচিত, যাতে অন্যদের কাছ থেকে সঠিক এবং ভুল নির্দেশনার মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

তাই নেতৃত্বের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা উচিত নয় বরং জীবনে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষা শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে। ভুল মনোভাব গ্রহণ এড়াতে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতা সর্বদা মনে রাখতে হবে। ষষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৫৯-১৬০:

"...তাদের ব্যাপার কেবল আল্লাহর উপর নির্ভরশীল; তারপর তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। যে ব্যক্তি [কিয়ামতের দিন] একটি সৎ কর্ম নিয়ে আসবে, তার জন্য তার দশগুণ পুরস্কার থাকবে, এবং যে ব্যক্তি মন্দকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে তার সমান প্রতিদান ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হবে না; এবং তাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না।"

যদিও, তাঁর অসীম করুণার কারণে, মহান আল্লাহ, নেক আমল বহুগুণ বৃদ্ধি করেন, তবুও ১৬০ নম্বর আয়াত থেকে লক্ষ্য করা উচিত যে, মানুষ তাদের নেক আমল থেকে তখনই উপকৃত হবে যখন তারা তাদেরকে নিরাপদে বিচারের দিনে নিয়ে যাবে। অতএব, কেবল একটি নেক আমল করা যথেষ্ট নয়। নেক আমলকে ধ্বংসকারী জিনিস থেকে রক্ষা করতে হবে যাতে এটি তাদের সাথে করে বিচারের দিনে নিয়ে যেতে পারে। নিজের নেক আমলকে রক্ষা করার জন্য, তাদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা শিখতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে যাতে তাদের নেক আমল ধ্বংসকারী জিনিসগুলি এড়ানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, মানুষকে তাদের প্রতি

করা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া তাদের নেক আমল ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ২য় সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৬৪:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা উপদেশ বা কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-খয়রাত নষ্ট করো না..."

একইভাবে, বিপদের শুরু থেকেই যখনই কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখনই তাকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং পরকালে ধৈর্যের প্রতিদান পেতে পৃথিবী থেকে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৬০:

"...যে ব্যক্তি [কিয়ামতের দিন] একটি সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তার দশগুণ পাবে, আর যে ব্যক্তি মন্দকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে তার সমান প্রতিদান ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হবে না; এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

অধিকন্তু, তাঁর অসীম করুণার কারণে, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে প্রতিটি পাপ তার মূল্য অনুসারে প্রতিফলিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতিদানের মতো তা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে না। আরও একটি করুণা হল, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন

যে, একজন ব্যক্তিকে কেবল তখনই তার কৃত পাপের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে যখন সে সেই পাপকে বিচারের দিনে নিয়ে আসবে। এর অর্থ হল, যদি কেউ আখেরাতে পৌঁছানোর আগে এই পৃথিবীতে পাপ মুছে ফেলে, তবে তাকে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। বড় পাপ এড়িয়ে এবং সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ছোট পাপ মুছে ফেলা সম্ভব। অধ্যায় ৪ আন-নিসা, আয়াত ৩১:

"যদি তোমরা সেইসব কবীরা পাপ থেকে বিরত থাকো যেগুলো তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেব..."

কিন্তু কেবল আন্তরিক তওবার মাধ্যমেই বড় পাপ মুছে ফেলা সম্ভব। প্রকৃত তওবার মধ্যে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া অন্তর্ভুক্ত, যতক্ষণ না এটি আরও জটিলতার দিকে পরিচালিত করে। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একই বা অনুরূপ পাপ এড়াতে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে এবং আল্লাহ তায়ালা এবং অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইসলামী শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত অনুগ্রহ যথাযথভাবে ব্যবহার করে তাদের সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলতে হবে।

ভালো কাজ সম্পাদন করতে এবং সেগুলোকে নিরাপদে আখেরাতে নিয়ে যেতে এবং সেগুলোকে ধ্বংস করতে পারে এমন পাপ থেকে বাঁচতে হলে, ইসলামের আচরণবিধি অনুসরণ করতে হবে। ৬ষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৬১:

"বলুন, "নিশ্চয়ই, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছেন- একটি সঠিক ধর্ম..."

এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে, যার ফলে তারা বিচারের দিনে জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্র দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারবে। ফলস্বরূপ, এটি উভয় জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। উপরন্তু, এই মনোভাব নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি আল্লাহ, মহিমান্বিত, এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে, যা সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রসার ঘটাবে।

এই ঐশ্বরিক নির্দেশনা সর্বদা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একই ছিল এবং মক্কার অমুসলিমদের পূর্বপুরুষ এবং মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবদের পূর্বপুরুষ, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকেও একই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৬১:

"বলুন, "নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছেন- একটি সঠিক ধর্ম- ইব্রাহিমের পথ, যিনি সত্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এবং তিনি আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"

মক্কার অমুসলিমদের এবং মদিনার আহলে কিতাবদের, যারা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর বংশধর বলে গর্ব করত, তাদের আল্লাহ তাআলা নিন্দা করেছেন এবং দাবি

করেছেন যে, তাঁর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁর উত্তরাধিকারকে সমুন্নত রেখেছেন। ইসলামের স্পষ্ট সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার বহন করার অযোগ্য হয়ে পড়ে। পরিবর্তে, এই উত্তরাধিকার তাদের কাছে চলে যাবে যারা সত্যিকার অর্থে তাঁর পথ অনুসরণ করেছিল, বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এবং তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। যদি অমুসলিম আরব এবং আহলে কিতাবরা তাদের অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তাহলে তারা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার থেকে এই জীবনে বা পরকালে কোন উপকার পাবে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৮:

" *নিশ্চয়ই, মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের সবচেয়ে যোগ্য হলেন তারা যারা তাঁর অনুসরণ করেছিলেন [আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে] এবং এই নবী [অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ, সা.] এবং যারা ঈমান এনেছিলেন..."*

মুসলমানদের উচিত আহলে কিতাব এবং আরবের অমুসলিমদের অনুকরণ করা থেকে বিরত থাকা, যারা পবিত্র নবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারকে সম্মান করেনি। বরং, তাদের ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর উত্তরাধিকারকে সমুন্নত রাখা উচিত। এটি তাদের প্রাপ্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাঁর পথ অনুসরণ করতে সহায়তা করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে, বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে যথাযথভাবে স্থান দেবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৬১:

"বলুন, "নিশ্চয়ই, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছেন- একটি সঠিক ধর্ম- ইব্রাহিমের পথ, যা সত্যের দিকে ঝুঁকেছিল..."

সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ার অর্থ হল এই বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অনুসরণ করা যে উভয় জগতেই প্রকৃত মানসিক শান্তি আসে মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে, কারণ এই ফলাফল অর্জনের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই রয়েছে।

অধিকন্তু, মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনের অর্থ হলো এমন কিছু মেনে চলা যা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। এই প্রভাবগুলি একজনকে তাদের প্রাপ্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে পরিচালিত করবে। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্যহীনতা অনুভব করবে, তাদের অগ্রাধিকার এবং সম্পর্কগুলি ভুলভাবে স্থাপন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য অপ্রস্তুত থাকবে। এর ফলে তারা পার্থিব এবং পরকালীন উভয় জীবনেই চাপ, চ্যালেঞ্জ এবং কষ্টের সম্মুখীন হবে, তারা যে কোনও বস্তুগত আরাম উপভোগ করুক না কেন। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৬১:

"বলুন, "নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছেন- একটি সঠিক ধর্ম- ইব্রাহিমের পথ, যিনি সত্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এবং তিনি আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"

অতএব, প্রত্যেকের উচিত নিশ্চিত করা যে তারা পার্থিব বা ধর্মীয় যে কোনও পরিস্থিতিতেই ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন করছে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন নিশ্চিত করা। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৬২:

"বল, "নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"

এই লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তি হলো সকল কর্মে সঠিক নিয়ত গ্রহণ করা। কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কাজ করতে হবে। যে ব্যক্তি অন্য কোন কারণে কাজ করে সে তাঁর কাছ থেকে প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ভালো নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হলো, মানুষ মানুষের কাছ থেকে কোন কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদান আশা করে না বা আশা করে না।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৬২:

"বল, "নিশ্চয়ই, আমার প্রার্থনা...""

ইসলামে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে কারণ এটি ইসলামের কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলামের অন্যান্য সকল কাজ ফরজ নামাজকে কেন্দ্র করে। ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ হল এর পূর্ণাঙ্গ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা, যেমন সময়মতো আদায় করা। পবিত্র কুরআনে এই নামাজের গুরুত্ব প্রায়শই জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ এগুলি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ। উপরন্তু, পাঁচটি ফরজ নামাজ বিচার দিনের ধ্রুবক স্মারক হিসেবে কাজ করে, ব্যক্তিদেরকে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করে, নামাজের প্রতিটি অংশ প্রতীকীভাবে বিচার দিনের সাথে যুক্ত। নামাজের সময় দাঁড়ানো প্রতীকী যে একজন ব্যক্তি কীভাবে সেই মহান দিনে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 4-6:

"তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

রুকু করা এমন অনেক লোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যারা তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচিত হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনা জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থতার উপর আলোকপাত করে। নামাজের সময় সিজদার কাজ প্রত্যেককে বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সামনে সিজদা করার আহ্বানের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে, যারা পৃথিবীতে থাকাকালীন তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেনি, যার অর্থ জীবনের প্রতিটি অংশে তাঁর আদেশ পালন করেনি, তারা বিচারের দিনে তা করতে অক্ষম হবে। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

নামাজের সময় হাঁটু গেড়ে বসা একটি শক্তিশালী স্মারক যে, কেয়ামতের দিন একজন ব্যক্তি কীভাবে তাদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে আল্লাহর সামনে হাঁটু গেড়ে বসবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদের তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যারা নামাজের সময় এই দিকগুলিতে মনোযোগী হবেন তারা তাদের নামাজ সঠিকভাবে আদায় করবেন, ফলে নামাজের মধ্যবর্তী বিরতির সময় মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত আত্মসমর্পণ নিশ্চিত হবে। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

অধিকন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৬১৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, ফরজ নামাজ ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য করে। যারা নামাজের দায়িত্ব অবহেলা করে তাদের ঈমান ছাড়া এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈমান এমন একটি গাছের মতো যার বৃদ্ধির জন্য বাধ্যতামূলক কর্মের মাধ্যমে যথাযথ লালন-পালনের প্রয়োজন। ঠিক যেমন সূর্যের আলোর মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের অভাবযুক্ত একটি উদ্ভিদ শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও বাধ্যতামূলক কর্মের সমর্থন ছাড়াই হ্রাস এবং অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৬২:

"বল, "নিশ্চয়ই, আমার নামাজ, আমার আচার-অনুষ্ঠান...""

এই আচার-অনুষ্ঠানগুলিতে এই পৃথিবীতে অনুসরণ করা আচরণবিধি অন্তর্ভুক্ত। মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য অর্জনের মাধ্যমে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য, সর্বদা ইসলামী আচরণবিধি বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। উপরন্তু, ইসলামী আচরণবিধি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে যার ফলে সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তি ছড়িয়ে পড়বে। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে মানবসৃষ্ট আচরণবিধি অনুসরণ করলে কখনই এই পরিণতি হবে না। অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং মেনে চলা, এমনকি যদি তা তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ মেনে চলেন, এমনকি যখন অপ্রীতিকর চিকিৎসা এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাসের মুখোমুখি হন তখনও এটি তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করে। ঠিক যেমন এই জ্ঞানী রোগী সর্বোত্তম মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং অনুশীলন করেন তিনিও সর্বোত্তম হবেন।

অতএব, ইসলামী আচরণবিধি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে পারবে এবং মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারবে। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৬২:

"বল, "নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"

অধিকন্তু, এই আয়াতটি দেখায় যে একজন ব্যক্তির মৃত্যু তার এই পৃথিবীতে জীবনযাপনের প্রতিফলন ঘটাবে। সহীহ মুসলিমের ৭২৩২ নম্বর হাদিসে এই ধারণাটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন আনুগত্যের অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে এবং তাঁর কাছে পেশ করা হবে। অন্যদিকে, যারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করেছেন, তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং অবাধ্যতার অবস্থায় তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই ধারণার ভিত্তিতে বিচারের দিন একজন ব্যক্তির ফলাফল কী হবে তা পণ্ডিতদের দ্বারা বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছাড়াই স্পষ্ট।

ইসলামী আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করলে নিশ্চিত হবে যে, একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে মেনে চলবে এবং তাঁর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে অন্য কোনও জিনিস যেমন সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতিকে কখনোই মেনে চলবে না। ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ১৬২-১৬৩:

"...আমার জীবন ও মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই.."

সমাজ, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো অন্যান্য জিনিসগুলি স্বাভাবিকভাবেই অস্থির, যার ফলে সেগুলি পূরণ করা অসম্ভব। যেহেতু ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, তাই একজন ব্যক্তিকে খুশি করা প্রায়শই অন্যজনকে বিরক্ত করে। সুতরাং, যারা আল্লাহকে অমান্য করে অন্যদের খুশি করতে চায়, তারা শেষ পর্যন্ত দুঃখী এবং তিক্ত বোধ করবে, কারণ তারা আল্লাহকে

এবং মানুষ উভয়কেই সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হবে। উপরন্তু, এই জিনিসগুলি তাদের আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে না, যদি তারা পার্থিব অনুমোদনের জন্য তাঁর অবাধ্য হয়। অন্যদিকে, আল্লাহকে খুশি করা সহজ, এবং তাঁর আদেশ অনুসরণ করা উভয় জগতেই কল্যাণ বয়ে আনে। অতএব, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করে তারা মানসিক শান্তি পাবে এবং সমাজের প্রতিকূল প্রভাব থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন, এমনকি এই সুরক্ষা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট না হলেও। অধ্যায় 6 আল-আন'আম, আয়াত 163:

"... আর আমাকে এটাই আদেশ করা হয়েছে..."

একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো বাইরের জগতে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। এটি তখনই সম্ভব যখন তারা কেবল তাদের কথার মাধ্যমে নয়, বরং তাদের চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রদর্শন করে উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেয়। ষষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ১৬৩:

"...এবং আমি তোমাদের মধ্যে প্রথম মুসলিম।"

এছাড়াও, উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া হলো নিজের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদের, ইসলামী আচরণবিধি বাস্তবায়নের ব্যাপক সুবিধাগুলি বুঝতে উৎসাহিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে মানসিক শান্তির একমাত্র পথ হল ইসলামী আচরণবিধি, এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর, সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো মহান আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে অন্য কোনও বিষয় মেনে চলা উচিত নয়। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৬৪:

"বলুন, "আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসেবে কামনা করব, অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক?"..."

যে ব্যক্তি সঠিক মনোভাব গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, সে অনিবার্যভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, সে মানসিক ও শারীরিকভাবে অস্থিরতা অনুভব করবে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে তারা ভুল জায়গায় রাখবে। এর ফলে চাপ, বাধা এবং চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে, যদিও তার কিছু বস্তুগত আরাম-আয়েশ থাকতে পারে। ষষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ১৬৪:

"...এবং প্রতিটি প্রাণী নিজের বিরুদ্ধে ছাড়া অন্য কোন দোষ করে না..."

অধিকন্তু, যদি কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে ভুল মনোভাব ধরে রাখে, তাহলে তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হবে। ফলস্বরূপ, তাদের কাছ থেকে কোনও অজুহাত গ্রহণ করা হবে না, তাদের

দ্বিতীয় সুযোগও দেওয়া হবে না এবং অন্য কেউ তাদের কর্মের পরিণতি থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে না, কারণ প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৬৪:

"... আর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিরুদ্ধেই দোষ চাপায় না, আর কোন ভার বহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না..."

অতএব, এমন ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলা উচিত যে তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় অটল থাকতে পারবে এবং কোন না কোনভাবে তাদের কর্মের পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে, যেমন একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তির, যেমন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুপারিশের মাধ্যমে। এই ধরনের মনোভাব প্রকৃতপক্ষে সুপারিশের ধারণাকে উপহাস করছে এবং কিয়ামতের দিন তাদের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত করা হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যারা এইভাবে আচরণ করে তারা আবিষ্কার করতে পারে যে এমনকি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সৎকর্মশীলরাও কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ৪১:

"তাহলে কেমন হবে যখন আমরা প্রতিটি উম্মত থেকে একজন সাক্ষী আনব এবং আপনাকে, [অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ, সা.] তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে আনব?"

এবং অধ্যায় 25 আল ফুরকান, আয়াত 30:

" আর রাসূল বলেছেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

এই আয়াতে মুসলিমদের কথা বলা হয়েছে কারণ তারাই একমাত্র পবিত্র কুরআন গ্রহণ করেছে, কারণ অমুসলিমরা কখনও এটি গ্রহণ করেনি। গভীর অধ্যয়ন ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে, কিয়ামতের দিন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন তার কী হবে।

অতএব, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশার অর্থ হলো ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা এবং তারপর তাঁর রহমতের আশা করা, যেমন বিচারের দিনে সৎকর্মশীলদের সুপারিশ, যেমন মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর উপর বরকত ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৬৪:

"...অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদেরকে সেই বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।"

এই পৃথিবীতে মানুষের বিভিন্ন মতামত এবং আচরণবিধি রয়েছে যা তারা অনুসরণ করে। কিন্তু বিচার দিবসে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে কেবলমাত্র ইসলামী আচরণবিধিই সঠিক ছিল। অতএব, এই সত্যটি এখনই উপলব্ধি করা উচিত যাতে তারা এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৬৫:

"আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কাউকে অন্যের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন..."

জীবনের পরীক্ষা হলো ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হবে কিনা তা নিয়ে। অতএব, অন্যদের প্রদত্ত পার্থিব আশীর্বাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়িয়ে চলা এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহারের উপর মনোযোগ দেওয়া, কারণ তারা জানে যে তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা তাদের দেওয়া হয়েছে, ঠিক যেমন অন্যদেরও তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা দেওয়া হয়েছে। তাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মনের শান্তি সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব সাফল্য অর্জনের মধ্যে নিহিত নয়, বরং এটি কেবল তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো কীভাবে ব্যবহার করা হয় তার মধ্যেই নিহিত, তা নির্বিশেষে, তাদেরকে অনেক পার্থিব আশীর্বাদ দেওয়া হোক বা কম। যে ব্যক্তি এই সত্যটি চিনতে ব্যর্থ হয়, সে পার্থিব সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে ভুলভাবে ব্যবহার করে অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করবে, মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করবে যে মনের শান্তি তার পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে নিহিত। ফলস্বরূপ, তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে এবং জীবনের পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক এবং শারীরিক উভয় অবস্থাতেই অস্থিরতার মুখোমুখি হবে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে ফেলবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি

হবে, এমনকি যদি তারা কিছু পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল আন'আম, আয়াত ১৬৫:

"...নিশ্চয়ই, তোমার পালনকর্তা দ্রুত শাস্তিদাতা..."

অন্যদিকে, যারা এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়, তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি তাদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জনে সহায়তা করবে, যার ফলে তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে অবস্থান করতে পারবে। ফলস্বরূপ, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তি বয়ে আনবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৬৫:

"...কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এই আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে, যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন অনুতাপ এবং সংস্কারের দরজা সর্বদা খোলা থাকবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। প্রকৃত অনুতাপের জন্য অনুতাপ অনুভব করা, মহান আল্লাহ এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রয়োজন, তবে শর্ত থাকে যে এটি অতিরিক্ত সমস্যার সৃষ্টি না করে। একজন ব্যক্তির আন্তরিকভাবে একই বা অনুরূপ অপরাধ পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকার এবং মহান আল্লাহ এবং অন্যদের প্রতি করা যেকোনো অন্যায় সংশোধন করার সংকল্প করা উচিত। ইসলামী

শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তাদের উপর প্রদত্ত অনুগ্রহগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ, মহান আল্লাহর আনুগত্য করা উচিত।

পরিশেষে, একজন ব্যক্তির উচিত নিজের স্বার্থের জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং অনুসরণ করা, এমনকি যদি তা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হয়। তাদের একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ অনুসরণ করেন, বুঝতে পারেন যে এটি তার সর্বোত্তম স্বার্থে, এমনকি অপ্রীতিকর ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাসের মুখোমুখি হলেও। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং অনুসরণ করবেন তিনিও ভাল হবেন। কারণ একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই এমন জ্ঞান রয়েছে যা একজন ব্যক্তিকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে সাহায্য করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করার জন্য তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে অবস্থান করতে সাহায্য করবে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৬৫:

"আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কাউকে কাউকে অন্যের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা শাস্তিদানে দ্রুত; কিন্তু তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবীদের উপর।

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

500+ FREE English Books & Audiobooks / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: https://shaykhpod.com/

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
অডিওবুকস : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
পডওম্যান: https://shaykhpod.com/podwoman
পডকিড: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্লগ এবং আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন:
http://shaykhpod.com/subscribe